# দার্শনিকী

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মিত্র এণ্ড ঘোষ
১১, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

মিত্র এণ্ড ঘোষ, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১১নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা, হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

দাম তিন টাকা

শ্রীকালী প্রেস্ ৬৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

# বিজ্ঞপ্তি

এই বইখানিতে দর্শনের দৃষ্টি, পরিচয়, জড়, জীবও ধাতু-পুরুষ, এবং তত্ত্বকথা এই কয়টি প্রবন্ধ একত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ কয়টি অন্যত্র পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন হইতে কোনও একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির দার্শনিক চিন্তা আমার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার একটি সার মর্ম্ম Contemporary **philosophy of India** নামক গ্রন্থে George, Allen and Unwin কর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সেই চিন্তাধারার সহিত প্রথম প্রবন্ধত্রয়ের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই প্রবন্ধত্রয়ের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় দর্শনের তথ্য বা প্রচলিত ইউরোপীয় কোনও দর্শনের মত খুঁজিবেন তাঁহারা হয় ত হতাশ হইবেন। এই প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে আমার দার্শনিক মতের অতি অল্প অংশই ব্যক্ত হইয়াছে, সেই জন্য জিজ্ঞাসুর মনে এমন অনেক কথা উঠিতে পারে যাহার উত্তর ইহাদের মধ্যে নাই। সহস্রাধিক পৃষ্ঠার কমে সমগ্র মতটি স্ফুটভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে তাহার জন্য চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে তথাপি এই চিন্তাগুলি প্রথম যে ভাবে উদিত হইতেছে সেই ভাবেই বাংলা ভাষায় তাহা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টার হয় ত কিছু সার্থকতা থাকিতে পারে এই মনে করিয়া এই প্রবন্ধগুলিকে প্রকাশকের

হাতে ছাড়িয়া দিলাম। অত্যন্ত সংক্ষেপে বহু বিস্তারসাপেক্ষ কথার অবতারণায় অস্ফুটতা অনিবার্য্য। যাঁহারা ভবিষ্যতে পূর্ণতর প্রকাশের আশা করিয়া বর্ত্তমানের সংক্ষিপ্ততার অপরাধ ক্ষমা করিবার সহৃদয়তা প্রকাশ করিবেন লেখক তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শেষের প্রবন্ধটি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাল্য রচনার ক্রটি তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট, তথাপি ২৫ বৎসর পূর্ব্বের চিন্তার সহিত বর্ত্তমান চিন্তার হয় ত কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া ঐ প্রবন্ধটিকেও প্রকাশিত করা হইল।

কল্যাণীয়া অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুরমা মিত্র এম, এ এই বইখানির আগুন্ত প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহার নিকট আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নানা কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকি বলিয়া এ প্রুফ্ আমার দ্বারা দেখা সম্ভব হইত না এবং বইখানিও প্রকাশিত হইত না। হয় ত প্রুফ্ দেখার কিছু কিছু ক্রটি রহিয়া গেল। আমি দেখিলে আমার তাড়াতাড়িতে হয় ত আরও বেশী ভ্রম থাকিত।

প্রকাশক মিত্র এবং ঘোষ কেন যে এই অর্থ-সৌভাগ্য-বঞ্চিত গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিলেন জানি না। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত

# দার্শনিকী

## দর্শনের দৃষ্টি

আমরা চোখে দেখি এবং মনে ভাবি, এ সম্বন্ধে কারও হয়ত সংশয় না উঠ্‌তে পারে। কিন্তু দেখার মধ্যেও ভাবা আছে কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই একটা কূটকচালে কথা উঠে পড়ে। লাল, নীল, সবুজ কত রকম রঙ্‌ আমরা চোখে দেখি, কিন্তু লাল রঙ্‌টাকে দেখা আর লাল রঙ্‌টাকে লাল ব'লে চেনা এ দুটোর মধ্যে যে একটু তফাৎ আছে সে কথা সহজে মনে আসে না, লালের বোধ এক রকমের বোধ, নীলের বোধ আর এক রকমের বোধ, এ বোধ তখনই ফোটে যখন আমাদের চোখের ভিতরের বর্ণপটে বাহিরের রূপ তার রঙের ছোপ লাগায় আর সেই ছোপের সাড়া শততন্ত্রীতে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহিরের রূপ কেমন ক'রে রঙ্‌ হয় আর সেই রঙ্‌ কেমন ক'রে রঙের বোধ জন্মায়, তার রহস্য আজও আমাদের কাছে ধরা পড়েনি। বাহিরের রূপ যে কি জিনিষ তা জান্‌বার তখনই সুযোগ হয় যখন আমাদের চোখের ও মস্তিষ্কের ভিতরের যন্ত্রগুলির জৈব ব্যাপারে সেই রূপ রঙে পরিবর্ত্তিত হয়; কোনও বৈজ্ঞানিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে রূপ কি, এবং রূপে

রূপে ভেদ কি, তবে তিনি হয়ত বল্‌বেন যে আলোকের স্পন্দনের বেশী-কমের নামই রূপ। সে রূপ কিন্তু রঙ্‌ নয়; সে রূপ আমরা চোখে দেখি না, বৈজ্ঞানিক অনুমানে বুঝি মাত্র। চোখের ভিতরের কোনও বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে যখন এই আলোকের রূপ এসে পড়ে তখন তারই জৈব ব্যাপারের ব্যবস্থায় আলোক-পরিস্পন্দ তার স্পন্দনের বেশীকমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন রকমের রঙ্‌ হ'য়ে দাঁড়ায়; কিন্তু এই জৈব ব্যাপারের ফলে যে রঙ্‌ হয় সেই রঙ্‌টি যে কেমন ক'রে রঙ্‌বোধ হয় সে রহস্যের আজও কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু রঙ্‌ বোধ এবং কো[illegible] রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লে জানা এ উভয় এক কথা নয়। সদ্যো[illegible]াত শিশুরও চক্ষু আছে এবং তাহার চক্ষুতেও বাহিরের রূপ পড়ে এবং রঙের বোধ জন্মায় কিন্তু সে শিশু কোনও রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লে জানে এ কথা বলা চলে না। কোনও রঙবোধকে লাল ব'লে জানা শুধু একটা জানা নয়, সেটা একটা পরিচয়। দুইকে এক না করতে পারলে পরিচয় হয় না। কোনও একটি রঙ্‌-বোধকে যদি ধ'রে রাখতে পারি এবং পুনরায় সেই বোধটি উৎপন্ন হলে এই দুইটির ঐক্য এবং অপর অপর বোধ হ'[illegible] এদের পার্থক্য বুঝতে পারি তবেই সেই দুইটি বোধের ঐক্যের পরিচয় ঘটে এবং এই ঐক্যের পরিচয় হলেই সেই রঙ্‌-বোধটিকে লাল বা নীল ব'লে বুঝতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে প্রতিক্ষণে বিভিন্ন রকমের রঙের বোধ উৎপন্ন হ'ত এবং প্রতিক্ষণে তা'

ধ্বংস হ'য়ে যেত, তবে কোনও রঙের বোধের সহিত কোনও রঙের বোধের পরিচয় হওয়া সম্ভব হ'ত না, এবং কোনও রঙকে লাল বা নীল ব'লেও চেনা যেত না। কোনও একটি বোধ একবার বা একাধিকবার ঘটলে যে সেটি প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায় এবং পুনরায় তৎসদৃশ বোধ উৎপন্ন হ'লে সেটি পুনরুদ্বুদ্ধ হয় এবং কালের ব্যবধান এড়িয়ে যে দুই কালের দুইটি বোধ পাশাপাশি দাঁড়ায় এবং ঐক্য সম্বন্ধ স্থাপন করে, এর নাম স্মৃতি; এটি যদি না থাকৃত তবে লালকে লাল বলে নীলকে নীল ব'লে চেনা বা জানা সম্ভব হোত না।

জড়ের মধ্যে প্রতিক্ষণে আমরা স্পন্দশক্তির যে নব-নব বিকীরণ দেখতে পাই, তা'তে শক্তির যে আদান-প্রদান দেখতে পাই তাতে কোনও ব্যাপারের সঞ্চয় বা পরিচয়ের চিহ্নমাত্রও দেখতে পাই না। কিন্তু যেই আমরা জৈবপর্য্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করি সেই দেখি যে জৈব ব্যাপারের একটা প্রধান লক্ষণই হচ্ছে জৈবব্যবহারের বা মূঢ়-জৈবপ্রত্যয়ের সঞ্চয় বা স্মৃতি এবং সেই অনুসারে স্বকার্য্যের নিয়মন। ক্ষুদ্রতম কীটেরও জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেই কীটটি তার আহারীয় বস্তুর অন্বেষণে বের হ'য়ে সেটিকে ধরে এবং হয়ত সেটি তাকে ছাড়িয়ে স'রে যায়, এবং সে তার পিছু পিছু গিয়ে আবার সেটিকে ধরে। ক্ষুদ্রতম প্রাণীর ব্যাপারের মধ্যেও এই যে একটি মূঢ় স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এটা জড় জগতের ব্যাপারের চেয়ে সম্পূর্ণ

বিভিন্ন। মানুষের যেমন বোধ জন্মে ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও যে সেই রকম বোধ জন্মে এ-কথা অবশ্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বোধতুল্য তাদেরও যে অন্ততঃ একটা বোধাভাস আছে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়। এই বোধাভাসের দ্বারা তাদের প্রাণযাত্রা যেভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাতে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন কালের এবং হয়ত কুলক্রমাগত পিতৃপুরুষের বোধাভাসগুলি তাদের মধ্যে সঞ্চিত থেকে তাদের জৈব ব্যাপারগুলিকে তাদের প্রাণযাত্রার অনুকূল ক'রে তোলে। একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেছেন—

"The effectiveness which characterises the behaviour of organisms ( i. e. of those that show behaviour enough to be studied) seems to depend on profiting by experiences in the individual lifetime or on the results of successful ancestral experiments, or, usually on both. It appears to us to be one of the insignia of life that the organism registers its experiments or true results of its experiences."

আর একজনও এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন, "It is the peculiarity of living things not merely that they change under the influence of surrounding circumstances, but that any change which takes place in

them is not lost but retained, and as built it were into the organism to serve as the foundation of future actions." ক্ষণপরিবর্ত্তিকালের বিচ্ছেদপরম্পরায় যে ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক হ'য়ে সংঘটিত, জৈব বোধাভাসের সঞ্চয়বৃত্তিতে তারা যে কি কৌশলে এমন করে বিধৃত হ'য়ে থাকে তার জটিল রহস্য আমাদের নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জড়জগতের মধ্যে যে শক্তির নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে তার প্রত্যেকটি শক্তি তার নির্দ্দিষ্টপরিমাণে নির্দ্দিষ্ট-দিকে প্রতিনিয়ত কায করছে। এই যে সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগুলি নিরন্তর ঘুরছে, এতদিন ঘুরেও যে তাদের ঘোরার একটা অভ্যাস হয়েছে তা বলা যায় না। পৃথিবী যে তার বৈকেন্দ্রিক গতিতে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় এবং সূর্য্য যে তাকে নিজের দিকে টান্‌ছে, এই দোটানার সামঞ্জস্যে বর্ত্তুলাকারে ঘোরার সৃষ্টি। কিন্তু এতদিনের ঘোরাতেও পৃথিবীর কোনও ঘোরার অভ্যাস জন্মে নাই, এবং আজ যদি কোনও কারণে সূর্য্যের আকর্ষণ একটু হ্রাস হ'য়ে যায় তবে পৃথিবী সূর্য্য থেকে দূরদূরান্তরে আকাশের কোন্ অনন্ত পথে যে ছুটে যেতে থাক্‌বে, কি কোথায় কার সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হ'য়ে যাবে তার কোনও ঠিক্-ঠিকানা নেই। জড়ের মধ্যে আত্মরক্ষা, আত্মবর্দ্ধন, আত্মধারণ বা আত্মপোষণের জন্য কোনও চেষ্টা বা ব্যাপার দেখা যায় না; জড়ের মূঢ়শক্তির আদান প্রদানে এমন কোনও চিহ্ন নেই যাতে একথা বলা যায় যে আত্মশক্তি

প্রকাশের চেষ্টায় জড় তার কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা কর্‌ছে। জড়ের মধ্যে যদি কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় সে উদ্দেশ্য জড়ের নিজের উপকারের জন্য নয়, সে উদ্দেশ্য জীবের উপকারের জন্য, জীবের ভোগের জন্য, জীবের ব্যবহারের জন্য। সাঙ্খ্যদর্শনকার জড়ের এই তত্ত্বটুকু ভাল ক'রেই বুঝেছিলেন তাই তিনি প্রকৃতিকে পরার্থ এবং পুরুষের ভোগাপবর্গসাধনে ব্যাপৃতা ব'লে বর্ণন করেছেন। সামান্য একটি পরমাণুসংশ্লেষের মধ্যেও জড়ের প্রচণ্ড আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির খেলা দেখতে পাই কিন্তু তার পরিমাণ, অন্যশক্তির সান্নিধ্যে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে তার ব্যবহার, এ সমস্তই একান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং গণিতশাস্ত্রের আয়ত্তের মধ্যে সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত। জড়ের কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির আড়ম্বর নেই, তাই নানা অবস্থায় তার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নেই। পূর্ব্বাপর ব্যবহারের সঞ্চয় নেই, স্মৃতি নেই, অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নেই।

জীবরাজ্যে প্রবেশ কর্‌লেই আমরা দেখি যে এ রাজ্যের নিয়মপদ্ধতি জড়রাজ্যের নিয়মপদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জড়ের উপাদানকে অবলম্বন ক'রেই জীব তার কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ্ ও প্রাণী— তার নিজের শরীরের উপযোগী প্রোটিড্ ধাতু গঠন করে। এই প্রোটিড্ ধাতু যেমন উৎপন্ন হয় তেম্‌নি ভেঙ্গে যায়, আবার গ'ড়ে ওঠে আবার ভেঙ্গে যায়, এবং এম্‌নি ক'রে জৈবশক্তির ব্যাপারে

নিরন্তর শরীর-ধাতুর ভাঙ্গাগড়া চল্‌তে থাকে। অথচ এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে, এমন একটি ছন্দ আছে যে, সেই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে জীবদেহ এমন একটি বিশিষ্ট প্রণালীতে গ'ড়ে ওঠে যে প্রত্যেকটি জীবদেহ সেই জাতীয় অন্যান্য জীবদেহের স্বজাতীয় হয়েও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক। ঐক্যের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত জীবদেহই জীবদেহ, কিন্তু পার্থক্যের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি জীবদেহ এমন কি তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্য যে কোনও জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পৃথক্। যে প্রোটীড্ ধাতু জীবদেহের প্রধান উপাদান সে ধাতু জড়জগতে পাওয়া যায় না; সে ধাতু প্রাণস্পন্দনের দ্বারা এবং প্রাণশক্তির অভিষেকের দ্বারা জড়োপাদান হ'তে প্রাণকার্য্যের উপযোগিতার জন্য আহৃত ও উৎপাদিত। এ ধাতু জড় হ'লেও যতক্ষণ জৈবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট থাকে ততক্ষণ এ জড় নয়। আমরা আমাদের শরীরকে জড় বলি, পার্থিব বলি, পাঞ্চভৌতিক বিকার বলি। এ দেহ ভৌতিক বিকার সে কথা ঠিক্, কিন্তু অন্য ভৌতিক বিকার থেকে এর পার্থক্য এইখানে যে এ বিকার জীবশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত, জীবশক্তির স্বপ্রয়োজনে জড় থেকে প্রাণাবেগে উত্থাপিত ও বিনির্ম্মিত। জীবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট ও স্পন্দিত না ক'রে জীব কখনও জড়কে নিজের দেহধাতুরূপে ব্যবহার করতে পারে না। অথচ জীবশক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক জীবের জীবধাতু বিভিন্ন। একবিন্দু ঘোঁড়ার রক্ত একবিন্দু

গাধার রক্ত থেকে রাসায়নিক ও অন্যবিধ ধাতব লক্ষণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি দুজন মানুষের রক্তের মধ্যে যে ধাতু পাওয়া যায় তা'ও বিভিন্ন, পুরুষের রক্ত স্ত্রীলোকের রক্ত থেকে বিভিন্ন। এতে এই বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি জীবশক্তির প্রকাশের মধ্যে একটি স্বগতবৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যার দ্বারা সে ঠিক আপন প্রয়োজনের অনুকূল ধাতুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গঠন ক'রে তোলে। জৈবশক্তি ব'লে একটা স্বতন্ত্র শক্তি নে, কিন্তু জীবরাজ্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য, সেখানে দেখি বিচিত্র জীবশক্তির বহুধা বিচিত্র প্রাণব্যাপার, প্রাণলীলা। সে লীলা এক নয়, সে লীলা বহু, অথচ সে লীলার মধ্যে একটা ঐক্যের সম্বন্ধ রয়েছে, তাল রয়েছে, ছন্দ রয়েছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে প্রাণব্যাপারের যে লীলা দেখতে পাওয়া যায় তা'ত এই ঐক্যের ছন্দটির অন্য আর একটি দিক্ দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি জীবকোষ একদিকে যেমন স্বপোষণের জন্য স্বধাতু গঠন ক'রে তোলে, তেম্‌নি শক্তির ব্যবহারে সে ধাতু ক্ষয় হ'য়ে যায়, কিন্তু যেমন এক দিকে ক্ষয় হ'তে থাকে তেম্‌নি অপর দিকে আবার স্বধাতু গঠনের কায চল্‌ছে, অথচ এই ক্ষয় ও উপচয়ের মধ্যে একটা এমন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, নির্দ্দিষ্ট ঐক্য বা ছন্দ বজায় থাকে যে উপচয় ও ক্ষয়ের দোটানার মধ্য দিয়ে জীবনের স্রোতটি তার যথানির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব'য়ে চ'লে যায়। একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "In the ordinary chemical changes of the inorganic

world, as in the weathering of rocks into soil, one substance changes into another. The same sort of thing goes on in the living body, but the characteristic feature is a balancing of accounts so that the specific activity continues. We lay emphasis on this characteristic, since it seems fundamental—the capacity of continuing in spite of change, of continuing, indeed, through change. An organism was not worthy of the name until it showed, for a short time at least not merely activity but persistent activity. The organism is like a clock inasmuch as it is always running down and always being wound up; but unlike a clock, it can wind itself up, if it gets food and rest. The chemical processes are so corelated that up-building makes further down-breaking possible, the pluses balance the minuses; and the creature lives on."

এমনি ক'রে একটি জীবকোষের মধ্যে ক্ষয় ও উপচয়ের মধ্য দিয়ে তার জীবনস্রোত বইতে থাকে। আবার বৃহত্তর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন ছাড়া, জীবকোষগুলির

পরস্পরের সামঞ্জস্যে আর একটি জীবনস্রোত প্রত্যেকটি জীবকোষের সহিত একটা সুনির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্যে সমগ্র প্রাণীটির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকে। একদিকে যেমন প্রত্যেকটি জীবকোষের একটি স্বতন্ত্র প্রাণ-পর্য্যায় আছে অপরদিকে আবার প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সমস্ত প্রাণীটির সমগ্র জীবকোষের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধ; এই সমগ্র থেকে বিচ্যুত হ'লে জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র প্রাণপর্য্যায় রক্ষা পায় না। অনেকগুলি জীবকোষ নিয়ে একটি হাতের জৈবক্রিয়া চলেছে, তার প্রত্যেকটি কোষের স্বতন্ত্র জীবন স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে, কিন্তু সেই হাতখানি দেহ থেকে ছিন্ন করা যায় সেই দেখা যায় যে হাতের জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রহণবর্জ্জনের জমাখরচে যেটুকু জমা থাকে সেই শক্তির বলে একটি জীবকোষ যখন আপন শক্তিকে আপনার মধ্যে সন্ধারণ করতে পারে না, তখন সে আপনা থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিভক্ত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে বহু জীবকোষের সৃষ্টি ক'রে তাদের সঙ্গে এমন্ একটি অবিচ্ছেদ্য পারিবারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে যে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সেই সমগ্রের জীবনের উপর নির্ভর করে। এবং এম্নি ক'রে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেও সমগ্রের অধীন হ'য়ে থাকে এবং সমগ্রের জীবনও জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবনের উপর নির্ভর করে। আবার জীবকোষগুলির শুধু সমষ্টিতেই জীবদেহ নির্ম্মাণ

হয় না। একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ-পরম্পরায় বিশিষ্টরূপ আদানপ্রদানের কৌশলে, এই সমগ্রদেহের উৎপত্তি, অবস্থান ও বৃদ্ধি। সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি জীবকোষ পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাবের মধ্যেই একদিকে যেমন সমগ্র জীবদেহের প্রাণপর্য্যায় রক্ষিত হয় অপরদিকে তেমনি সেই প্রভাবকে অবলম্বন ক'রেই প্রত্যেকটি জীবকোষ বেঁচে রয়েছে। বহুকে মুছে ফেলে এখানে এক দাঁড়ায় নি, এককে মুছেও বহু দাঁড়ায় নি। এক দিক দিয়ে দেখ্‌লে যাকে দেখি এক, অপরদিক দিয়ে দেখ্‌লে সেই এককেই দেখি বহু। আমরা সাধারণতঃ জানি যে কোনও কিছু যদি এক হয় তবে সে বহু নয়, যদি বহু হয় তবে সে এক নয়; তাই দর্শন-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যাঁরা বহুর মায়ায় পড়েছেন তাঁরা এককে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আর যাঁরা একের মায়ায় পড়েছেন তাঁরা বহুকে মিথ্যা বলেছেন, কেউ বা বলেছেন, বহু অংশকে নিয়ে এক। কিন্তু প্রাণজগতে এসে আমরা যে লীলা দেখি তাতে দেখি এটা একটা এমন রাজ্য যেখানে কোনও একটি সত্তা বা সম্বন্ধই অপর সত্তা বা সম্বন্ধকে ছাড়া তার আপন স্বরূপকে লাভ করতে পারে না। এখানে ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধিকে পাওয়া যায় না; বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয় ক্ষয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি। বৃদ্ধির পর ক্ষয় আসে এ আমরা জানি, বা ক্ষয়ের পর বৃদ্ধি আসে এ আমরা জানি। কিন্তু এখানে দেখি বৃদ্ধিক্ষয়ের যৌগপদ্য এবং এমন যৌগপদ্য যেখানে ক্ষয়ের মধ্যে বৃদ্ধি

এবং বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়। একের সমষ্টিতেও বহু নয়, বহুর সমষ্টিতেও এক নয়, কিন্তু যাকে এক বলি তাই বহু এবং যাকে বহু বলি তাই এক। সাধারণতঃ য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে যেটাকে organic view বা জৈবদৃষ্টি বলে সেটাতে একের জীবনের মধ্যে বহু এসে কেমন ওতপ্রোতভাবে মিশেছে এই কথাটিই বিশেষভাবে জোর দিয়ে দেখান হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জৈবদৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে একের প্রাধান্য দেখাবার জন্য এবং একের সঙ্গে যে বহুর বিরোধ নেই, বহুকে নিয়েই যে এক আপনাকে সার্থক করছেন এই কথাটি জোর ক'রে দেখাবার জন্য। সকল সময়েই আমরা এই কথা শুনে থাকি যে ভেদদৃষ্টিতেই দুঃখ, বিচ্ছেদ, ধ্বংস এবং ঐক্যদৃষ্টিতেই মঙ্গল ও মুক্তি। কিন্তু এ সমস্ত মতবাদের মধ্যে জৈবদৃষ্টির যথার্থ শিক্ষাটি যে প্রকাশ পেয়েছে আমার তা মনে হয় না। জৈবদৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব এইখানেই প্রকাশ পায় ব'লে আমার মনে হয় যে, এই দৃষ্টিতে এক ও বহুর চিরপ্রসিদ্ধ ভিন্নতাটি তিরোহিত হয়েছে। যেমন এককে না বোঝা গেলে বহুকে বোঝা যায় না, তেমনি বহুঁকে না বোঝা গেলেও এককে বোঝা যায় না। বহুকে বোঝাও যেমন একপেশে বোঝা, এককে বোঝাও তেম্‌নি একপেশে বোঝা। একের স্বতন্ত্রতায় যে বহুর উৎপত্তি এবং একের স্বতন্ত্রতা যে বহুর স্বতন্ত্রতা ছাড়া হয় না, এই যে কার্য্যকারণবিরোধী সত্য এতে এক এবং বহুর সীমানাকে এমন অনির্বাচ্য ক'রে তুলেছে যে এক বলাও পার্শ্বদৃষ্টি বহু বলাও পার্শ্বদৃষ্টি। বৃদ্ধির মধ্যে

ক্ষয় ও ক্ষয়ের মধ্যে বৃদ্ধি এতে যে ক্রিয়াবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে বৃদ্ধিও পার্শ্বদৃষ্টি ক্ষয়ও পার্শ্বদৃষ্টি। এ পার্শ্বদৃষ্টির সামঞ্জস্য কোথায় সে প্রশ্নের এখানে এখন অবতারণা করা সহজ নয়। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ বুদ্ধিতে যে সমস্ত সম্বন্ধকে আমরা এতকাল স্থির মনে ক'রে এসেছি সে সমস্ত সম্বন্ধগুলির একটিও স্থির নয়, একটিও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। নাগার্জ্জুন থেকে Bradley পর্য্যন্ত অনেকেই সম্বন্ধগুলির আপেক্ষিকতা স্বীকার করেছেন এবং সম্বন্ধগুলি সমস্তই আপেক্ষিক ব'লেই নাগার্জ্জুন বলেছেন যে সমস্ত বস্তুই নিঃস্বভাব, শ্রীহর্ষ বলেছেন ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই অনির্বাচ্য, Bradely বলেছেন যে খণ্ডশঃ দেখি ব'লে সম্বন্ধগুলি আপেক্ষিক এবং পরস্পরবিরোধী, কিন্তু সকল সম্বন্ধকে যদি এক ক'রে ফেলি তবে সেই এক করার মধ্যে তাদের সমস্ত আপেক্ষিকতা নিঃশেষে শেষ হ'য়ে যাবে; জ্ঞান কর্ম্ম, ইচ্ছা সমস্ত একত্র মিশে গিয়ে এই সমগ্রটি যে কি তা বলা যায় না, তা অনির্বাচ্য কিন্তু তাই পরমার্থ সৎ। কিন্তু সম্বন্ধের আপেক্ষিকতায় যে সম্বন্ধগুলি মিথ্যা ব'লে মনে হয় তার প্রধান কারণ এই যে একটি সম্বন্ধ বুঝতে গেলে আর একটি বুঝতে হয় এবং সেটিকে বুঝতে গেলে আর একটিকে বুঝতে হয়, এম্‌নি ক'রে আমরা অনবরত যতই চলি ততই চলি এবং অনন্তকাল চ'লেও কোন সম্বন্ধের নির্ণয় হয় না। একে সংস্কৃতে বলে অপ্রমাণিকী অনবস্থা, ইংরেজীতে বলে vicious

infinite। আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে একটি সম্বন্ধকে বা সত্যকে এক দিক দিয়ে হয়ত বেশ বোঝা যায় কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে পূর্ব্বের বোঝার সঙ্গে গোল উপস্থিত হয়, বিরোধ হয়। এবং যেহেতু আত্মবিরোধই মিথ্যা সেইজন্য এই সম্বন্ধনির্ণয়ও মিথ্যা। ক্রিয়া ব্যাপারের মধ্যে আত্মবিরোধ খণ্ডিত হ'য়ে যায় দেখে Hegel ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যেই সত্যের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু ক্রিয়া ব্যাপারটা যে নিজে কি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি কোথাও সুস্পষ্ট ক'রে বুঝিয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না। সম্বন্ধ গুলিকে পৃথক ক'রে দেখি ব'লেই ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে তাদের একত্র দেখে তাদের বিরোধ সমাধান করতে চেষ্টা করি, কিন্তু জৈবদৃষ্টির মধ্যে এই কথাটি যেন আমাদের চোখে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে আসে যে যে সম্বন্ধগুলিকে আমরা বুদ্ধির মায়ায় পৃথক ব'লে মনে করি সেগুলি পৃথক নয়, তাদের প্রত্যেকের সত্তা অপরের মধ্যে নিহিত হ'য়ে রয়েছে, তারা একও নয় বহুও নয়। প্রাণপর্য্যায়ের মধ্যে এই অপূর্ব্ব সত্তাসমাবেশের চরম সত্যটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। শুধু ক্ষয় বৃদ্ধির মধ্যে নয়, শুধু এক বহুর পরস্পরের সংশ্লেষে নয়, বৃদ্ধি, উৎপাদন ও ক্রমবিকাশের লীলায় পূর্ব্বতনকে ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের মধ্যে সন্ধারণ করবার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই আমরা যা দেখ্‌তে পাই তাতে শুধু এই পুরোণো কথাটি বুঝি না যে সম্বন্ধগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, তাতে তার চেয়ে

আরও একটা বড় কথা বুঝি ; সেটা হচ্ছে এই যে, সম্বন্ধগুলি পরস্পরের মধ্যে অপূর্ব্ব সত্তাসমাবেশে সমাবিষ্ট। যেটা বুদ্ধির চোখে অসম্ভব, জৈবজীবনে সেটা মূর্ত্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই জন্য বুদ্ধির জালে বা জড়জগতের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে জৈব-পর্য্যায়ের বিশেষত্বটুকু ধরা পড়ে না। এইজন্য জড়জগতের নিয়মে জড়জগতের সংজ্ঞায় জড়জগতের ধারণায় জীবরাজ্যের ব্যাপার বা তথ্য ধরা পড়ে না। জীবরাজ্য একটি নূতন রাজ্য। জড়জগতের থেকে জীবজগৎ কেমন ক'রে উঠ্‌ল সে রহস্য এখনও নির্ণীত হয় নি, এবং হবে কি না তাও সন্দেহ। কেউ মনে করেন যে স্বতঃ-প্রবাহী প্রাণশক্তির সঙ্গে জড়শক্তির বিরোধের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকমের জীবপর্য্যায়ের উদ্ভব হয়েছে, কেউ বা হয়ত মনে করেন যে জড়শক্তিরই একটা নূতন পর্য্যায়ের আরম্ভেই প্রাণ পর্য্যায়ের আরম্ভ। কিন্তু একজন অতি বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেছেন যে, শুধু যে জড়ের প্রকার থেকে জীবপর্য্যায়ের প্রকার ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্তু জীবপর্য্যায়ের মধ্যে যে সমস্ত স্তরে স্তরে প্রকার ভেদ রয়েছে তার কোনও প্রকার থেকেই কোনও প্রকার ধরা পড়ে না। কাযেই কোনও পর্য্যায়ের দ্বারাই কোন পর্য্যায়ের প্রকার বা স্বভাব নির্ণয় করা যায় না। 'There is no possibility of deducing or predicting true nature of the new from that of the old. No amount of reflection on the inorganic world leads to the

idea of the organic. As no emergent can be predicted from, explained by, or accounted for by what goes before it in the course of evolution, each emergent has simply to be accepted as a fact and accorded its position in the scheme. A mind cannot be explained by life neither can life be explained by mind."

এম্‌নি ক'রে নূতন ধর্ম্ম, নূতন প্রকার, নূতন নিয়ম, নূতন ব্যবহার নিয়ে জড়জগতের বুকের মধ্য থেকে জড়জগতের সঙ্গে সহযোগে যে প্রাণপর্য্যায় উৎপন্ন হোল সেটা সর্ব্বতোভাবে একটা নূতন রাজ্য। জড়ের নিয়মে এর ব্যাখ্যা করা চলে না। জড়কে আমরা যে চোখে দেখি, সে চোখে প্রাণকে দেখতে গেলেই দেখি যে সে চোখে একে দেখা যায় না। জড়ের ভাষা প্রাণের ভাষা নয়। জড়জগতে শক্তিচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতের যে নিয়ম সে নিয়ম প্রাণজগতে খাটে না। Thomson এই কথাটি তাঁর রকমে বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন, "Making no pronouncement whatsoever in regard to the essence of the difference between organisms and things in general, we hold to what we believe to be a fact, that mechanical formulae do not begin to answer the distinctively biological questions. Bio-chemistry and Bio-physics

added together do not give us one biological answer. We need new concepts, such as that of the organism as a historic being, a genuine agent, a concrete individuality, which has traded with time and has enregistered within itself past experiences and experiments and which has its conative bow ever bent towards the future. We need new concepts, because there are new facts to describe which we cannot analyse away into simple processes." Thomson এই যে বলেছেন যে জীবনপর্য্যায়ের ব্যাপার ও প্রকার জড়পর্য্যায়ের ব্যাপার ও প্রকার থেকে এতই বিভিন্ন যে জীবকে বুঝতে গেলে জৈবিক সংজ্ঞা ছাড়া চলে না, জড়ের সংজ্ঞা দিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যকে আমরা ধরতে পারি না, আমি এইখানে শুধু এইটুকু যোগ দিতে চাই যে জড়রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে যদি একশক্তি ব'লে কল্পনা করি তা হ'লে জড়শক্তির যে বিচিত্র রূপ তাকে কিছুতেই আমরা পাই না। সমস্ত শক্তিকে যদি শক্তিমাত্রের সাদৃশ্যে একশক্তি বলি তবে চিন্তার তাড়না থেকে আমাদের চিত্ত আপাতবিশ্রাম পায় বটে, কিন্তু জড়শক্তির বিচিত্রলীলার ব্যাখ্যা তাতে হয় না। জড়ের রাজ্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য, সে রাজ্যে নানাশক্তি তার নির্দ্দিষ্ট ঘাতপ্রতিঘাতের লীলায় খেলা করছে ; জড়কে নিতে গেলে তাকে তার এই বিচিত্র

শক্তিচক্রের মধ্যেই নিতে হবে। জড়কে একশক্তি ব'লে সঙ্ক্ষেপ করা চলে না কারণ সে হচ্ছে নানা শক্তিপুঞ্জের পরস্পরসম্বদ্ধ লীলারাজ্য।

কেহ কেহ মনে করেন যে জীবপর্য্যায়ে যে শক্তির খেলা দেখি সাধারণ জড়শক্তির মতন সেও একটা বিশিষ্ট জড়শক্তি (force) জড়শক্তি যেমন অবস্থাভেদে বৈদ্যুতিক চৌম্বক, মাধ্যাকর্ষণিক প্রভৃতি নানারকমের দেখা যায়, তেম্‌নি জীবকোষের মধ্যেও যে শক্তির ব্যাপার দেখা যায় সেও সেই রকমেরই একটি জড়শক্তি। যেমন বৈদ্যুতিক এবং মাধ্যাকর্ষণিক এই উভয় শক্তিই জড়শক্তি হ'য়েও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের জড়শক্তি, তেমনি জৈব ব্যবস্থার মধ্যে প্রকাশ ব'লে অন্য জড়শক্তির সহিত প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাক্‌লেও জৈবশক্তিও মূলতঃ একপ্রকার জড়শক্তিই। আবার অপরাপর অনেকে মনে করেন যে জৈবশক্তি জড়শক্তির রূপান্তর বা নামান্তর নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র জাতীয় শক্তি এবং কেবলমাত্র জীবস্তরেই এর প্রকাশ, কোনও জড়শক্তির প্রেরণায় বা জড়শক্তির পরিণামে, পরিবর্ত্তনে বা ঘাত প্রতিঘাতের ফলে এর উৎপত্তি নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বশক্তি। এর স্বগত ব্যাপারে এ স্বাধীনভাবে আপনাকে প্রকাশ করে! জড়শক্তির সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে, জড়শক্তি আপনাকে দেশাবচ্ছেদে বা spatial উপায়েই প্রকাশ করে কিন্তু এই বিশিষ্ট জীবশক্তি দেশাবচ্ছেদে আপনাকে প্রকাশ করে না। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসঞ্চারী জীবশক্তি। জড়শক্তি যখন দূরস্থিত দুইটি বস্তুকে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করে, বা

উত্তাপ ও আলোকের স্পন্দনাকারে আপনাকে প্রকাশ করে তখন সেই ক্রিয়াব্যাপারটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চরিত হ'তে থাকে। রাসায়নিক ব্যাপারে যে পরমাণুর স্থানবিনিময় ঘটে সেটি স্পন্দাত্মক এবং স্থানসঞ্চারী। এই দেশাবচ্ছেদে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে স্থানসঞ্চারের মধ্যেই জড়শক্তির প্রকাশ। কিন্তু জীবশক্তি স্পন্দাত্মকও নয় স্থানসঞ্চারীও নয়। এ একটি নূতন স্তরের শক্তি, জড়শক্তির ভাষায় একে প্রকাশ করা যায় না; এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের শক্তি (autonomous agent)। কাযেই এই শক্তি কোথায় থাকে এ প্রশ্নের জবাব নেই। কারণ এ শক্তি কোনও দেশাবচ্ছেদে থাকে না, কোনও জায়গায় থাকে না। সেই জন্য জড়শক্তির বেলাই বলা চলে যে, এ শক্তিটি এইখানে আছে, কিন্তু এ শক্তিটি একটি নূতন স্তরের জীবাত্মক শক্তি। এ নিজে কোনও দেশাবচ্ছেদে না থেকেও দেশাবচ্ছেদে অবস্থিত জড়শক্তিকে ও জড়পরমাণুকে নূতনভাবে সংহত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে—"It is immaterial and it is not energy; its function is to suspend and to set free in a regulatory manner pre-existing faculties of inorganic interaction." কিন্তু এইরূপ একটি স্বতন্ত্র জীবশক্তি মান্‌লেই যে জীবপর্য্যায়ের রহস্য ধরা প'ড়ে গেল তা মনে করা যায় না। জীবপর্য্যায়ে যে লীলাচক্র দেখ্‌তে পাই তাকে এক দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে শক্তি বলা যায়, অপর দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে

শক্তি ও বুদ্ধির মিলনে ইচ্ছা ব'লে বলা চলে। একটি শরীরের মধ্যে যে অসংখ্য পরস্পরাপেক্ষী ব্যাপার পরস্পরের সামঞ্জস্যে স্রোতের মত ব'য়ে চলেছে, কোথায় নিয়ন্তা জানি না অথচ নিয়মের বাঁধনে, যেন ঠিক জেনে শুনে প্রত্যেকটি শরীর যন্ত্র তার কায করে যাচ্ছে। বৃক্কযন্ত্র (kidney) শরীরের রক্ত থেকে যেটুকু যেটুকু মলভাগ শরীরের অপকারী হবে ঠিক ঠিক সেইটুকুকে কি কৌশলে রক্ত থেকে বেছে নিয়ে মূত্র প্রস্তুত করে শরীর যন্ত্রকে শোধন কর্‌ছে তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। শুধু একটি মূঢ় অলৌকিক জীবশক্তিকে মান্‌লে তার দ্বারা বহুধাবিচিত্র জৈব ব্যাপারকে উপপন্ন করা যায় না। জৈবব্যাপারকে ব্যাখ্যা কর্‌তে হ'লে তার বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে হবে, শুধু জড়শক্তির অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জীবশক্তি মান্‌লে তা চলে না। একজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ এই মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছেন—"In order to guide effectually the excessively complex physical and chemical phenomena occurring in living material, and at many different parts of a complex organism, the vital principle would apparently require to possess a superhuman knowledge of these processes. Yet the vital principle is assumed to act unconciously. The very nature of this vitalistic assumpton is thus

totally unintelligible." আমাদের দেশে প্রাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, তা মোটামুটি তিন প্রকার। চরক প্রাণকে জড়শক্তি ব'লেই ব্যাখ্যা করেছেন। বেদান্ত প্রাণকে জড়শক্তির একটি স্বতন্ত্র বিকার বা পরিণাম ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। সাঙ্খ্য প্রাণকে মহৎতত্ত্ব থেকে সমুদ্ভূত ব'লে ধ'রে নিয়ে বুদ্ধিব্যাপারেরই অবান্তর ব্যাপার ব'লে মনে করেছেন। এঁদের সকলেরই প্রাণ সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয়দের আলোচনার তুলনায় অতি অল্প এবং অস্ফুট। ফলে দেখা যায় যে জৈব ব্যাপারের রহস্য কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এ রহস্য যখন ব্যাখ্যা করা যায় না তখন শুধু একটি জীবশক্তির ঘাড়ে একে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। সেইজন্যই আমার বিবেচনায় শুধু একটি জীবশক্তি স্বীকার না ক'রে জীবলোক ব'লে একটি স্বতন্ত্র লোক, স্বতন্ত্র রাজ্য স্বীকার করাই উচিত। এ রাজ্যের নিয়ম-পদ্ধতি ব্যবহার সমস্তই এই রাজ্যেরই বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম। জড়লোক নানাবিধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে আপনাকে চালিত ক'রে চলেছে। এই সমস্ত শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য থাকলেও এক জড়শক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশ বোঝা যায় না। অথচ জড়শক্তির এই বিচিত্রতা না বুঝ্‌লে জড়শক্তিকেই বোঝা গেল না। বিভিন্ন জড়শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের বিচিত্র সমাবেশ, পরস্পরের বিভিন্নরূপ জড়শক্তিকে বুঝতে গেলে এ সমস্তই বোঝা চাই এবং জড়বিজ্ঞানের সাধকগণ

অহোরাত্র জড়শক্তির এই বহুধাবিচিত্র প্রকাশকে বিচিত্ররূপে উপলব্ধি কর্তে ব্যাপৃত রয়েছেন। জীবলোকও তেম্নি একটি শক্তি বা একটি সত্তা নয়, একটি নূতন স্তরের জৈবনিয়ম, জৈবব্যক্তিত্ব, জৈবব্যবহার, জৈবপদ্ধতি, পরস্পরের সহযোগে এবং জড়লোকের শক্তিচক্রের সহযোগে রচিত একটি নূতন লোক। একে শক্তি বলা চলে না কারণ এ স্পন্দাত্মক নয় অথচ জড়স্পন্দের নিয়ামক; এর কার্য্যক্ষমতা দেখে যখন একে শক্তি বল্‌তে যাই, তখন বুদ্ধির সাধর্ম্ম্য দেখে একে বুদ্ধিময় বল্‌তে ইচ্ছা হয়। শুধু যে আমাদের দেশে সাঙ্খ্যদর্শন প্রাণকার্য্যকে বুদ্ধিকার্য্য বলেছেন তা নয়, য়ুরোপেরও অনেক মনীষীরা প্রাণব্যাপারকে একটা objective mindএর ব্যাপার ব'লে বর্ণনা করেচেন। কিন্তু একে শুধু বুদ্ধিময় বলা চলে না, কারণ বুদ্ধিঅনুসারে এর প্রবৃত্তি রয়েছে, সেই হিসাবে একে ইচ্ছাময় বল্‌তে ইচ্ছা হয় এবং অনেক য়ুরোপীয়েরা একে blind will ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, অনেকে বা একে ঈশ্বরের ইচ্ছার গৌণ বিকাশ ব'লে মনে করেছেন। এর স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির দিক্ থেকে দেখ্‌লে একে সৃজনী শক্তি ব'লে মনে হয় এবং সেই হিসাবে একে Bergson সৃজনাত্মক স্বচ্ছন্দশক্তি ব'লে ( creative elan ) ব'লে বর্ণনা করেছেন। নানাদিক থেকে এই জীবনলীলাকে নানারূপে সত্য ব'লে মনে হয়, কিন্তু এর কোনও একটিকেই জীবলীলার পরমার্থ সত্য রূপ ব'লে নির্দ্দেশ করা যায় না,

অথচ এর প্রত্যেকটিই জীবলীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ কর্‌ছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের স্বগতবিকাশে ও পরস্পরের আত্মবিকাশের গ্রহণ-বর্জ্জন-সন্ধারণের সুনিবদ্ধ সামঞ্জস্যে, আপনা থেকে আপনাকে নব-নব সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়, নিজের সরূপ ও বিরূপ সৃষ্টিতে যে বিচিত্র সম্বন্ধপরম্পরা ও সত্তাপরম্পরার পরস্পর সমাবেশ দেখ্‌তে পাই তাতে জীবপর্য্যায়ের মধ্যে একটি নূতন লোকের পরিচয় পাই। এই লোকটি একদিকে যেমন নিজের বিচিত্রতার মধ্যে নিজের লীলাকৌশলে সুষমাময় হ'য়ে রয়েছে, অন্যদিকে তেম্‌নি জড়জগতের বিচিত্র নিয়ম-পরম্পরার সঙ্গে আপনাকে বেঁধে রেখেছে এবং জড়শক্তিকে আপন জৈব উপাদানে ব্যবহার ক'রে আপনার ক'রে তুলেছে। জড়রাজ্যের সঙ্গে জীবরাজ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে, আদান প্রদান চল্‌ছে, তথাপি জীবরাজ্য তার নিয়মপরম্পরা নিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র হ'য়ে রয়েছে, । পরস্পরের আদান প্রদান রয়েছে ব'লে পরস্পরের সাদৃশ্যও রয়েছে তথাপি তাদের বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে পরস্পর যুক্ত থেকেও দুটিতে একেবারে দুটি বিভিন্ন লোক রচনা ক'রে বিরাজ কর্‌চে।

জীবলোকের সহিত ঠিক্ এই রকমেরই সাম্যবৈষম্যে মনোলোক বা বুদ্ধিলোকের সৃষ্টি। অথচ এই বুদ্ধিলোকের নিয়ম, প্রকার, সংগঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। জড়লোকে দেখেছি রূপের খেলা, গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্যে আত্মসন্ধারণের লীলা। সে লীলায় কোথাও স্থৈর্য্য নেই, যেটুকু বা স্থৈর্য্য আছে সেটুকু কেবল চাঞ্চল্যের সামঞ্জস্য মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিলোকে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম দেখ্‌তে পাই

জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা ও পরপ্রকাশতা। জ্ঞান কি, জ্ঞানের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া কি, এ নিয়ে আমাদের দেশে ও য়ুরোপে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনার মধ্যে যে সমস্যাটি সব চেয়ে কঠিন, সেটি হচ্ছে এই যে, জ্ঞান পদার্থটি অন্য সমস্ত পদার্থের চেয়ে এত বেশী বিভিন্ন যে, কোনও জড়বস্তুর সহিত যে এর কি সত্য সম্বন্ধ থাকতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। বেদান্ত এবং সাঙ্খ্যযোগ এ উভয়ই জ্ঞানস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ পরমার্থ সত্যস্বরূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম ও পুরুষ এই পদার্থটিকে সমস্ত জড়পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব'লে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মতে জড়ের দ্বিবিধ অবস্থা, এক অবস্থায় বাহ্য জড়জগৎ, অপর অবস্থায় অন্তঃকরণ (বেদান্ত) বা বুদ্ধি (সাঙ্খ্যযোগ)। বেদান্ত মতে অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয় ভাব পদার্থ; এ একরকম বিকারে বা বিক্ষেপে বাহিরের জড়জগৎ, অন্যরকম বিকারে বা বিক্ষেপে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ দ্রব্যটি অবিদ্যাসমুদ্ভূত জড়পদার্থ হ'লেও এটি এমন স্বচ্ছ যে এর উপর মূল চিৎপদার্থের প্রতিবিম্ব প'ড়ে অন্তকরণের যে কোনও আকারকে উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌তে পারে। অন্তঃকরণ পদার্থটি যখন দীর্ঘপ্রভাকারে কোনও বাহ্যবস্তুর উপর পড়ে, তখন অন্তঃকরণটি বৃত্ত্যাকারে সেই বস্তুর উপর প'ড়ে সেই আকার গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতে সেই বস্তুটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং বৃত্তিদ্বারা সংযুক্ত ব'লে অন্তঃকরণেও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা জীবের সেই বস্তুর প্রমাতা বা জ্ঞাতারূপে জ্ঞান জন্মে, এবং বৃত্তিচৈতন্য বা প্রমাণচৈতন্য, জ্ঞানব্যাপার বা

cognitive operation রূপে প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হ'লে সেই বাহ্যবস্তুর যে রূপ বা পরিমাণ, অন্তঃকরণও ঠিক্ সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয় এবং চিৎসম্পর্কে সেই আকারটি যে উদ্ভাসিত হয় তা'রই নাম সেই বস্তুর জ্ঞান হওয়া। সাঙ্খ্যযোগ মতেও ঠিক্ ঐরূপ ভাবেই বুদ্ধি বিষয়সংযুক্ত হয়, এবং বিষয়কালে আকারিত বুদ্ধি পুরুষের ছায়াসংযুক্ত হ'য়ে চিন্ময়রূপে প্রতিভাত হয়। এ মতে বাহ্যজগতে বিষয়টি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট প্রদর্শিত হয় এবং এই বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট প্রদর্শিত হওয়ায় সেটি জানা হোল এই বোধ জন্মে। সাঙ্খ্যমতে বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রথম ক্ষণে অস্ফুট বা নির্ব্বিকল্প থাকে এবং পরক্ষণে স্ফুট হয়। বাচস্পতি বলেন যে, মনের সঙ্কল্প বিকল্প এই দুই বৃত্তিদ্বারা অস্ফুট জ্ঞান স্ফুটরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু ভিক্ষু মনের এই ব্যাপার অস্বীকার করেন এবং বুদ্ধি ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়ে বস্তুতে পতিত হয় ব'লে বুদ্ধির আত্মপ্রদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষণে নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প বোধ জন্মে এই কথা বলেন। বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়ে বস্তুতে সংক্রান্ত হয় এ বিষয়ে বাচস্পতি ও ভিক্ষুতে ঐকমত্য আছে; কিন্তু বস্তুপ্রত্যক্ষে মনের যে সঙ্কল্প (synthesis) বিকল্প(abstraction) বৃত্তির কথা বাচস্পতি উল্লেখ করেছেন, ভিক্ষু তা অস্বীকার করেন। যদি বুদ্ধি নিজেই ইন্দ্রিয়-প্রণালীদ্বারা বস্তুতে সংক্রান্ত হয় ব'লে মানা যায়, তবে মনের স্বতন্ত্র ব্যাপার মান্‌বার কোনও আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে করা যায়

না। এমন কি ক্ষণ-ভেদে নির্ব্বিকল্প সবিকল্প ভেদেরও প্রয়োজন দেখা যায় না।

এই দুই মতেই বাহ্যজগতের রূপ অবিকৃতভাবে বুদ্ধিতে গৃহীত হয় এবং চিতের সম্পর্কে, ভিতরে বাহিরে উভয়ে চিৎ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুই মত সম্বন্ধেই একটা প্রবল আপত্তি এই যে, এই দুই মতেই জ্ঞান জিনিষটাকে শুধু যেন বস্তুর ছবি তোলার মতন ক'রে দেখান হয়েছে। জ্ঞান জিনিষটা যদি শুধু ছবি তোলার মতনই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হোত তবে সদ্যোজাত শিশুর বস্তুজ্ঞান ও পরিণতবয়স্ক পণ্ডিতের বস্তুজ্ঞান দুইই এক হোত। কিন্তু তা'ত নয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে গোড়ায় যে আলোচনার অবতারণ করা গিয়েছিল সেই কথায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। বাহ্যজগতের রূপ যে অন্তর্জগতে বর্ণরূপে ফুটে ওঠে, সেই অস্ফুট ফুটে ওঠা থেকে জ্ঞানরাজ্যের আরম্ভ। বাহ্যজগতের আলোক কম্পন জৈবজগতের নাড়ীরাজ্যে এসে নাড়ীর বিশেষ কম্পন এবং বিচিত্র জৈবপরিবর্ত্তন ও জৈবপরিস্ফুরণে পরিণত হয়। সে পরিবর্ত্তন জড়রাজ্যের আলোককম্পনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু তা যতই স্বতন্ত্র হোক্ তা কোনরূপ জ্ঞানস্ফুরণ নয়। আলোক-কম্পনের অনুবর্ত্তী জৈবব্যাপারটি যখন কোনও অব্যক্ত বর্ণবোধ রূপে ফুটে ওঠে, তখন সেই ফোটাটি যতই অব্যক্ত হোক্ সেটা একটা স্বতন্ত্র রাজ্যের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ। কিন্তু যেমন জৈবজগতের প্রথম প্রাণক্রিয়া অস্ফুট অথচ ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণীশরীরে সেই

প্রাণক্রিয়াব বহুধা বিচিত্র জটিল লীলাপ্রকাশ দেখা যায়, তেম্‌নি সদ্যোজাত শিশুর অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদির বোধ বিচিত্র জ্ঞানব্যাপারে পরিণত হয়। বাহিরের আলোককম্পনের রূপটি যখন অস্ফুটবর্ণবোধরূপে পরিণত হয় তখন সে রূপটিকে লালও বলা যায় না, নীলও বলা যায় না। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ, ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসার অনেকটা অল্প বিস্তর ঐকমত্য দেখা যায়। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রত্যক্ষ লক্ষণের ব্যাখ্যাবসরে শুধু ইন্দ্রিয়দ্বারা যেটুকুকে পাওয়া যায় সেইটুকুকে ধর্ম্মোত্তর স্বলক্ষণ ব'লে বর্ণনা করেছেন। স্বলক্ষণ কথাটি সোজা কথায় বল্‌তে গেলে এই বোঝায় যে, সেটা একটা বিন্দু বটে, কিন্তু সে বিন্দুটা কি তা বলা যায় না। কারণ তার কোনও পরিচয় নাই। পরিচয় হ'তে গেলেই পূর্ব্বদৃষ্টের সহিত এক করা চাই। এক করা ব্যাপারটি চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা হয় না, কারণ পূর্ব্ব দৃষ্টটি বর্ত্তমানে চোখের সাম্‌নে উপস্থিত নাই। পূর্ব্বদৃষ্টাপরদৃষ্টং চার্থমেকীকুর্বদ্ বিজ্ঞানন্ অসন্নিহিতবিষয়ম্। পূর্ব্বদৃষ্টস্য অসংনিহিত-বিষয়ত্বাৎ। অসন্নিহিতবিষয়ং চার্থনিরপেক্ষম্‌···ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানং তু সন্নিহিতমাত্রগ্রাহিত্বাদর্থসাপেক্ষম্। ইন্দ্রিয়দ্বারা যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু একটা কিছু বটে, কিন্তু কি তা বল্‌বার উপায় নাই। এই কিছু যা ইন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া গেল তাকে যে পূর্ব্বদৃষ্টের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়া ও তার যে একটা লাল বা নীল নাম দেওয়া এটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নয়, এটা কল্পনার খেলা। এই কল্পনাটা যে কোথা

থেকে আসে, কেমন ক'রে কখন তাকে যথাযোগ্যভাবে নিবেশ করে, সে বিষয়ে ধর্ম্মোত্তর একরূপ নিরুত্তর। ন্যায়বৈশেষিকেও নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প এই দ্বিবিধ জ্ঞান মানা হয়েছে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, বস্তুর প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতি ও গুণ প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সবিকল্প দশায় নামসংযুক্ত হয় ব'লে নির্ব্বিকল্প দশায় ঐ বোধটিই নামসংযোগে স্ফুটতর হয়। আমি যখন একটি কম্‌লা দেখি আমার চক্ষু ইন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় যে তখন কেবলমাত্র কম্‌লাটির রূপ ও সেই বিশিষ্ট কাঠিন্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তা নয়, কিন্তু সেই সেই রূপ ও কাঠিন্য যে রূপ ও কাঠিন্যজাতির সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে সংযুক্ত এবং যে বস্তুটিতে ঐ রূপ ও কাঠিন্য গুণদ্বয় আশ্রয় ক'রে আছে তা'দের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়। প্রথম অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শে একটা মূঢ় আলোচন জ্ঞান হয়, এবং তার ফলে পূর্ব্বানুভূত স্বাদও তাহার সুখসাধনত্বের স্মরণ হয় এবং তার ফলে ঐ ফলটিকে সুখকর ব'লে বোধ জন্মে। কিন্তু এই মনের ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটিকে এই কারণে প্রত্যক্ষ বলা যায় যে, যদিও স্মরণকে এ স্থানে সহকারী বলা যায় তথাপি যেহেতু এ ব্যাপারটি ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে উৎপন্ন এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়স্পর্শকে অবলম্বন ক'রে এটি গ'ড়ে উঠেছে, সেই জন্য এ'কে প্রত্যক্ষই বলা উচিত। "সুখাদি মনসা বুদ্ধা কপিত্থাদি চ চক্ষুষা। তস্য কারণতা তত্র মনসৈবাবগম্যতে ॥" ( ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ৬৯ )

বাচস্পতি তাৎপর্য্যটীকায় ন্যায়মত ব্যাখ্যাবসরে বলেন যে, প্রাথমিক নির্ব্বিকল্পদশায় রূপ, পরিমাণ, জাত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায় কিন্তু তথাপি তখন নামসংযুক্ত হয় না ব'লে, "এইটি একটি কম্‌লা" এরকম বোধ হয় না।

এই অবিকল্প অবস্থায় সেই-সেই রূপাদি ব্যক্তি ও রূপসমবেত জাতি এই উভয়েরই জ্ঞান হ'লেও সেই সেই রূপাদির সহিত জাত্যাদির সহিত সেই সেই বিশিষ্টসম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। আলোচিত পদার্থটির মধ্যে সামান্য, বিশেষ প্রভৃতি যা কিছু আছে সমস্তই পিণ্ডাকারে গৃহীত হ'লেও সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধে সেগুলিকে জানা যায় না (জাত্যাদিস্বরূপগাহি ন তু জাত্যাদিনাম্ মিথো বিশেষণবিশেষ্যাবগাহীতি যাবৎ। তাৎপর্য্যটীকা পৃষ্ঠা ৮২)। ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধরও বৈশেষিক মতের প্রত্যক্ষ বিচার প্রসঙ্গে এই মতেরই পোষকতায় বলেছেন যে, নির্ব্বিকল্পদশায় সামান্য (universal) এবং বিশেষ (particular) বা স্বগতভিন্নতা এ উভয়ই পরিলক্ষিত হ'লেও তৎকালে অন্য বস্তুর স্মরণ হয় না ব'লে অপেক্ষামূলক তুলনায় যে ভেদ এবং ঐক্যটি প্রকাশ পায় সেরূপভাবে সামান্য-বিশেষের জ্ঞান হয় না (সামান্যং বিশেষম্ উভয়মপি গৃহ্ণাতি যদি পরমিদং সামান্যম্ অয়ং বিশেষঃ ইত্যেবং বিবিচ্য ন প্রত্যেতি বস্তন্তরানুসন্ধানবিরহাৎ পিণ্ডান্তরানুবৃত্তিগ্রহণাদ্ধি সামান্যং বিবিচ্যতে ব্যাবৃত্তিগ্রহণাদ্ বিশেষোয়মিতি বিবেকঃ—ন্যায় কন্দলী পৃষ্ঠা ১৮৯) এই বিষয়ে বাচস্পতি ও শ্রীধরের মতের প্রধান ভেদ এই যে,

শ্রীধর যে তুলনায় কথা তু'লে বলেছিলেন যে অন্যবস্তুর কথা স্মরণ হ'লে তবে তার সঙ্গে সমতায় সামান্য বোধ এবং পৃথকতায় ভেদ বুদ্ধি জন্মে, বাচস্পতি তা না তু'লে নামসংযোগের ফলেই অবিকল্পদশায় বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মে এই কথাই মাত্র বলেছেন। গঙ্গেশানুবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন যে, নির্বিকল্প দশায় কেবলমাত্র বিশেষণের বা গুণাদির জ্ঞান জন্মে, কিন্তু সে অবস্থায় যে বিশেষ্যকে আশ্রয় ক'রে ঐ গুণগুলি রয়েছে তার জ্ঞান হয় না। যদিও এই নির্বিকল্প জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না তথাপি আমাদের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণস্বরূপ এইরূপ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ না মান্‌লে চলে না (বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানম্ প্রতি হি বিশেষণতাবচ্ছেদবপ্রকারম্ জ্ঞানম্ কারণম্—তত্ত্বচিন্তামণি পৃষ্ঠা ৮১২)। এই জাত্যাদিযোজনারহিত বৈশিষ্ট্যানবগাহী নিষ্প্রকারক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রত্যক্ষ না হ'লেও, এই নির্বিকল্প জ্ঞানকে আমাদের সবিকল্প জ্ঞানের কারণ ব'লে মান্‌তে হয়। কুমারিল ও প্রভাকরও বলেন যে, নির্বিকল্প দশায় সামান্য ও বিশেষ লক্ষিত হ'লেও ঐ অবস্থায় অন্য বস্তুর স্মরণ হয় না ব'লে ঐ সামান্যবিশেষের বোধ "এটি একটি কমলা লেবু" এই বিশিষ্ট বোধরূপে প্রকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মতের বিস্তৃত উল্লেখ এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় করা সম্ভব নয়। তবে এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র কাণ্টের উল্লেখ ক'রে বল্‌তে পারি যে, বৌদ্ধেরা যে নির্বিকল্পদশায় কোনও একটা স্বলক্ষণ কিছু দেখা যায় ব'লে মেনেছিলেন, কাণ্ট্ তা'ও

মানেন না। কাণ্ট্ বলেন যে, ইন্দ্রিয়পথে বর্হির্জগৎ থেকে কিছু একটা আসে কিন্তু সেটা যে কি তা আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়জসামগ্রীকে অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়বিকল্প তা'র উপর দিক্‌কালের সৃষ্টি ক'রে তাকে দিক্‌কালে বিশেষিত ক'রে তোলে এবং তৎপরে মনোবিকল্পে নামজাত্যাদি নানা বিকল্পে বিকল্পিত ক'রে "এটি লাল" "এটি এই বস্তু" ইত্যাদি বিশিষ্টপ্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করে ও সেগুলিকে সম্বন্ধরূপে বাক্যাকারনির্দ্দিষ্ট বোধে (judgements) পরিণত করে।

এ বিষয়ে আর বহু মত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যতটুকু বলা হয়েছে তা'তে এটুকু দেখা যায় যে, আমাদের দেখার মধ্যেও ভাবার অংশ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অস্ফুট বর্ণবোধটি লাল বা নীল ব'লে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে তার মধ্যে অনেকখানি পরিমাণে মনোরাজ্যের কাজ চলেছে। বৌদ্ধেরা এই মনোরাজ্যের স্বতন্ত্র ব্যাপারকে বিকল্প ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বিকল্প যে কত রকমের এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি, তারা কেমন ক'রে ইন্দ্রিয়লব্ধ স্বলক্ষণ সামগ্রীকে পরিবর্ত্তিত করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলেননি। কাণ্ট্ এই বিকল্পের নানাবিধ বৃত্তির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এ বিকল্পগুলির মধ্যে কোনও মূলগত ঐক্যের সন্ধান দিতে পারেননি। মনের মধ্যে সকলেরই যদি এই বিকল্পবৃত্তিগুলি সমানভাবে কাজ করতে থাকে তবে সদ্যোজাত ও বৃদ্ধের, মূর্খ ও পণ্ডিতের জ্ঞানবৈষম্য কেন হয় এ

প্রশ্নেরও তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নি। জড়জগৎ হ'তে উপলব্ধ অজ্ঞাতইন্দ্রিয়সামগ্রীর উপর কি উপায়ে এই বিকল্পবৃত্তিগুলি প্রভাব বিস্তৃত করতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন নি যদি সমস্ত সম্বন্ধই এই বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে বহির্লব্ধ ইন্দ্রিয় সামগ্রীর কোনও ভেদ থাকে না, এবং সেগুলি দিক্‌কাল প্রভৃতি কোনও উপাধি বা বিশেষণে বিশেষিত না হ'য়ে বিভিন্ন বিকল্প বৃত্তিদ্বারা কি উপায়ে নানাভাবে বিচিত্র হ'তে পারে সে প্রশ্নেরও কোনও সমাধান হয় না। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, কি ন্যায়বৈশেষিক, কি বৌদ্ধ, কি মীমাংসক, কি কাণ্ট্ সকলকেই স্মৃতিশক্তিকে মেনেই নিতে হয়েছে ; কিন্তু স্মৃতিটা যে কি ব্যাপার কেহই সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করেন নাই। অথচ মনোরাজ্যের অধিকাংশ গূঢ় ব্যাপারই এই অতীত স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের আহৃত জ্ঞানসামগ্রীর সহিত সম্বন্ধস্থাপনের উপর নির্ভর করছে। ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে, সামান্য ও বিশেষ এ উভয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জগতেই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সেগুলির বোধের জন্য স্মৃতির এমন আবশ্যকতা কেন মানি, সেগুলির যদি বোধই না হয় তবে সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে স্মৃতিশক্তিদ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুগুলিকে মানসপটে উপস্থাপিত ক'রে তুলনা বৃত্তিই বা কি ক'রে সম্ভব। যেগুলি জানা আছে সেই গুলির মধ্যেই তুলনা সম্ভব। কিন্তু কতকগুলি জানা কতকগুলি না জানা, এদের মধ্যে কি ক'রে তুলনা হ'তে পারে। তা ছাড়া কি ভারতীয় কি

য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র এ'র কোনও বিভাগেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান বিভিন্ন থাকিয়াও কেমন ক'রে সংশ্লিষ্ট হয়, কেমন ক'রে পূর্ব্বাহৃত জ্ঞানসঞ্চয় পরকালের আহৃত জ্ঞানের প্রকার ও তাৎপর্য্যকে বিশেষিত ও পরিবর্ত্তিত করতে পারে তার কোনও কথাই উল্লিখিত হয় নি। ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে, কতকগুলি জ্ঞানসামগ্রীর সন্নিবেশে ও সংঘটনে আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এইরূপে নূতন নূতন সামগ্রীর সন্নিবেশে আত্মায় নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কথা যদি সত্য হয় তবে এই যে একটি জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং অপর আর একটি উৎপন্ন হয় এদের মধ্যে কি ক'রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, স্মরণই বা কি ক'রে সম্ভব হয়? এর উত্তরে হয়ত এ কথা বলা যায় যে, নূতন জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয় তখন পূর্ব্বজ্ঞানটি সংস্কাররূপে আত্মায় থাকে এবং পুনরায় সাদৃশ্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানটি সংস্কারে পরিণত হয় এবং সংস্কার থেকে পুনরায় জ্ঞান হয় এ কথার অর্থ কি, কোনও দার্শনিকই এ প্রশ্নের বিচার করেন নি। সংস্কারাবস্থায় স্থিত অনুদ্বুদ্ধ জ্ঞানের সহিত নির্বিকল্পস্থ মূঢ় জ্ঞানসামগ্রীরই বা কিরূপে সাদৃশ্যবোধ হয় এবং সেই সাদৃশ্যবোধই বা কার হয় এবং কিরূপেই বা ঐই সাদৃশ্যবোধ থেকে স্মরণ হয়, এসমস্ত প্রশ্নেরই আজ পর্য্যন্ত কোনও তথ্য নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে যোগশাস্ত্রের আলোচনাটিই অপেক্ষাকৃত গভীর। যোগশাস্ত্রের মতে জ্ঞানের প্রকারটি বুদ্ধিরই একটি

প্রকারভেদ মাত্র। চিদাভাসের দ্বারা এই বুদ্ধির প্রকারভেদটি জ্ঞানাকারে প্রতিভাত হয় এবং বুদ্ধির অন্য আর একটি প্রকার উত্থাপিত হ'লে বুদ্ধির পূর্ব্ব প্রকারটি তা'র নিজের মধ্যে তিরোহিত হয়। এই তিরোহিত প্রকারটির নাম সংস্কার। বুদ্ধির মধ্যে যে এই সংস্কারের সঞ্চয় হয় এই দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে বুদ্ধিকে চিত্ত বলে। অনাদি জন্মপরম্পরা-সঞ্চিত সংস্কার গুলি এই ভাবে চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত হয়। বুদ্ধির কোনও তিরোহিত প্রকার বা সংস্কারটি যখন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধিতে প্রকট হ'য়ে ওঠে তখনই তাকে স্মৃতি বলে। এই ভাবে জ্ঞান থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি থেকে পুনরায় সংস্কার এইরূপ পরম্পরা সর্ব্বদাই চলেছে। এই জন্য বুদ্ধিরূপে যা কিছু প্রকাশ পেতে পারে তা সংস্কার দ্বারা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অপর দিকে বুদ্ধিরূপে যা প্রকাশ পায় তা' নূতন সংস্কারকে উৎপন্ন ক'রে পূর্ব্ব সংস্কারকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার একটা প্রধান দোষ এই যে, এই মতটিতে বুদ্ধিকে একেবারে জড়বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সেইজন্য এই মতের ব্যাখ্যাটি অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান কালের মানসিক ব্যাপারের যে সমস্ত physiological এবং mechanical explanation দেখ্‌তে পাওয়া যায় অনেকটা সেই রকমের। এ মতে সমস্ত মানসিক ব্যাপারটাই একটা জড়ব্যাপার। কেবলমাত্র বুদ্ধির কোনও একটি বিশেষরূপ যখন পুরুষের চিদাভাসযুক্ত হয়

তখন সেই রূপটি চেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চিত্ত যদি অনাদি জন্মপরম্পরাসঞ্চিত সংস্কারে পূর্ণ হয়েই থাকে তবে শিশু ও পরিণতবয়স্কের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা যায়? শারীর (Physiological) ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়েও আজকাল ফ্রয়েড্ শিষ্যেরা অন্তশ্চিত্তের (sub-conscious mind) স্তরে নানা পূর্ব্বানুভূত বিষয় অভিলাষ প্রীতি অপ্রীতি প্রভৃতি সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয় এ কথা জোর গলায় বল্‌তে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু চিত্ত (mind) জিনিষটি কি একথার ধার দিয়েও তাঁরা যান না, অথচ তাঁরা চিত্তকে (mind) জড় বলেও স্বীকার করেন না। চিত্ত যদি জড়ই না হয় তবে তার স্তর বা পর্দ্দা থাকা কিরূপে সম্ভব হয় এবং স্তরে স্তরে পূর্ব্বানুভূত বিষয় সঞ্চিতই বা কিরূপে হয়। যদি যোগের মত অবলম্বন ক'রে বুদ্ধিকে একান্তই জড় ব'লে স্বীকার করি তবে হয়ত বুদ্ধির স্তরে স্তরে সংস্কার সঞ্চিত হয় একথা বেশ চল্‌তে পারে; কিন্তু তা হ'লে বিভিন্ন সংস্কারগুলি ও বুদ্ধির চিদাভাসসম্পন্ন জ্ঞানরূপটি ইহারা প্রত্যেকে পরস্পর দৈশিক বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন হয়েও মিলিত হয় কিরূপে? এই ভাবে দৈশিক বিচ্ছেদ মান্‌তে গেলে কোনও জ্ঞানের মধ্যেই কোনও সংস্কারকে পাওয়ার উপায় নেই এবং সেই জন্য কোনও জ্ঞানের মধ্যেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রভাব থাকা উচিত নয়; অথচ আমরা প্রতি পদেই দেখ্‌তে পাই যে, আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং অনুভূত বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞানের যে শুধু একটি প্রকারের বৈশিষ্ট্য ঘটে

তা নয়, প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার নানামুখী তাৎপর্য্য (যাকে ইংরেজী পরিভাষায় meaning বলা যায়) হীরকের প্রভার ন্যায় তার চারিদিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে; এই তাৎপর্য্য ছাড়া শুধু জ্ঞান মূক। এই তাৎপর্য্যের বিশেষত্ব এই যে, এতে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞান, সমস্ত পূর্ব্বানুভূত বোধ-শরীরের মধ্যে ঠিক কি ভাবে গ্রথিত হচ্ছে সেইটি ইঙ্গিত ক'রে সূচনা করে। একজন উদ্ভিদ্বিৎ একটা গাছকে, কি একজন চিত্রী একটি চিত্রকে যে [illegible] দেখে সে দেখা একজন সাধারণ লোকের দেখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। উদ্ভিদ্বিৎ বা চিত্রীর যে উদ্ভিদ বা চিত্র দেখে নানা কথা মনে পড়ে সেই জন্যই যে তার দেখার সঙ্গে অন্যের দেখার তফাৎ তা নয়; কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা স্পষ্ট ভাবে স্মরণ না হয়েও তাদের যে কোনও দেখাটিই তার সমস্ত জীবনব্যাপী দেখা ও জানার ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত এবং সেই জড়ানোর জন্য এমন একটি বিশিষ্টভাবে বিশেষিত ও এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত, ইঙ্গিত বা তাৎপর্য্যের দ্বারা উদ্ভাসিত যে, সেই দেখাটির মধ্যে সমস্ত জীবনের দেখারও জানার ইতিহাসের একটি বিশেষ রকমের ছোপ্ লেগে থাকে। এই যে প্রত্যেক দেখার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের দেখারও জানার ইতিহাসের একটা মণি-বিচ্ছুরণ, একটা তাৎপর্য্য-ইঙ্গিত অনুষক্ত থাকে এটাকে স্মরণ বলা চলে না, সংস্কার বলা চলে না, অথচ

এইটির দ্বারা সেই দেখাটির যথার্থ বিশিষ্টতাটুকু প্রকাশ পায়। মনোরাজ্যের ব্যাপার এত জটিল, এত বিস্তৃত যে, তার একটা মোটামুটি রকমের বিশ্লেষণ কর্‌তে গেলেও একটা বিরাট্ গ্রন্থ লেখ্‌বার আবশ্যক হয়, এতটুকু ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কখনও সে কায করা চলে না। কিন্তু একটু চিন্তা কর্‌লেই দেখা যায় যে, জীবরাজ্যের ব্যাপারের চেয়েও মনোরাজ্যের ব্যাপার আরও জটিল, আরও অনেক বিচিত্র, আরও গূঢ় ও দুষ্প্রবেশ্য। মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও জ্ঞানপ্রক্রিয়া (Epistemology) এই দুই দিক্ দিয়ে মনোরাজ্যের ব্যাপার গুলি বুঝ্‌বার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চিত্ত (Mind) জিনিষটা যে কি তা আমরা একরকম কিছুই জানিনা এবং মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলির যতটুকু আমাদের কাছে ধরা পড়েছে তার অনেক বেশীগুণ জিনিষ আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। একটুখানি অস্ফুট ইন্দ্রিয়সামগ্রী থেকে একটু অস্ফুট বর্ণবোধ স্পর্শবোধ বা শব্দবোধ এবং সেই থেকেই মনোরাজ্যের ব্যাপারের আরম্ভ; আর তারপর নিরন্তর এর নিগূঢ় রহস্যের বিচিত্র লীলাময় ব্যাপার। মানসিক ব্যাপারগুলি শারীর ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব'লেই আমরা অনুভব করি এবং এই স্বাতন্ত্র্য ও পৃথকত্ব এত বহুল পরিমাণে সর্ব্বজন-স্বীকৃত ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে (Psychology) সুগৃহীত যে, কোনও মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে গেলে শারীর প্রক্রিয়া দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত প্রত্যেক মানস ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মস্তিষ্কের মস্তলুঙ্গের মধ্যে

এবং তদনুপাতি নাড়ীপদার্থের মধ্যে নানারূপ আশ্লেষ বিশ্লেষের কাজ চলেছে, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের কোনও দার্শনিক চিন্তা বা অন্যবিধ তত্ত্বচিন্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি কেউ বলে যে ঐ চিন্তাটির মূল্য আর কিছুই নয়, এ কেবলমাত্র মস্তিষ্কের কোনও অংশের মস্তুলুঙ্গ পদার্থের অর্দ্ধ আউন্সের ঈষৎ স্থানসঞ্চরণ বা আশ্লেষণ বিশ্লেষণ মাত্র, তবে সে ব্যাখ্যাটি কি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় হবে না! প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মস্তুলিঙ্গ পদার্থের কোনও না কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণরূপেই জৈব পরিবর্ত্তন; সে পরিবর্ত্তনে শুধু এইটুকুমাত্র বুঝা যায় যে জৈব ব্যাপারের সঙ্গে মনোব্যাপারের একটা অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হ'ক তাতে কখনই মনোব্যাপারের স্বরূপকে বা পদ্ধতিকে কোনওরূপে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে পারে না। জৈবব্যাপারের পিছনে সর্ব্বদাই নানারকম মনোব্যাপার কাজ করছে। এক হিসাবে যদিও জৈবশক্তিকে জড়শক্তিরই বিকার ব'লে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা জৈব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। মনোব্যাপার ও জৈব-ব্যাপারের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকলেও জৈব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং জৈব ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাতেই মনোব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। কারণ এ দুটি রাজ্যের ব্যাপার পরস্পর এতই পৃথক্ যে জৈব ব্যাপারের যতই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

করা যাক্ না কেন, জৈব ও মনোব্যাপারের পরস্পরানুপাতিত্ব নির্দ্ধারণ করতে যতই চেষ্টা করিনা কেন, একটি হইতে কিছুতেই অপরটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মনোরাজ্যের ব্যাপারও জৈবরাজ্যের ব্যাপার যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের। আধুনিককালে Russell, Watson প্রভৃতি, মনোব্যাপারগুলিকে জৈবব্যবহারের অনুরূপ ক'রে উপমায় ব্যাখ্যা করতে অনেক চেষ্টা করেছেন এবং প্রাচীনকালেও স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এই সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথা হি পশ্বাদয়ঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে। যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়ম্ ইচ্ছতি ইতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণি-মুপলভ্য তংপ্রত্যভিমুখীভবন্তি। এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রুরদৃষ্টীন্ আক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততো-নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোঽবিবেক-পুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিমতামপি প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে।" কিন্তু আমাদের অনেক বাহ্যব্যবহারের সঙ্গে পশু ব্যবহারের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মনোব্যাপারের অনেকগুলিই এমন যে সে গুলিকে কিছুতেই পশুব্যবহারের সাদৃশ্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং Russell প্রভৃতিরা অনেক চেষ্টার পর যে সমস্ত

সাদৃশ্য দেখাতে সক্ষম হ'য়েছেন, সেটুকু মনোব্যাপারের অতি অল্প স্থানই অধিকার করে। এই ব্যবহারিকদিগের (Behaviourist) মতে যেটুকু সত্যতা আছে তাতে শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে যেমন জড়ব্যাপারের খানিকটা অংশ জৈবব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে তেমনি জৈবব্যাপারেরও খানিকটা অংশ মনোব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছে। উঁচু উঁচু ধাপের প্রাণিবর্গের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে অর্দ্ধমূঢ়ভাবে জীবনযাত্রার অনুকূল কার্য্যে তৎপরতা দেখায় এবং প্রতিকূল কার্য্য থেকে নিবৃত্ত হয়, মানুষের মধ্যেও তা অনেক পরিমাণে দেখা যায়, কারণ মানুষও একটি প্রাণিবিশেষ; কিন্তু মানুষের মধ্যে জৈবকার্য্যের বা জীবনযাত্রাকার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্টও অনেক এমন ব্যাপার দেখা যায় যাকে কিছুতেই জৈবব্যাপারের অন্তর্গত ব'লে মনে করা যেতে পারে না। এইটিই হচ্ছে যথার্থভাবে মনোরাজ্যের অধিকার। Russell বলেছেন, "Man has developed out of the animals, and there is no serious gap between him and the amoeba. Something closely analogous to knowledge and desire as regards its effects on behaviour exists among animals even where what we call 'consciousness' is hard to believe in; something equally analogous exists in ourselves in cases

where no trace of 'conciousness' can be found. It is therefore natural to suppose that, whatever may be the correct definitions of consciousness, consciousness is not the essence of life or mind." কিন্তু এই কথা প্রমাণ কর্‌তে গিয়ে Russell তাঁর Analysis of Mindএ যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে মানুষের জীবনের সেই দিকটা দিয়ে যে দিকটায় সে জৈব যাত্রার প্রয়োজনের সহিত সম্বদ্ধ বা যেদিকটায় মানুষ জড় প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু আমাদের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে এবং গোটা মনোব্যাপারের আত্মগতি আত্মনিয়ম আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতনরাজ্যের নূতন নূতন নিয়মপদ্ধতি দেখ্‌তে পাই যেগুলিকে কিছুতেই জৈবব্যাপারের কোঠায় ফেলা যায় না। কেমন ক'রে একটা অস্ফুট বর্ণবোধ ক্রমশঃ সঞ্চিত হ'য়ে স্ফুট লাল বা নীল বোধে পরিণত হয়, কেমন ক'রে বোধের মধ্যে বোধ সঞ্চিত থেকে স্মৃতিরূপে প্রকাশ পায় এবং সংস্কাররূপে থেকে জ্ঞানের প্রকারকে তাৎপর্য্যসমন্বিত করে, কেমন ক'রে বিশেষ বা concrete থেকে সামান্য বা universals এর নানা সম্পর্ক বিচার ক'রে সেই প্রণালীতে বিশ্বের নানা তথ্যকে জ্ঞানের জালের মধ্যে ধ'রে রাখে, কেমন ক'রে নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারা, ইচ্ছাধারা, সুখ দুঃখ, প্রীতি অপ্রীতি, কুশলাকুশলের বিচিত্র বিভিন্নধারার মধ্য

দিয়ে মনোজীবনের ঐক্যটি নির্ব্বাহিত হয়, তা কোনও রূপেই ব্যাখ্যা করা যায় না বা তার কারণ নির্দ্দেশ করাও সম্ভবপর নয়।

তাহ'লে স্থূল কথা দাঁড়িয়েছে এই যে, জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য এই তিনটি রাজ্য পরস্পরসম্বদ্ধ হ'য়ে রয়েছে— জড়রাজ্য জীবরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং জীবরাজ্য মনোরাজ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, অথচ প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই তার নিজের বিশিষ্ট নিয়মে চালিত হয় এবং কোন রাজ্যের নিয়মের দ্বারা কোনও রাজ্যের ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রত্যেকটি রাজ্যের নানা ব্যাপারের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সে ঐক্যটির অর্থ সামঞ্জস্য। তাহার কোনও একটী ব্যাপার অপর ব্যাপারগুলিকে অতিবর্ত্তন বা অতিক্রম করে না এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগে চলে। পরস্পরের সহিত পরস্পর গ্রথিত হ'য়ে যে ইতিহাস রচনা করে সেই ইতিহাসের আনুগত্যে প্রত্যেকটি ব্যাপারের পদ্ধতি ও প্রণালী নিরূপিত হয়। এম্‌নি ক'রে প্রত্যেকটির নিজ নিজ রকমের স্বাতন্ত্র্য থেকেও সমগ্রের নিয়মের দ্বারা প্রত্যেকটি সমগ্রের অনুকূল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত থাকে। এই ঐক্যের অর্থ তদর্থযোগিতা, অর্থাৎ একটি যে অপরটির কাজে লাগ্‌তে পারে, এ সেই জাতীয় ঐক্য। এই ঐক্যের নিয়মে জড়বস্তু জীবোপযোগী কার্য্যে ব্যবহৃত হ'য়ে জীবের সহায়ক হয়, আবার জৈব ব্যাপারগুলি মনোব্যাপারের সাহায্যে লেগে মনোরা-

জ্যের কাজে লাগে। এই ঐক্যের তিনটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে; প্রত্যেকটি রাজ্য গৌণমুখ্যভাবে অপর দুইটি রাজ্যের সহায়তায় ব্যাপৃত থাকে। বিশ্বময় আমরা এই তিন রাজ্যের আদান প্রদানের পালায় নূতন নূতন সৃষ্টিপরম্পরা দেখ্‌তে পাই। এক্ দিকে দেখ্‌তে পাই যে জৈবশক্তিচক্রের সহিত জড়শক্তিচক্রের পরস্পরের অনুযোগিতায় ও সজ্ঘর্ষে ও এই অনুযোগিতা ও সজ্ঘর্ষের বিবিধবৈচিত্র্যে নানা জীবপরম্পরা গ'ড়ে উঠ্‌ছে। Struggle for existence or law of natural selection এ দুইই এই জীবজড়সজ্ঘর্ষের নামান্তরমাত্র, আবার law of accidental variation, law of mutation প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের মধ্যে জড়ের যে জীবানুযোগিতা আছে ও জৈবশক্তিচক্রের যে জড়জগৎ থেকে আহরণ করবার ক্ষমতা আছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। আবার অপরদিকে জৈবরাজ্যের ঠিক কোন্ স্থান থেকে মনোরাজ্যের বিচ্ছুরণ আরম্ভ হয়েছে তা বলা কঠিন। মনুষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছবার পূর্ব্বে অনেকদূর পর্য্যন্ত উচ্চতর প্রাণীজীবনে দেখতে পাই যে মনোরাজ্যের আত্মপ্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে জৈবরাজ্যের সজ্ঘর্ষে ঘৃষ্ট হ'য়ে জৈব ব্যাপারের দ্বারা কবলিত হ'য়ে instinctive habit বা behaviour রূপে প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যে এসে দেখি যে, জৈবশক্তির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনোরাজ্যের শক্তিও স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তথাপি একটু অনুধাবন

করলেই দেখা যায় যে, মনোব্যাপারের যতখানিকে আমরা নিছক মনোব্যাপারেরই অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করি ঠিক ততখানিই যে খাঁটি মনোরাজ্যের ব্যাপার তা নয়। জৈবশক্তির অনেকখানি মনোব্যাপারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে মনঃশক্তিরূপে প্রকাশ পায়, আবার মনঃশক্তিরও অনেকখানি জৈবশক্তি দ্বারা অভিভূত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, সুখ দুঃখ প্রীতি বিষাদ প্রভৃতি যে গুলিকে আমরা খাঁটি মনোনুভূতি ব'লে মনে করি সেগুলিও অন্তত খানিকটা পরিমাণে জৈবক্ষুধা বা জৈব আকর্ষণ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব মাত্র। আর জৈব প্রয়োজন-সিদ্ধির দাবী জৈব অর্থ অর্থির দাবী মনোব্যাপারের মধ্যে সংক্রান্ত হ'য়ে মনোব্যাপারের নানাপ্রকার স্থষ্টিরও নিয়ামক হ'য়ে ওঠে। একেও প্রকারান্তরে এক রকমের voluntarism বলা যায়। বৌদ্ধ ও যোগমতের বাসনাবাদে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ অর্থির দাবী স্বীকারের মধ্যেও বৌদ্ধদের অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদের মধ্যে এই শ্রেণীর voluntarism এর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের pragmatism বা behaviourism এর মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত মতবাদের অনেকগুলির মধ্যেই কিছুনা কিছু সত্য আছে, কিন্তু এঁদের ভ্রান্ততা এইখানে যে এঁরা একপেশে ভাবে কেবল তাঁদের দিক্ থেকেই সমস্ত জিনিষটা দেখ্‌তে চেয়েছেন। সত্য দর্শনশাস্ত্র তাকেই বলা যাবে যেটিতে সব দিক থেকে সত্য নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা থাকবে। কোনও এক-

দিককে প্রবল ক'রে দেখে যাঁরা অন্যদিক্‌গুলিকে খাট ক'রে দিতে চান বা উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের দৃষ্টি একদেশী এবং তাদের দর্শনও একদেশী। কিন্তু শুধু যে জৈব ও মনোব্যাপারের মধ্যে দান প্রতিদান, উপযোগিতা ও বিরোধিতা চলেছে তা নয়, প্রতি কেন্দ্রে, প্রতি মানুষে, যে মনোব্যাপার চলেছে, ভাষার মধ্য দিয়ে মুখ চোখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে অনবরত তাদের পরস্পরের যে বিনিময় চলেছে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্যগঠনে তার স্থান বড় কম নয়। বস্তুত জৈবরাজ্যের কবল থেকে মানুষের মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গ'ড়ে উঠ্‌তে পেরেছে তার সর্ব্বপ্রধান কারণই হচ্ছে মনে মনে আদান প্রদান। জৈব জগতে যেমন দেখা যায় যে, বিভিন্ন জীবকোষের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যেই উচ্চতর প্রাণীর জীবনে প্রত্যেক জীবকোষের জীবনে একটি অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এনে দেয়, আবার সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জীবকোষ সমষ্টির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং জীবকোষসমষ্টির বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যেক জীবকোষের আবার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে, এখানেও তেম্‌নি নানা মনের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে প্রত্যেকটি মন তার নিজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং প্রত্যেক মনের এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার দ্বারা মনঃসমষ্টি ব'লে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্যের সত্তা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, এবং এই মনোরাজ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা আবার প্রত্যেকটি মন অনুভাবিত হ'য়ে ওঠে। মানুষ যদি মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে বেড়ে না

উঠ্‌ত তবে মানুষের মন তার জৈবপ্রকৃতি থেকে কখনই নিজেকে উপরে তার নিজের যথার্থ রাজ্যের মধ্যে ভাসিয়ে তুল্‌তে পার্‌তো না। Trans-subjective ও intra-subjctive intercourse এর যদি অবসর মানুষ না পেত তবে মানুষের মন কখনই তার চিন্ময় ও চিন্তাময়রূপে বেড়ে উঠ্‌তে পার্‌ত না।

এতক্ষণ যা কিছু বলা হোল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, মন ব'লে কোন একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নেই, কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরাকে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝাবার জন্য মন শব্দটি ব্যবহার কর্‌ছি। যেমন জড়রাজ্য, জৈবরাজ্য, তেম্‌নি মন বল্‌তেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বোঝা যায়। এই রাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার কোথায় সামঞ্জস্য, কোথায় তাদের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, কি তাদের প্রকারপরম্পরা এ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এখন শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে জৈব রাজ্যকে আশ্রয় ক'রে স্তরে স্তরে অস্ফুট থেকে স্ফুটতরভাবে এই মনোরাজ্য তার বিচিত্র ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে। জৈবরাজ্যের প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই, সে ব্যক্তিত্ব মৃঢ়, সে ব্যক্তিত্বের মূল হচ্ছে জৈবব্যাপারের নিয়মকেন্দ্র, সামঞ্জস্য-কেন্দ্র; তার প্রত্যেকটি ব্যাপার যে তার অন্য ব্যাপারগুলিকে অপেক্ষা ক'রে চলে, এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার যে অন্য ব্যাপার গুলির আনুকূল্যে আপনাকে ব্যক্ত করতে চায়, কোনও সম্বন্ধটিই

যে স্থির হ'য়ে না থেকে অপর সম্বন্ধগুলির সহিত স্বতঃই আবর্ত্তিত হ'তে থাকে, এইখানেই জীবকোষের ব্যক্তিত্বের মূল! কিন্তু মনোরাজ্যের ব্যক্তিত্বটিকে আমরা self ব'লে আত্মা ব'লে অনুভব ক'রে থাকি। কিন্তু আমি এতক্ষণ যা বলেছি তাতে আত্মা ব'লে কোনও স্থায়ী বস্তুর কথা বলিনি। এখনও বলতে চাই নে। যা চাই সে হচ্ছে, এই আত্মপ্রত্যয়ের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া। আত্মা কাকে বলে এ কথা নিয়ে আমাদের দর্শনশাস্ত্রে খুব বিচার হয়েছে; বৌদ্ধেরা বলেছেন যে আত্মা ব'লে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ বা বিবিধ Psychological entities এর সমষ্টি ছাড়া কোনও স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বেদান্ত বলেছেন যে, বিশুদ্ধ চিৎপ্রকাশের নামই আত্মা, কিন্তু আমি বল্‌তে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে এই অসীম চিৎপ্রকাশের একটা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন মিথ্যা রূপ। ন্যায় বলেছেন যে, আত্মা হচ্ছে জড়বৎ একটি বস্তু, সে বস্তুকে আমাদের এই জন্য মান্‌তে হয় যে তা না হ'লে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলির ত কোনও একটা থাকবার আশ্রয় থাকে না কারণ গুণমাত্রকেই কোনও বস্তুকে আশ্রয় ক'রে থাক্‌তে হবে, অথচ আমাদের জানা এমন আর কোনও বস্তু নেই যাকে জ্ঞানের আশ্রয় বলা যায়। এর কোনও মতের সহিতই আমি সায় দিতে পরি নে। চিৎপ্রকাশ ব'লে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ কেন মানি নে সে কথা সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বলেছি। ন্যায়ের আত্মা প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত নয় ব'লে

তারও কোন বিচার করা প্রয়োজন মনে করি নে। বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, প্রতিমুহূর্তের ক্ষণধ্বংসী স্কন্ধসমষ্টি ছাড়া তাঁরা কোনও স্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন না। অথচ আমরা আত্মা বা self বল্‌তে যা বুঝি সেটা শুধু চিৎপ্রকাশও নয়, বা মুহূর্তের চিন্তা ভাব প্রভৃতির সমষ্টিও নয়। আত্মা বা self বল্‌তে যা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা জীবনের সমস্ত অনুভূতির সমস্ত experienceএর একটা সঞ্চিত ইতিহাসের অভিব্যক্তি। জৈব-রাজ্যের সঙ্গে মনোরাজ্যের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষ ও আদান প্রদানে, বিভিন্ন মনের পরস্পরের আদান প্রদানে, জৈবসংযোগের মধ্য দিয়ে জড়রাজ্যের সহিত আদান প্রদানে, জৈবপ্রয়োজনের অর্থার্থির ব্যবহারে, মনোরাজ্যের নানা ব্যাপারের সংযমন নিয়মনে যা কিছু মনে ভেসে উঠ্‌ছে এবং ডুবে যাচ্ছে, তার সবগুলিই একটা বিশিষ্ট নিয়মে পরস্পর অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে গ্রথিত হচ্ছে, এবং এই সঞ্চয় ও গ্রন্থনের প্রাচুর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের ইতিহাসের মধ্যে আমরা আমাদের আত্মবোধ বা অহম্‌বোধকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি। এই হিসাবে দেখ্‌তে গেলে আত্মা ব'লে যা বুঝি সেটি একটি concrete entity অথচ সে entityটী একটী স্থির পদার্থ নয়; অথচ ক্রমধারারূপে সেটি প্রতিভাত হয় না; আমাদের যা কিছু অনুভূতি যা কিছু experience হয়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে হ'য়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছে; সে সত্তার মধ্যে অনুভূতির ক্রম নাই, আছে পূর্ব্বাপরের

ক্রমাতীত অখণ্ড সত্তা। যত নূতন নূতন অনুভূতি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, সুখদুঃখাদি নানা ভাবসম্বিৎ নূতন নূতন সঞ্চিত হ'তে থাকে সেগুলি সেই পূর্ব্বসঞ্চয়ের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে সেই অখণ্ড সত্তাটিকে স্ফুটতর বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নূতন নূতন ভাবে অভিব্যক্ত ক'রে তুল্‌তে থাকে। আমার ছেলেবেলা আমাকে 'আমি' বল্‌তে যা বুঝতাম্ তার অধিকাংশই খেলাধূলা ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে ব'লে একটা জৈববোধের মধ্যেই অনেকখানি আবদ্ধ। ক্রমশঃ নূতন অনেক দেখি, শুনি, অনেক চিন্তা করি, অনেক নূতন কাজে প্রবৃত্ত হই, অনেক রকমের সুখদুঃখের আস্বাদ পাই, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার আমিত্বও বাড়তে থাকে। সত্য বটে, আমাকে 'আমি' ব'লে যখন আমি বলি তখন কোনও একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি আমাদের কাছে আসে না, আসে যেটা সেটা হচ্ছে একটা অব্যক্ত অনুভূতি, অথচ সে অব্যক্ত অনুভূতির এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে বিশিষ্টতা-টুকুর একটা অদৃশ্যরূপ, একটা অস্পৃশ্য স্পর্শ এমন আছে যা কখনও ভুল হওয়ার নয়। এখনকার 'আমি' যে কি তা 'আমি' ব'লে বোঝাতে পারি না, কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে 'আমি' বল্‌তে আমার মধ্যে যে সাড়া পেতাম তার চেয়ে যে এটি অনেকাংশে ভিন্ন এ কথা আমি বেশ বুঝতে পারি। এর কারণই হচ্ছে এই যে 'আমি' বল্‌তে আমি যা বুঝি সেটা হচ্ছে আমার অন্তর্জ্জীবনের সমস্ত অনুভূতির একটি অখণ্ড দীর্ঘ ইতিহাস; অখণ্ড ব'লেই সেই

ইতিহাসটি সকল সময়েই আমার সাম্‌নে জাগরূক, সেটি এর অবিভাজ্য ইতিহাস ব'লেই তার কোনও ধরা-ছোঁয়া যায় এমন হ নেই এবং ক্রমাতীত অখণ্ড ইতিহাস ব'লেই মনোরাজ্যের সম বৈচিত্র্যের মধ্যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও এই 'আমির' মে এমন একটি ঐক্য আছে যে ঐক্যটি তার সমস্ত ইতিহাসকে এক অখণ্ড পদার্থের ন্যায় ব্যবহার কর্‌তে পারে, এবং তার মধে যে শক্তিটি ধৃত হ'য়ে র'য়েছে তাকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে, প্রয়ো কর্‌তে পারে। কোনও 'আমি'ই তার ইতিহাসের পিণ্ডীকৃত প্রত্যয়সঞ্চয়কে অস্বীকার কর্‌তে পারে না। আমি-প্রত্যয়ে মধ্যে সমস্ত প্রত্যয়সঞ্চয় এমন ক'রে পিণ্ডীকৃত হয় যে তার ভিতর থেকে কোনও একটি প্রত্যয়কে হয়ত সব সময়ে পৃথক ক'রে স্মরণ কর্‌তে পারা যায় না, কিন্তু পৃথক করতে পারা যায় না ব'লেই এই ইতিহাসের সঞ্চয়টি এত ঘন এবং অখণ্ড। অথচ এই আমিত্ববোধের মধ্যে সমস্ত মনোরাজ্যটি ধৃত হ'য়ে রয়েছে ব'লে এই অখণ্ড বোধটির মধ্যে মনের সমস্ত ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে র'য়েছে। যখন এই 'আমি' কোনও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত মনটি তার অখণ্ড অতীত ইতিহাস নিয়ে তার জমাট শক্তি নিয়ে তা বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সমস্ত মনের ইতিহাস 'আমি'র মধ্যে আছে ব'লে 'আমি' একটা বিচিত্রতাময় complex unity বা entity এবং সেই জন্যই এর মধ্যে শারীর অনুভূতির অংশ এবং জৈব অনুভূতির অংশগুলিও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই 'আমি'টি স্থির

না হ'য়েও স্থির, স্থির হ'য়েও সর্ব্বদাই বর্দ্ধনশীল ও পরিবর্ত্তনশীল। তা হ'লে ফল কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে মানুষ বল্‌তে আমরা যা বুঝি সেটা জড় জীব ও মন এই তিন রাজ্যের সংঘাতে উৎপন্ন এবং এই তিন রাজ্যের সংঘাতে যে উপাদান প্রস্তুত হ'তে থাকে তারই উপাদানসঞ্চারে ক্রমবর্দ্ধনশীল। জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য এ তিনটি যেমন সত্য, এই তিনটির পরস্পরসংঘাতে বা পরস্পরের উপযোগিতায় যা উৎপন্ন হয় তাও তেম্‌নি সত্য; সেইজন্য মানুষও মিথ্যা নয়, তার আমিত্ব ও মিথ্যা নয়, তারা উভয়েই সত্য। এ সংসার আদানপ্রদানের সংসার, গ্রহণবর্জ্জনের সংসার, পরস্পরোপযোগিতার সংসার; এবং এই দৃষ্টিই হচ্ছে এর তত্ত্বদৃষ্টি। এই চাঞ্চল্যের মধ্যে না দেখে যদি অন্যদৃষ্টিতে একে দেখ্‌তে যাওয়া যায় তবে একে দেখা যাবে না। সব জিনিষই সত্য যদি যে দিক্ থেকে তাকে দেখ্‌তে হবে সেই দিক্ থেকে তাকে দেখা যায়, আবার সব জিনিষই মিথ্যা যদি যে দিক্ থেকে তাকে দেখ্‌তে হবে সে দিক্ থেকে তাকে না দেখা যায়।

কিন্তু শুধু জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য নিয়ে আলোচনা কর্‌লে গোটা মানুষটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যেমন জীবরাজ্যকে আশ্রয় ক'রে মনোরাজ্য আত্মপ্রকাশ করে, তেম্‌নি মনোরাজ্যকে অবলম্বন ক'রে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরাজ্য বা আনন্দরাজ্য প্রকাশ পায়। এই রাজ্যের প্রকাশের উপরই মানুষের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানুষ যে শুধু বাঁচে, কি চিন্তা করে

তা নয়, মানুষের মধ্যে একটা সত্যলিপ্সা, মঙ্গলেচ্ছা, সৌন্দর্য্যলিপ্সা একটা ভক্তিলিপ্সাও কাজ করে। মনোরাজ্যটি অনেকখানি পরিমাণে জৈবভাবের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট এবং প্রয়োজনসম্বন্ধের সহিত যুক্ত কিন্তু এই বিজ্ঞানানন্দ রাজ্যটি একেবারে প্রয়োজনসম্পর্করহিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি রাজ্যের মধ্যে যেমন নানাবিধ জটিলতা দেখতে পাওয়া যায় এর মধ্যে তা নেই, এ যেন একটি ছায়ালোক; এই ছায়ালোকের দীপ্তিতে মানুষের মনোজীবন যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন যেন সে এক নবীন জীবন লাভ করে। আমরা যত রকমের কাজ করি আর যত রকমের কাজ করি না, এর মধ্যে নিরন্তর একটা তুলনা উঠ্‌তে থাকে, এই কাজটা ভাল কি ঐ কাজটা ভাল, এটা উচিত কি ঐটা উচিত; এই যে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের তুলনা, ভাল-মন্দের তুলনা, এটা ঠিক্ সুবিধা-অসুবিধার তুলনা নয়। সুবিধা-অসুবিধার তুলনা প্রয়োজনসিদ্ধির তারতম্যের তুলনা, জৈবব্যাপারের স্বতঃপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই সেটা সুসম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু এই ভাল-মন্দের তুলনা সুবিধা-অসুবিধার তুলনা নয়, হয়ত যেটা আপাততঃ নিতান্ত অসুবিধার সেইটাই ভাল এবং উচিত ব'লে প্রতিভাত হয়। এই যে ঔচিত্যের মূল্যনির্দ্ধারণ, ভালর মূল্যনির্দ্ধারণ, এটা আমাদের সমস্ত জৈবপ্রবৃত্তির উপরে দাঁড়িয়ে জৈবপ্রবৃত্তিকে দমন কর্‌তে চায়, এবং আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়েই জৈবপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির প্রতিকূলে আমাদের প্রণোদিত করে। কিন্তু সমস্ত জীব জগতের ইতিহাস পর্য্যা-

লোচনা ক'রলে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছান যায় যে, জৈবপ্রবৃত্তির অনুকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূলে যেটা সেটাকেই ভাল ব'লে, মূল্যবান বলে, করণীয় ব'লে গ্রহণ করা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণের বৃত্তি, এবং এই বৃত্তি অনুসরণ ক'রেই জীবজগতে নূতন নূতন স্তরের প্রাণীর উৎপত্তি হ'য়েছে এবং যারা এই বৃত্তিটিকে যত বেশী ক'রে পালন ক'রতে পেরেছে তারা এবং তাদের সন্তানসন্ততিরাই জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আত্মরক্ষা ক'রে বেঁচে রয়েছে। তাই জৈব ও মনোব্যাপারের সমস্ত কাঠামটার মধ্যে এই অর্থ-অর্থির সম্বন্ধ ও এই প্রয়োজনসিদ্ধির দাবীটি আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। অতিমূঢ় অবস্থা থেকে অতিনীচ বস্তর থেকে জীব এই প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুসন্ধান ক'রে নিজেকে জীবনযুদ্ধে জয়ী ক'রে রাখতে পেরেছে, তাই এই বোধটা তার শরীরের প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে এবং তার চিন্তাজালের শততন্তুর মধ্যে তাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। এর অভিভাবকতা স্বীকার না ক'রলে জীবজগৎ চলে না। অথচ উন্নত মানুষের জীবনে যে একটা এমন বৃত্তি জন্মে যার দ্বারা সমস্ত জীবজগতের নিয়ম উল্লঙ্ঘন ক'রে একটা নূতন মূল্যনির্দ্ধারণের সূত্র আবিষ্কার ক'রে প্রয়োজনসিদ্ধির চেয়েও প্রয়োজনবিসর্জ্জনের দাবীকে বড় ক'রে তোলে, সমস্ত জীবজগতের ইতিহাসে এটি একটি অভিনব ব্যাপার। এই যে প্রয়োজনসিদ্ধির বাহিরে শ্রেয়ঃসিদ্ধির একটা স্বতন্ত্র দাবী মানুষের মধ্যে কাজ করে, একথা উপনিষদের যুগ থেকেই আমাদের দেশে স্পষ্টভাবে আলোচিত হ'য়েছে। কঠ

উপনিষদ্ বলছেন, 'অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।' অর্থাৎ শ্রেয় এবং প্রেয়ের বাঁধন দুই দিক্ থেকে মানুষকে বাঁধে। ব্যাসভাষ্য এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন, 'চিত্তনদী খলু উভয়তোবাহিনী বহতি পাপায় বহতি কল্যাণায়।' সাঙ্খ্যযোগমতে সমস্ত প্রকৃতি মানুষকে দুই দিক্ দিয়ে আকর্ষণ করে, একদিকে ভোগের দিকে, প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে, অপরদিকে প্রয়োজন-বর্জ্জনের দিকে, অপবর্গের দিকে। য়ুরোপে কাণ্ট একে ব'লেছেন rational willএর বাণী, তাঁর মতে এ বাণী নিত্যবাণী, এই নিত্য-বাণী মানুষকে যেদিকে টানে তার মধ্যে প্রয়োজনের দাবীর গন্ধমাত্রও নেই। সকলের মধ্যে সমানভাবে এই অজর অমর অক্ষয় বাণী ধ্বনিত হ'য়ে প্রয়োজনসিদ্ধির গণ্ডী থেকে বহু ঊর্দ্ধে মানুষকে টেনে তুলতে চায়। কাণ্টের সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য এই যে, আমি এ বাণীকে নিত্য ব'লে মনে করি না; প্রয়োজনসিদ্ধির গণ্ডীর মধ্য থেকে ধীরে ধীরে এই বাণী ঊর্দ্ধে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে, এবং উন্নতির বিভিন্ন স্তরে ক্রমশঃ স্ফুটতর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। মনোরাজ্যটি যে ভাবে জীবরাজ্য থেকে মণিবিচ্ছুরণের ন্যায় বিচ্ছুরিত হ'য়েছে, পুষ্পবৃক্ষের মুকুলসম্ভারের ন্যায় পুষ্পিত হ'য়েছে, এ রাজ্যটিও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে মনোরাজ্যের শীর্ষদেশ থেকে পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে। মনোরাজ্যটি সাগরমধ্যস্থ দ্বীপখণ্ডের ন্যায় ধীরে ধীরে যেমন জীবরাজ্যের মধ্য থেকে উত্থিত হয়, এবং এই উত্থানের অনেকদূর পর্য্যন্ত জৈবরাজ্যের অভিষেকে অভিষিক্ত থাকে, এই বিজ্ঞানানন্দ-

রাজ্যটাও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে মনোরাজ্যের মধ্য থেকে উত্থিত হয় এবং সেইজন্য নিত্য নয় কিন্তু উদ্ভবনশীল, এক নয় কিন্তু বিচিত্র প্রকাশে প্রকাশময়। এই জন্যই দেশভেদে জাতিভেদে শিক্ষাভেদে মানুষভেদে এই বিনাপ্রয়োজনের, প্রয়োজনবিসর্জ্জনের, আত্মত্যাগের বাণীটি নানা আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। এম্‌নি ক'রে নূতন রাজ্যের মধ্যে মনোভূমির প্রান্তভাগে যুগে যুগে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্তরে নূতন নূতন মূল্য-সৃষ্টি চলেছে এবং এই অলৌকিক মূল্য-সৃষ্টির প্রভাবে আমাদের সমস্ত কাজের ভালমন্দ নির্দ্ধারিত হচ্ছে এবং এরই অলৌকিক নিয়ন্ত্রনের ফলে মানুষ ভোগের আকর্ষণ থেকে ত্যাগের বহ্নিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জগতের কল্যাণে ব্রতী হ'তে পার্‌ছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাও এই লোকেরই বাণী। কঠ উপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে পাই যে নচিকেতা সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেছিলেন যে তিনি কিছুই চান না কেবল জান্‌তে চান মৃত্যুর পর কি হয়। উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্বলোকের একটু স্পর্শ পেয়ে ব্রহ্মানন্দে অধীর হ'য়ে উঠ্‌তেন—এ যে আনন্দময় লোক, মনোরাজ্যের সমস্ত বন্ধন এখানে ছিন্ন হ'য়ে গেছে—'যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্। অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা

বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসঃ অনন্বাগতং পুণ্যেনঅনন্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।' মানুষ যখন তার কামনার রাজ্য থেকে প্রয়োজনের রাজ্য থেকে ঊর্দ্ধে আপনাকে তুল্‌তে পারে তখনই এই ব্রহ্মলোকের স্পর্শ লাভ কর্‌তে পারে—'সদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।'

এই লোকের উপলব্ধির জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বুদ্ধ বলেছিলেন, "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্। ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ং চ যাতু॥ অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং। নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥' সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের জিজ্ঞাসার মূলে এই আনন্দলোকের একটি স্পর্শ রয়েছে। ঋষি যিনি, যোগী যিনি, ব্রহ্মবিৎ যিনি, তিনি এই লোকের স্পর্শে ডুবে যেতে চান। "স যথা সৈন্ধবঘনেঽনন্তরোঽবাহ্য কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব"। বিভিন্নদেশের বিভিন্নকালের বিভিন্ন সাধকের নিকট এর কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, কিন্তু সকল দেশের সকল সাধকই এর রসাস্বাদ পেয়েছেন। দাদূ দয়াল্ এই উপলব্ধিকেই লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—

জ্ঞান লহর্ জহাঁ থৈঁ উঠৈ বাণীকা পরকাস
অনভৈ জহঁা থৈঁ উপজৈ সবদৈঁ কিয়া নিবাস
সো ঘর সদা বিচার কা, তহঁা নিরংজন বাস

তহঁ তূ দাদূ খেজি লে ব্রহ্ম জীব কে পাস ॥
জহঁ তন্ মনকা মূলহৈ, উপজৈ ওঁকার।
অনহদ সেঝা সবদ্ কা, আতম করৈ বিচার
ভাবভগতি লৈ উপজৈ, সো ঠাহর নিজ সার
তহঁ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নির্ধার ॥

জালালুদ্দিন রুমি এই তত্ত্বকেই লাভ ক'রে বলেছিলেন,—

I have put duality away, I have seen that the
two worlds are one ;
One I seek, one I know, one I see, one I call.
I am intoxicated with love's cup, the two
worlds have passed out of my ken ;

আবার

In my heart thou dwellest else with blood I'll
drench it.
In mine eye thou glowest else with tears I'll
quench it.
Only to be one with thee my soul desireth—
Else from out of my body, hook or crook, I'll
wrench it.

আবার

O my soul, I searched from end to end ; I saw

in thee naught save the Beloved; call me not infidel. O my soul, if I say that thou thyself art He.

রামানন্দ রায় যখন শ্রীচৈতন্যের মনোভাব স্পর্শ ক'রে পরমতত্ত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—

না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।

তখনও তিনি এই তত্ত্বেরই আস্বাদ বর্ণন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এম্‌নি ক'রে নানাদেশের নানাকালের সাধকেরা এই তত্ত্বের নানা আস্বাদ তাঁদের বাণীতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই সমস্ত আস্বাদের মধ্যে প্রকৃতিগত নানা বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি কথা ফুটে উঠ্‌ছে যে এ যে লোকের স্পর্শ তাকে মনোরাজ্যের চিন্তার জালে ধরা যায় না, একে কথায় বোঝা যায় না, একে খালি অলৌকিক স্পর্শে পাওয়া যায়।

এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শ যে শুধু কর্ম্মসাধক বা ধর্ম্মসাধকের জীবনেই ধরা পড়ে তা নয়, যিনি সৌন্দর্য্যের সাধক তাঁরও অনুপ্রাণ এই থেকেই আসে; এই লোকেরই একটু স্পর্শ তিনি বর্ণের ছন্দ ধরতে চেষ্টা করেন; এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শেই যে আমাদের জীবন সৌন্দর্য্যময় হ'য়ে ওঠে সে কথা Shelley তাঁর একটি কবিতায় বোঝাতে চেষ্টা ক'রে বলেছেন :—

The awful shadow of some unseen power
Floats though unseen among us—visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that weep from
flower to flower,—
Like moon beams that behind some
piny mountain shower,
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance ;
Like hues and harmonies of evening,
Like clouds in starlight widely spread,
Like memory of music fled,
Like aught that for its grace may be
Dear and yet dearer for its mystery.

* * *

I vowed that I would dedicate my powers
To thee and thine—have I not kept the vow
with beating heart and streaming eyes, even now
I call the phantoms of a thousand hours
Each from his voiceless grave, they have in
visioned bowers

Of studious zeal or love's delight
Outwatched with me the envious night
They know that never joy illumined my brow
Unlinked with hope that thou wouldst free
This world from its dark slavery.
That thou—O awful loveliness
Wouldst give whate'er these words cannot express

রবীন্দ্রনাথ এই স্পর্শকেই তাঁর কাব্যের উৎস ব'লে বর্ণনা ক'রে লিখেছেন :—

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন স্বরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাষারে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,

যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার,—
দেখে তুমি হাসো বুঝি ?
কেগো তুমি কোথা রয়েছো গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এম্‌নি ক'রে এই অলৌকিক একটি রাজ্য আমাদের মনোরাজ্যের ঊর্দ্ধে থেকে কখনও বা মনোরাজ্যের মধ্যে তার আলোকরশ্মি ফেলে তাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌ছে, কখনও বা তার অলৌকিক শক্তির দাবীতে মনোরাজ্যের এবং জৈবরাজ্যের সমস্ত দাবীকে ক্ষুদ্রতায় হীন ক'রে দিয়ে আপনার অসীম গৌরব ও বৈভবকে প্রকাশ ক'র্‌ছে। মনোরাজ্যের মধ্যে এ রাজ্যের সত্তার আভাস মাত্র পাই, কিন্তু এ রাজ্যের সম্পদ্‌কে মনোরাজ্যের নিয়মের দ্বারা ধরবার কোনও উপায় নেই। যে সমস্ত সাধকেরা এ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছেন তাঁরা বলেছেন যে মনোরাজ্যের ধ্বংস না হ'লে এ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু যদি মনোরাজ্যের ধ্বংস ঘটে তবে এ রাজ্যে প্রবেশ হ'লে তার অনুভূতি যে কি হবে সে কথা মনোরাজ্যের ভাষায় বলা

যায় না। এইখানেই mysticদের রহস্য। যে দার্শনিক তাঁর দর্শনবিচারে এই রাজ্যের অনুভূতিকে তাঁর তথ্যবিচারের মধ্যে গ্রহন করেননি সে দর্শনশাস্ত্র অতি দীন। কারণ এইরাজ্যের স্পর্শেই মানুষের মনুষ্যত্ব। দর্শনশাস্ত্রের বিচারের মধ্যে সমস্ত অনুভূতির, সমস্ত তথ্যের স্থান পাওয়া উচিত, সেইজন্য যে দর্শনশাস্ত্র শুধু এই পরতত্ত্বকেই স্বীকার ক'রে পরিদৃশ্যমান আর সমস্তকেই মিথ্যা মায়া ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখ্‌তে চান, দর্শনশাস্ত্রহিসাবে সে দর্শন অতি সঙ্কীর্ণ। বিভিন্ন রকমের বিশেষত্ব নিয়ে আমাদের চোখের সাম্‌নে এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও আনন্দময়, চারটি রাজ্য পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে; এই চারটি রাজ্যই সমান ভাবে সত্য এবং চারটী রাজ্যের পরস্পরের আদানপ্রদানে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তাও ঠিক সেইভাবেই সমান সত্য। এ পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে যত প্রচেষ্টা হয়েছে তার কোনোটাতেই চারটি রাজ্যের কোনওটীর তথ্য অপর কোনটির নিয়মের দ্বারা বা ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। যদি কোনো একটি এমন তত্ত্ব পাওয়া যেত যার দ্বারা এই চারিটিরই ব্যাপার ব্যাখ্যা করা চল্‌ত তাদের বৈচিত্র্যের উপপত্তি করা সম্ভব হোত তবে সেরকম অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা যেতে পার্‌ত। এই চারটী জগতের যে পরস্পরাপেক্ষি বৈচিত্র্য এই নিয়েই হচ্ছে জগতের ও মানুষের জীবন; এ বৈচিত্র্যকে না মান্‌লে জীবনকেই মানা হয় না। ঐক্য আমরা

খুঁজি বটে, কিন্তু বৈচিত্র্যকে না মান্‌লে ঐক্যকেই মানা হয় না।—সমস্তকে হারিয়ে সমস্তকে মিথ্যা ব'লে সরিয়ে দিয়ে যে ঐক্য পাওয়া যায় সে ঐক্য রিক্ততার ঐক্য, মুক্তির ঐক্য নয়।

"রাত্রিঘেরা স্বপ্নমাঝে গর্ব্বে ছিনু ভরি,
আপনাকে শূন্য দেখে মুক্ত মনে করি।
এখন মনে হয়
আপনারে রিক্ত করা মুক্ত করা নয়"॥*

চারটি বিচিত্র জগতের ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের ছন্দটি যে মানুষের মধ্যে ধরা পড়েছে এবং এই চারটি জগৎ যে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে এবং তাদের চরম সার্থকতারূপে মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তুলেছে, তাদের বিচিত্র স্বরসঙ্ঘাত যে মিলিত হ'য়ে অখণ্ড একটি মানুষের স্বরে নিরন্তর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে এই দৃষ্টিই দর্শনের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই মুক্তির দৃষ্টি।

---

* রিক্ত ও মুক্ত কুমারী মৈত্রেয়ী দেবী—বিচিত্রা ফাল্গুন।

## পরিচয়

বীজের মধ্যে যখন গাছটি থাকে তখন সে থাকে সুপ্ত। তাহার প্রাণ থাকে, কিন্তু সে প্রাণের ক্রিয়া নাই। তাই শতশত বৎসর ধরিয়াও যখন বীজের নিবিড় আবরণের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে তখন তাহার প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, সে সৎ হইয়াও অসৎ হইয়া থাকে। বীজ যখন মাটির মধ্যে প্রোথিত হয় তখন মৃত্তিকামাতার স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া বীজগর্ভস্থ বৃক্ষশিশুর মধ্যে যে রাসায়নিক ও জৈব ক্রিয়া চলিতে থাকে তাহার ফলে বীজশিশু বীজমাতার দেহ হইতে আহারসামগ্রী আহরণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার আপন বৃক্ষসত্তার পরিচয় লাভ করিতে থাকে। এই পরিচয়ের ফলে সে তাহার আপন আভ্যন্তরীণ তপস্যার তাপে বীজদেহকে দ্বিধাভিন্ন করিয়া একদিকে যেমন ঊর্দ্ধে আকাশলোকের দিকে মাথা বাড়াইয়া তোলে, অপরদিকে তেমনি নিম্নদিকে শিকড়-প্রতানের সৃষ্টি করিয়া মাটির কর্দ্দমের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া সেখান হইতে আহাররস সংগ্রহ করিতে থাকে। এই ব্যাপারের আরম্ভ হইলেই বীজমাতার সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ইহার পর বৃক্ষশিশুর মধ্যে যখন তাহার নানাবিধ জৈববৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং তাহার ফলে সে একদিকে মাটির মধ্যে তাহার শিকড়

বিস্তৃত করিতে থাকে ও অপরদিকে আলো আকাশ ও বাতাসের মুক্তলোকে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর প্রদেশে আপনাকে প্রচালিত করে তখন চারিদিকের আবেষ্টনের সহিত সম্পর্কে আসিয়া তাহার অন্তরস্থ নানা জৈববৃত্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে। এই নানাবৃত্তির মধ্যে, ও আবেষ্টনের নানা উপাদানের মধ্যে, নানা ক্রিয়ার মধ্যে, নিরন্তর আদানপ্রদানের নানা সম্পর্কপরম্পরার যে সামঞ্জস্য সংসাধিত হইতে থাকে তাহাই বৃক্ষসত্তাস্বরূপ, সেইখানেই তাহার আত্মপরিচয়। এই ব্যাপারপরম্পরার মধ্যে যখনই কোন বিরাম ঘটে, যখনই কোন বাধা আসে, তখনই বৃক্ষসত্তার সহিত অভিন্ন যে তাহার আত্মপরিচয় তাহা ব্যাহত হয়। ক্রমবিকাশের নিরন্তর নানা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া বৃক্ষ যখন আপন পরিচয়কে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে থাকে তাহার ফলে নানা পত্ররাজিতে সে আপনাকে সুশোভিত করিয়া তুলে। প্রতিবৎসর আপন পত্রের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন কুসুমে আপন যৌবন উদ্ভিন্ন করিয়া তুলে এবং ফলভারনম্র হইয়া একদিকে যেমন নরসমাজ ও প্রাণিসমাজের কল্যাণ সম্পাদন করে অপরদিকে তেমনি আপন সত্তার অখণ্ড পরিচয়কে বীজরূপে প্রকাশ করিয়া নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়ের মর্ম্মকথাটিকে জ্ঞাপন করিয়া যায়। সেই পরিচয়ের বীজ হইতে ধারাপ্রবাহে অনন্তকালের সরণীতে সেই বৃক্ষ আপনাকে দূর ভবিষ্যৎলোকের মধ্যে নামরূপে ব্যাপ্ত করে।

পরিচয় বলিতেই বুঝা যায় সম্পর্কের পারম্পরিকতা। একটি

সম্বন্ধ যে আর একটি সম্বন্ধের মধ্য দিয়া ও সেই সম্বন্ধটি যে পূর্ব্বেরটির মধ্য দিয়া ও আরও নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রতিফলিত করিয়া তুলে, এই যে সম্পর্কচক্রের নিরন্তর আদান-প্রদান, আত্মবিনিময়, ইহাই বস্তুর সত্তা, বস্তুর আত্মপরিচয়। একটি বৃক্ষের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে একদিকে তাহার আভ্যন্তরীণ বৃত্তিনিচয় (Function) অপরদিকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ( Structure ) এবং অপর আর একদিকে তাহার আবেষ্টন (Environment) এই তিনটিকে লইয়া যে নানা সম্পর্কের আদান প্রদান চলিয়াছে তাহাতেই বৃক্ষজীবন আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। গ্রহণ, ধারণ, পোষণ, বর্জ্জন প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকে বৃত্তি বা fuction বলা যায় কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিম্বা আবেষ্টন হইতে ভিন্ন হইয়া এই বৃত্তিগুলির কোনই প্রকাশ নাই। আবেষ্টন হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে আবেষ্টন, বৃত্তি হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বৃত্তি, এমন কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ইহাদের কাহাকেও অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র পরস্পরের সম্পর্কেই ইহাদের স্বরূপ ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। বৃক্ষজীবনের মধ্যে সুপ্তপ্রায় হইয়া যে সমস্ত শক্তি ও বৃত্তি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহাই যখন নিরন্তর পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়া আপনাকেই প্রকাশ করিয়া তুলে তখনই আমরা বৃক্ষজীবনের যথার্থ আত্মপরিচয়ের সন্ধান পাই। বাহির হইতে

স্থূল ভাবে দেখিতে গিয়া আমরা হয়ত তাহার একটি অঙ্গকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অবয়ব, সংস্থান, সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কি উপায়ে, ও কি যান্ত্রিক কৌশলে মাটির রস মহোচ্চ তালবৃক্ষের পত্রপুঞ্জের মধ্যে আরোহণ করে এবং শর্করারূপে পরিণত হয় বৈজ্ঞানিক সেই সম্বন্ধে নানা অনুশীলন করিতে পারেন ও নানা তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন কিন্তু ইহার কোনটিই বৃক্ষজীবনের আত্মপরিচয় নহে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সমস্ত বৃত্তিনিচয়, সমস্ত শক্তিসংগ্রহ, সমস্ত আবেষ্টন ইহা লইয়া যে একটি 'সমগ্র' (অবয়বী) (whole) হয় তাহাতেও বৃক্ষের আত্মপরিচয় নাই। কিন্তু এই সমস্তগুলির মধ্যে যে নিরন্তর একটি আত্মবিনিময় চলিয়াছে এবং সেই আত্মবিনিময় দ্বারা বৃক্ষের যে অপরিস্ফুট আন্তর রূপ পরিস্ফুট ও ব্যাপ্ত হইয়া চলিতেছে তাহাই বৃক্ষের স্বরূপ ও আত্মপরিচয়। আত্মা বলিতে যেমন কোন অখণ্ড একটি বস্তু নাই তেমনি কতগুলি বস্তুপুঞ্জের সমাহার বা সংগ্রহকেও আত্মা বলা যায় না।

সমাধীয়মান বৃত্তি, শক্তি, অঙ্গ, আবেষ্টন প্রভৃতির মধ্যে যে নিরন্তর নানা সম্পর্কের লীলা চলিয়াছে সেই লীলার কোনও একটি অবস্থাকে আমরা পৃথক্‌ভাবে বিচ্ছিন্নভাবে যখন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখীন করি তখন আমরা বলি "এই যে বৃক্ষ"; কিন্তু বৃক্ষের যথার্থ পরিচয় সেখানে নাই। শুধু সমষ্টির মধ্যেও তাহা নাই। এমন কি সমষ্টি (whole) বলিতেও এমন কিছু পাওয়া যায় না

যাহার কোন অর্থ হয়। সম্বন্ধপরম্পরার যে পরিমানে পরস্পর আত্মবিনিময়ে একটি আবর্ত্তনের চক্র, একটি ক্রমপরিস্ফূর্ত্তির চক্র, একটি আদান-প্রদানের লীলা-সৃষ্টি গড়িয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহাকে সমগ্র বলা যায়। যেখানে পরস্পরের আত্মবিনিময় নাই, এককে সফল করিতে অন্যের প্রয়োজন নাই সেখানে কোন সমগ্রও নাই। এই যে একের জন্য অন্যের অপেক্ষা এটি কেবল মাত্র বুদ্ধির আপেক্ষিকত্ব নহে, এটি একটি স্বরূপের আত্মপরিচয়। সম্বন্ধগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া সম্পর্করূপে প্রকাশ পায় এবং এই প্রকাশের লীলাভঙ্গিমা নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে। সম্বন্ধগুলির বন্ধনকে যখন আমরা নিবিড় ও অচঞ্চল বলিয়া মনে করি তখনই তাহাকে বলি আত্মা। কিন্তু এই নিবিড়ের মধ্যে সম্বন্ধগুলির যে পরস্পর আত্মবিনিময় চলিয়াছে নানা সম্পর্করূপে যে পরিস্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে ও নানা রূপের নানা পরিস্ফূর্ত্তির যে বিচিত্র লীলা চলিয়াছে তাহাকেই বলি আত্মপ্রকাশ। নিজের মধ্যে যে সম্বন্ধপরম্পরার সূত্রগুলি রহিয়াছে তাহার মধ্যে যে নানা আবর্ত্তনের সম্ভাবনা সুষুপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাই যখন আপন শক্তিতে নানা আবর্ত্তনসম্পর্কের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে তখন সেই প্রকাশের বিভিন্ন রূপগুলি সেই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থারূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ইহার কোন অবস্থাই বস্তুর স্বরূপ নয় ইহারা কেবল মাত্র বস্তুর অন্তর্নিহিত আত্মপরিচয়-প্রবাহের খণ্ড খণ্ড রূপ মাত্র। বীজের মধ্য হইতে বৃক্ষশিশু যখন

মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অজানা লোকের দিকে শীর্ষ উত্তোলন করিয়া উত্থিত হয় তখন সে যাত্রাকে কোন অজানা লোকের দিকে যাত্রা বলিয়া বলা যায় না। সেই বৃক্ষ শিশুর মধ্যে তাহার আপন স্বরূপ-রূপে যে সম্বন্ধপরম্পরার আবর্ত্তন রহিয়াছে তাহাই যে আপনাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে ইহাই এই অভিযানের গূঢ়তম সত্য। বৃক্ষ যে লীলাতে তাহার জৈব বৃত্তি ( Physiological function ) তাহার রাসায়নিক বৃত্তি ( Chemical function ) তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ, তাহার আবেষ্টন (Environment) এই সকলের মধ্য দিয়া আপন সম্বন্ধপরম্পরার অখণ্ড ঐক্য ও সামঞ্জস্যটিকে ফুটাইয়া তুলে তাহাতেই বৃক্ষজীবনের অন্তর্নিহিত আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। এই আত্মপরিচয়ের আনন্দে বৃক্ষের সর্ব্বদেহ মধুময় হইয়া উঠিয়া তার যৌবনপুষ্পের মধ্যে মধুক্ষরণ করে এবং সেই মধুর মধ্যেই তাহার অনাগত স্বরূপের আত্মপরিচয় লাভ করিয়া তাহার বৃক্ষজীবনের পূর্ণ সার্থকতা অনুভব করে।

সৎ, বস্তু বা Substance বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা কেবল মাত্র abstraction বা বিকল্প। কিন্তু এই সৎ বা বস্তুর নিজের কোন পরিচয় নাই। ইহাকে আশ্রয় না করিলে মন চলিতে পারে না। তাই সৎ ও বস্তুকে লইয়া আমরা সর্ব্বদা টানাটানি করি। কিন্তু এই সৎ বা বস্তুর এমন কোন স্বরূপ নাই যাহা লইয়া আমাদের কাছে সে তাহার আত্মপরিচয় দিতে পারে। আত্মপরিচয়ের মূলেই রহিয়াছে সম্বন্ধপরম্পরার আত্মবিনিময়ের

সম্পর্কচক্র। Kant বলিয়াছিলেন যে, এ সম্বন্ধপরম্পরা আমাদের মন হইতে বাহির হইয়াছে তাই ইহা কেবল আন্তর এবং সেই হিসাবে মিথ্যা। ইহার আশ্রয় রূপে অজ্ঞেয় বহির্বস্তু রহিয়াছে। তাহার স্বরূপ আমরা জানি না, এই সম্বন্ধপরম্পরার মধ্য দিয়া সে যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহাই আমাদের গোচরীভূত হয় এবং তাহাকেই আমরা বলি জ্ঞান বা উপলব্ধি। যদি সম্বন্ধপরম্পরা কেবল মাত্র আন্তর বা Subjective হইত তাহা হইলে জগতের বিচিত্র বস্তুতে বিচিত্র ব্যাপারে দেশকাল অবস্থার নানা পারম্পর্য্যের মধ্যে যে নানা বৈশিষ্ট্যের বিবিধ মূর্ত্তি আমাদের নিকট নিরন্তর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে তাহার কোনও হেতু খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য হইত। কি কারণে আমাদের মধ্য হইতে বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন সম্বন্ধসংরচনচক্রে আমরা অনুভব করি তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যদি বাহিরের বস্তু সম্বন্ধবিহীন হইয়া থাকিত তবে তাহা সং হইলেও অসংই হইয়া থাকিত। যদি সমস্ত সম্বন্ধপরম্পরা আমাদের অন্তরের দান হইত এবং তাহার মূলে যদি কোন বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা না থাকিত এবং বাহ্য বস্তুর দ্বারা যদি তাহা কোন মতে নিয়ন্ত্রিত বা উৎপাদিত না হইত তবে আমরা যাহা কিছু দেখিতাম যাহা কিছু জ্ঞানের গোচরীভূত করিতাম তাহা সমস্তই আমাদের মনের নিছক খেয়াল মাত্র হইত। তাহার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য থাকিত না। Kant যে সময়ে তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন

সেটা ছিল বস্তুতান্ত্রিক যুগ। Newton এর প্রভাবে বস্তু এবং সম্বন্ধ ইহাদের পরস্পরের দ্বৈত ভাবই তখন প্রবল। দিক্, কাল, সম্বন্ধ, গুণ, এই সমস্তকে তখনকার মনীষিরা পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য বস্তু হইতে দিক, কাল, গুণ ও সম্বন্ধকে পৃথক্ মনে করিয়া সেই গুলিকে অভ্যন্তরীণ সৃষ্টি বলিয়া Kant মনে করিয়াছিলেন এবং বস্তুকে তাহার অসৎস্বরূপে বহির্লোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে নানামুখী জ্ঞানধারা যে ভাবে আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে পৃথক করা যায় না। সম্বন্ধচক্র হইতে বস্তুকে পৃথক্ করা যায় না এবং আপন নানা পরিচয়ের আত্মপ্রকাশ হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করা যায় না। একটি সময় ছিল যখন বৈজ্ঞানিকরা মনে করিতেন যে পরমাণু বলিয়া একটি স্থির পদার্থ আছে। তাহার পরের যুগে দেখা গেল যে পরমাণু বলিয়া যাহাকে আমরা বলি তাহার অভ্যন্তরে একটি কেন্দ্র পদার্থ রহিয়াছে এবং তাহার আকর্ষণে অন্য আর এক জাতীয় বস্তু বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আজ দেখা যাইতেছে যে Proton ও Electron এর এই যে নৃত্যের ছবি এত দিন ধরিয়া সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে ইহা একটি কাল্পনিক ছবি মাত্র ইহার মধ্যে কোন যথার্থ সত্য নাই। তাই Jeans বলেন "A want of reality pervades all and everything creeping in from a

quite unexpected direction, a direction at any rate which must seem very surprising to a mind brought up to think in terms of the objective concepts of the older physics." যে বস্তুভূত uniformity of causal law বা অব্যভিচারী কারণকার্য্য নিয়মের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া জড় বিজ্ঞান এতদিন পথ চলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার মূলে আঘাত পড়িয়াছে। তাই বৈজ্ঞানিক Weyl বলেন "These considerations force upon us the impression that the law of causality as a principle of natural science is one incapable of formulation in a few words and is not a self-contained exact law."

নূতন যুগের জ্যোতিষ সঙ্কেতে আমরা যে পথ দেখিতে পাইতেছি তাহাতে স্পষ্ট মনে হইতেছে যে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে আর পৃথক্ করা যায় না। যাহা চঞ্চল যাহা অমূর্ত্ত যাহা বেগময় তাহাকেই বলা যায় সৃষ্টি। আর সে বেগময়ের মধ্য হইতে যখন কোন তাৎকালিক স্বভাবকে পৃথক্ করিয়া দেখি তখনই তাহা স্রষ্টা। আজ গতি হইতে স্থিতিকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। যাহা গতি তাহাই স্থিতি, যতক্ষণ গতিকে গতিরূপে দেখি তখন স্থিতিকে খুঁজিয়া পাইনা এবং স্থিতি অভাবে আমাদের মন ক্লান্ত হইয়া উঠে। আবার যখন স্থিতিকে পাই তখন গতিকে পাইনা স্থিতির আবরণের মধ্যে গতি তখন আত্মগোপন করিয়াছে।

যখন কেবল মাত্র রূপের মধ্যে আমাদের চিত্তকে আমরা সন্নিবেশিত করি তখন সেই রূপের অন্তরালে সমস্ত সম্বন্ধপরম্পরা [illegible]র্কচক্র যেন আপনাকে গোপন করিয়া রূপকে [illegible] তুলে। আবার যখন সম্বন্ধপরম্পরার মধ্যে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিই তখন ভাবি কাহাকে লইয়া সম্বন্ধ, কাহার সম্বন্ধ? বস্তু না থাকিলে'ত সম্পর্ক হয় না সম্বন্ধ হয় না। তখন দেখি যে সম্বন্ধপরম্পরার ঘূর্ণাচক্রের মধ্যে বস্তু তাহার নাম ও রূপকে হারাইয়াছে। কাজেই সম্বন্ধপরম্পরা প্রাথমিক কি বস্তু প্রাথমিক, গতি প্রাথমিক কি স্থিতি প্রাথমিক, গুণ প্রাথমিক কি গুণী প্রাথমিক, দিক্‌কালের আধার প্রাথমিক, কি তাহার আধেয় দ্রব্য প্রাথমিক, এ জাতীয় প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না। নানা সম্বন্ধের নিয়ত ঘূর্ণার মধ্যে যাহা ভাসিয়া উঠে তাহাকেই বলি বস্তু তাহাকেই বলি গুণ তাহাকেই বলি রূপ। সম্বন্ধচক্রের পরস্পর সন্নিবেশে যে রচনাটি রহিয়াছে তাহাই আমাদের আত্মা, তাহাই বিশ্বভুবনের আত্মা। সেই সম্বন্ধচক্রের নিরন্তর ঘূর্ণার মধ্যে নিরন্তর নানা রূপের প্রকাশ হইতেছে। সেই রূপপ্রকাশের মধ্যেই সেই সম্বন্ধ-চক্রের নিরন্তর আত্মপরিচয় চলিয়াছে এই আত্মপরিচয়ই সৃষ্টি এবং সৃষ্ট রূপই আত্মার আলাপ পরিচয়। এই সম্বন্ধচক্রের নিরন্তর ঘূর্ণি যেমন বহির্জগতে জাগতিক সৃষ্টি ও জাগতিক রূপ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদের অন্তর্জগতের জ্ঞানলোকের মধ্যেও তাহা তেমনি ভাবে আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। শব্দের সহিত

যেমন অর্থের সম্পর্ক আমাদের মনোলোকের রূপপ্রকাশের সহিতও তেমনি বহির্লোকের রূপের আনুরূপ্য। শব্দ যেমন অর্থের সমানধর্ম্মা না হইয়াও অর্থের পরিচয় দেয় আমাদের অন্তরের রূপপ্রকাশও তেমনি বহির্জগতের রূপলোকের সদৃশ না হইয়াও তাহার আনুরূপ্যের দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করে। বহির্জগতে যাহা নিরন্তর সৃষ্টির মধ্য দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে অন্তর্জগতের মধ্যেও তাহারই অনুরূপ প্রকাশ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়া বহির্জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ককে আমাদের পরিচয়কে ফুটাইয়া তুলিতেছে। মূর্ত্তরূপে যাহা বাহিরে, অমূর্ত্ত জ্ঞানরূপে তাহা ভিতরে, তাই উপনিষদ বলিয়াছেন "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ।" ব্রহ্মের দুই রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। জড় হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ হইতে প্রাণীলোকে ও প্রাণীলোক হইতে মনুষ্যলোকে ও মনুষ্যলোকের মধ্যেও যতই আমরা উন্নতির সোপানে আরোহণ করি ততই দেখি যে সর্ব্বত্র একই পদ্ধতি একই সংরচনাবিধান একই সম্বন্ধপরম্পরা নানা প্রকারের মধ্য দিয়া নানা রূপের মধ্য দিয়া নানা শক্তির মধ্য দিয়া নানা গুণ সজ্ঘটনের মধ্য দিয়া আপনার আত্মপরিচয় লাভ করিতেছে। শুধু এইটুকু মাত্র পার্থক্য দেখা যায় যে নিম্ন হইতে উচ্চতর ভূমিতে যতই আমরা আরোহণ করি ততই সম্বন্ধপরম্পরার জটিলতা বাড়িয়া উঠে ও তাহাদের আত্মবিনিময়ের নানা বিচিত্র পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়া উঠে। মূলতঃ একই পদ্ধতি সর্ব্বত্র রহিয়াছে সেই জন্য উপনিষদ বলিয়াছেন যে "যোদেবোহ

যৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু" এই যে ব্রহ্মের রূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ইহার মধ্যে যে ক্রমাবরোহ রহিয়াছে যে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আপন লীলাবৈচিত্র্যের প্রকাশ চলিয়াছে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া আমাদের প্রাচীনেরা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছিলেন।

সত্য বা তথ্য হইতে সৃষ্টিকে যে পৃথক করা চলে না তাহা আমাদের মনুষ্যজীবনের জ্ঞান ও অনুভবের পর্য্যালোচনাতে আমরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারি। বাহ্যজগত্ সম্বন্ধে আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে বলিতে পারি যে যাহা আমরা যে ভাবে দেখিতেছি তাহা সেই ভাবেই সত্য। সেই বাহ্যজগতের জ্ঞানসম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহার অধিকাংশই আমাদের আন্তরিক সৃষ্টি। বাহিরে যাহা কেবল মাত্র স্পন্দন হইয়া রহিয়াছে আমাদের চক্ষুর জৈব বৃত্তির দ্বারা তাহাই নিরন্তর রূপে পরিণত হইয়াছে, এই রূপ সৃষ্টি আমাদের জ্ঞাত সৃষ্টি নহে অজ্ঞাত সৃষ্টি। আমাদের সমস্ত জৈব জীবনের উপযোগিতার সহিত ইহার এমন একটি সঙ্গতি আছে যে সেই সঙ্গতির দ্বারা বাহ্যজগতের স্পন্দন অনবরত রূপে পরিণত হইতেছে। আবার এই রূপ নানা আকারের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের পেশীবর্গের সঞ্চালন বিচালনের বিবিধ ইঙ্গিতে আমাদের স্পার্শেন্দ্রিয়ের সহযোগে নানা সংস্থান ও রচনার মধ্যে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া বাহ্যজগতের নানা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই সৃষ্টির উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। বহির্জগতের সহিত আমাদের

শরীরযন্ত্র যে ভাবে অন্বিত হইয়া রহিয়াছে এবং বহির্জগতের সহিত সহযোগে বহির্জগতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাহার মধ্যে সম্বন্ধচক্রের যে নিরন্তর ব্যাপার চলিয়াছে তাহারই ফলে বহির্জগত্‌কে সে যে ভাবে আত্মীয় করিয়া লইতে পারে তাহাই এই যান্ত্রিক সৃষ্টির মূল প্রেরণা। যে সম্বন্ধচক্রটি বৃক্ষরূপে আত্ম প্রকাশ করে সে মাটী, জল, আলো, বাতাস প্রভৃতির মধ্য হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদানগুলিকে আপন সম্বন্ধ-চক্রের সহিত সামঞ্জস্যে আনিবার জন্য তাহাকে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করে ও আপনার সহিত মিলাইয়া লয় ও তাহা দ্বারা বহির্জগতের সহিত আপনাকে উন্নীত করে এবং অপর দিকে আপন সম্বন্ধ চক্রের নূতন নূতন আবর্ত্তনে বহির্জগতের সহিত সম্পর্কের মধ্য দিয়া আপনার নূতন নূতন পরিচয় লাভ করে, সেইখানেই বৃক্ষজীবনের সৃষ্টি। আমাদের দেহযন্ত্র তেমনি আপন আভ্যন্তরীণ জৈবসৃষ্টি দ্বারা বহির্জগতের জড় স্থাবর ও জঙ্গম এই সর্ব্ববিধ পদার্থের সহিত আপনাকে পরিচিত করিবার জন্য আপন সৃষ্টি দ্বারা তাহাদের বহিঃপ্রতিষ্ঠরূপকে অন্তঃপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলে। আলোকশক্তি বহির্জগতে স্পন্দাত্মক হইলেও অন্তর্জগতে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে নূতন সৃষ্টি দ্বারা তাহাকে রূপরূপে বিভাবিত করিতে না পারিলে তাহাকে আত্মীয় করা যায় না, তাহাকে জ্ঞানগোচর করা যায় না। আত্মপরিচয়ের স্বভাবসিদ্ধ লীলায় দেহযন্ত্র আপন সৃষ্টি-মহিমাদ্বারা বহির্জগত্‌কে অন্তর্লোকে পরিণত করে। মাটী,

জল, বায়ু, আকাশ ইহারা যখন বৃক্ষজীবনে ধাতুরূপে পরিণত হয় ও তাহার জৈব বৃত্তির মধ্যে আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলে তখন যেমন একথা বলা চলে না যে মাটি, আলো, জল, বাতাস সত্য আর বৃক্ষজীবনের অন্তর্নিহিত ও বৃক্ষজীবনের অন্তরঙ্গভূত তাহাদের যে স্বরূপ তাহা মিথ্যা, তেম্নি বহির্লোক যখন অন্তর্লোকরূপে পরিণত হয় তখন সেই অন্তর্লোককেও মিথ্যা বলা যায় না। বহির্লোক হিসাবে বহির্বস্তুর যে সত্তা রহিয়াছে তাহা যে পর্য্যন্ত না আমাদের মধ্যে আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে সে পর্য্যন্ত তাহা অসৎপ্রায়, থাকিয়াও নাই। সমস্ত বস্তুরই সত্তা ও প্রকাশ আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়াই উপলব্ধ হয়। যে খাদ্য আমরা জীর্ণ করিতে পারি না তাহা যেমন শরীর হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং আমাদের দেহধাতুর মধ্যে তাহার কোন স্থান হয় না তেমনি যাহা কিছু সম্বন্ধচক্রের নিরন্তর আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের আত্ম পরিচয়ের অঙ্গীভূত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না তাহা থাকিয়াও নাই।

জড় ও জৈবসৃষ্টির মধ্যে এই যে আত্মপরিচয়ের লীলা চলিয়াছে ঠিক্ এমনি লীলা চলিয়াছে আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে, আমাদের ভাবরাজ্যের মধ্যে। শিশু যখন মাতৃশরীরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে বহির্জগতের সহিত তখন তাহার কোন মুখ্য সম্পর্ক থাকে না। মাতৃশরীরের সহিত মাতৃজীবনের সহিতই তাহার মুখ্য সম্পর্ক। ভিন্ন হইয়াও সে মাতৃজীবনেরই অন্তর্ভুক্ত। মাতৃধাতু হইতেই

তাহার ধাতু এবং মাতৃজীবনের মধ্যেই তাহার জীবন লীলা। শিশু যখন শুধু এ মূঢ় জৈবলীলার মধ্যে আপনাকে সম্বারণ করিতে পারে না, যখন নূতন সম্বন্ধচক্রের পরিস্ফূর্ত্তিতে নূতন জাতীয় পরিচয়ের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় তখন সে ভূমিষ্ঠ হয়,এবং বাহিরের জল, বায়ু, আকাশের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘটে। ক্রমে যখন সে বাড়িতে থাকে ও নিজকে অন্য বস্তু হইতে অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করে, তখন হইতে তাহার মধ্যে মনোলোকের নূতন সম্বন্ধচক্রের আবির্ভাব ঘটে। শৈশব দশায় শিশু তাহার নিজকে অপর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিলেও তাহার সমস্ত সুখ দুঃখ নিতান্তই তাহার দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান দেহের সুখও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, রূপ রস ও গন্ধের মোহ, ইহাকে সে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। এই অবস্থায় মনুষ্যশিশুর সহিত ইতর প্রাণীর বড় বেশী ব্যবধান নাই। ভাষাপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন অক্ষর মনোলোকের মধ্যে শিশুর পরিচয় হইতে আরম্ভ হয়। যখন তাহার মনের মধ্যে শুধু বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়সংস্পর্শঘটিত সুখদুঃখ ভোগকে অতিক্রম করিয়া কল্পনালোকের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় এবং ইন্দ্রিয়গত সুখ সম্ভোগ কল্পনালোকের মধ্যে প্রসারিত হয় এবং তাহার ফলে বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শিশু আপনাকে বিস্তৃত করিতে থাকে তখন হইতে আর এক নূতন পর্য্যায়ের লীলা তাহার মধ্যে আরম্ভ হয়। নানা গল্পে আখ্যানে সে আপনার মনশ্ছবিকে আপনার সুখ

দুঃখভোগের পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করিয়া যাহা তাহার একান্ত ব্যক্তিগত এবং আপনার যাহা কেবল মাত্র বর্ত্তমানের তাহাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করে। আপনার সঙ্গীদের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে নানা কাল্পনিক স্বার্থ লইয়া যে দ্বন্দ্ব উঠে তাহাদ্বারা কেবলমাত্র শরীরের সুখদুঃখের স্বার্থছাড়া কল্পনায় যাহাকে আপনার বলিয়া মনে করে তাহার সহিত আপন স্বার্থকে জড়িত করিতে শিখে। এমনি করিয়া কেবলমাত্র শারীরিক সুখদুঃখের জৈব স্বার্থ ছাড়া, কল্পনাদ্বারা নানাবিধ ব্যাপারের সহিত মমত্ব সংস্থাপন করিতে অভ্যাস করে। শিশু যে পর্য্যন্ত কেবল শরীরধর্ম্মের স্বার্থকে কেবল শারীরিক সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া জানে সে পর্য্যন্ত তাহার সহিত অন্য প্রাণীর আচার ব্যবহারের বড় পার্থক্য নাই। কিন্তু যখনই শরীরকে ছাড়াইয়া মনোলোকের কল্পনার মধ্যে আপন মমত্ব বিস্তার করিতে শিখে তখনই সে আর একটি নূতন লোকের মধ্যে প্রবেশ করে। যখন দল বাঁধিয়া ফুটবল খেলিয়া বলটিকে বিপক্ষদলের আক্রমন পরাভূত করিয়া দুইটি গোল পোষ্টের মধ্য দিয়া তাহাকে পার করিয়া দিবার উৎসাহ তাহাকে পাইয়া বসে, যখন সেই প্রসঙ্গে নিজের স্বার্থের সহিত নিজের পক্ষের সঙ্গীদের স্বার্থকে এক করিয়া দেখে, তখনই সে কেবল জৈবলোক হইতে একটি মানসলোকে আপনাকে প্রসারিত করে। এই জাতীয় স্বার্থবোধ কোন ইতর প্রাণীর নাই। নিছক শারীর প্রয়োজন ছাড়া কল্পনারাজ্যের মধ্যে

কোন বস্তু বা ব্যবহারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার প্রতি মমত্ব সংস্থাপন করা কিম্বা নিজের কাল্পনিক স্বার্থকে এক করিয়া দেখিয়া একটি কাল্পনিক যৌথস্বার্থ অনুভব করা কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। এইখান হইতেই মানুষ কেবল জীবলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রবেশ করে। এইখান হইতেই শারীর স্বার্থের সম্বন্ধচক্র ছাড়া আর একটি নূতন সম্বন্ধচক্র আপনাকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। শিশু যেমন বয়সে বাড়ে, যেমন নানা দেশের নানা কালের ইতিহাস নানা কালের নানা জাতীয় সুখদুঃখের আখ্যান পাঠ করে, যেমন ক্রমশঃ পরিবারস্থ পাঁচজনের সহিত, সঙ্গীদের সহিত, দেশের দশের সহিত মিলিতে শিখে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে বিরাট মনুষ্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে। কেবল জৈব স্বার্থ ছাড়া আরও নানা জাতীয় স্বার্থ ও মমত্বের মধ্যে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া দেখে। এইখান হইতেই তাহার সমাজ জীবনের আরম্ভ। এই যে নূতন সম্বন্ধচক্রের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক প্রবেশাধিকার লাভ করে ইহা একটি নূতন সত্তা, নূতন আত্মপরিচয়। ইহার ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে স্তরে নানা সুখদুঃখভোগ নানা ক্ষতি প্রাপ্তি, ইহারই মধ্য দিয়া দেহযন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া দেহযন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া মানুষ একটি কল্পরাজ্যের অতীত বর্ত্তমান ও অনাগতকে একত্র করিয়া, পারিপার্শ্বিক সকলকে লইয়া ও সকলকে অতিক্রম করিয়া একটি নূতন সৃষ্টিক্রিয়ার একটি নূতন আত্মপরিচয়ের

ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তুলিতে থাকে। যে আত্মা শুধু দেহের সহিত আবদ্ধ ছিল, শুধু প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, তাহা তাহাদের ছাড়াইয়া আর একটি নূতন সম্পর্কলোকের মধ্যে আপন মনুষ্য জীবনের যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে শিখে। এই পরিচয়ের মধ্যেই সমাজ জীবনের জাগরণ; মানুষ আপন পরিবারবর্গের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, পারিপার্শ্বিক দশের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখে, নিজের দেশের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখে। পৃথিবীর সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের মানবের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখে—তাহার মধ্যে জাগে Nationalism, Cosmopolitanism, Humanism. আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বলিতেন যে বোধিসত্ত্বের চরম প্রাপনীয় ব্রত হইতেছে সর্ব্ব প্রাণীর সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখা, সর্ব্বপ্রাণীর হিতের জন্য আপনাকে বিনিয়োগ করা। বৈষ্ণবেরা বলিতেন যে সর্ব্বভূতে সমত্ব ও সর্ব্বভূতহিতে রত হওয়াই নারায়ণের আরাধনা। যখন মানুষ এমনি করিয়া অন্যমানুষের সহিত আপন পরিচয়ের সম্পর্ককে সার্ব্বভৌম করিয়া তুলে তখন সেই সার্ব্বভৌম সত্তার মধ্যে আপন দেহনিবদ্ধ সত্তাকে বিলীন করিয়া দেয়। এই বিলীন করিয়া দেওয়ার মধ্যে যে একটি ব্যাপক আত্মপরিচয় মানুষ লাভ করে সেই আত্মপরিচয়ই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। সেই আত্মপরিচয়ের মধ্যে তাহার আত্মসম্পর্ক-চক্রের সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি সাধিত হয়। মানুষের Individuality,

ব্যক্তিত্ব বা আত্মপরিচয় যখন ক্রম-ধারায় এই প্রসার লাভ করিতে থাকে তখন ক্রমশঃ নব নব ব্যাপকতর পরিচয়ের মধ্যে আপন আত্মার পূর্ণতর পরিচয় লাভ করিতে থাকে। এই পূর্ণতর পরিচয় যতই বৃহত্তর হইয়া উঠে, যতই মানুষ সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের মানবের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখিতে শিখে, ততই তাহার nationalism universalism এতে পরিণত হয়, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাবের অনুভূতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে থাকে। সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের মানবের সহিত আমাদের কোনও ব্যবহারগত বহির্লোকগত সম্পর্ক প্রকাশ করা যায় না। অতীত অনাগতের সহিত, দূরস্থ জনসন্ততির সহিত আমাদের কোনও বহির্লোকগত ব্যবহার সম্ভব হয় না। সেই জন্য তাহাদের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক তাহা অন্তর্লোকের জ্ঞানধারার মধ্যে, আপন সার্থকতার আত্মপরিচয়ের মধ্যে, ভাবধারার অভিষিঞ্চনের মধ্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বহির্মানবের সহিত আমাদের আত্মবিনিময়ের যে পরিচয় কায়িক ও বাচিক ব্যবহারের মধ্য দিয়া পরিস্ফূর্ত্ত হইতে পারে তাহাদ্বারাই লোকমর্য্যাদা ও লোকস্থিতি সংরক্ষিত হয়। এইখানেই social morality ( সমাজ ধর্ম্ম ), social integrity ( সমাজ সংস্থিতি ), social progress ( সমাজের উন্নতি ), political life ( রাষ্ট্র জীবন ) ও nationalism বা জাতীয়তার ক্ষেত্র। ইউরোপীয়দের মত অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে তাহাদের অনেকেই এই সামাজিক সার্থকতা, এই

সামাজিক আত্মবিনিময়কেই আপন চরম প্রাপ্তি ও চরম পরিচয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এই লোক সমাজকে আপন সম্বন্ধচক্রের অন্তর্ভূ‍র্ত করিয়া যে আত্মপরিচয় লাভ করা যায় তাহাই একমাত্র চরম পরিচয় নহে। জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ভাবে সমগ্র মানবের সহিত আমাদের যে আত্মীয়তা ঘটে তাহা একদিক দিয়া খুব বড় এবং ব্যাপক হইলেও আত্ম-পরিচয়ের সেইটিই যে একমাত্র বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সরণী তাহা বলা চলে না। আমাদের অন্তর্লোক হইতে নিরন্তর যে রসধারা ক্ষরিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বতোমুখী করিয়া সমগ্র বিশ্বমানবের মধ্যে প্লাবিত করিয়া দিলেই যে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। হৃদয়রসের মধ্য দিয়া আমাদের যে আত্মপরিচয় লাভের উপায় ও পদ্ধতি রহিয়াছে তাহাকে একদিকে যেমন বিশ্বমানবের মধ্যে ব্যাপ্ত ও পরিস্ফুর্ত্ত করা যায় অপর দিকে আবার তাহা একটি প্রেমাস্পদের নিকট যখন আপনাকে বিগলিত ধারে প্রবাহিত করিয়া দেয় তখন সেই প্রবাহের নির্ঝরের মধ্যে সমস্ত বিশ্বমানবের প্রীতি রস নূতন রূপে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ভক্ত যখন শ্রীভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করে তখন সেই নিবেদনের মধ্যে চিরদিন ধরিয়া যাহা কিছুর সহিত সে মমত্ব সংস্থাপন করিয়াছে, আপন সম্বন্ধচক্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া যাহা কিছুকে সে আপনার বলিয়া মনে করিয়াছে, যে রীতিতে সে বিশ্বসংসারের সহিত আপন পরিচয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছে সেই রীতি ও পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন

জাতীয় আত্মপরিচয় লাভ করে। আমাদের চিত্তের সংরচন পদ্ধতির মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সূত্র ধরিয়া সম্বন্ধচক্রটি সমস্ত বিশ্বভুবনকে লইয়া জাল বুনিতে বুনিতে আপনার মধ্যে গুটাইয়া আনে এবং এমনি করিয়া বিশ্বভুবনকে আত্মসংশ্লিষ্ট করিয়া আপন পরিচয়ের মধ্যে বিশ্বভুবনকে সাক্ষাৎ করে। আত্মপরিচয়ের তাহা হইতে আর একটি বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতিও আমাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ইহা অন্তর্মুখী আত্মপরিচয়। যখন কোন শিল্পী সৌন্দর্য্যরসের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দেয়, এক মুহূর্ত্তের একটি ছবির মধ্যে আপন সত্তাকে হারাইয়া দেয়, তখন সেই মুহূর্ত্তের আপ্লাবনের মধ্যে তাহার যে অন্তর্মুখী আত্মপরিচয় ঘটে তাহাতে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি যেন ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইয়া যায়। কোন যোগী যখন ধ্যানাভ্যাসরসের মধ্যে আপন মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক সমস্ত বৃত্তি লীন করিয়া দেয়, আপন সম্বন্ধচক্রের তন্তুগুলিকে উঠাইয়া লইয়া তাহাদিগকে অন্তর্মুখে প্রবাহিত করে তখন তাহার ফলে যে আনন্দ উদ্ভূত হয় তাহা আত্মসম্বন্ধচক্রের অসম্বন্ধ আত্মপ্রকাশ রূপে আপন পরিচয়ের আর একটি পরমস্বরূপকে প্রকাশিত করিয়া তুলে। প্রেমে যখন দুইটি হৃদয় এক হইয়া যায় তখন বাহ্য সম্বন্ধ ও বহির্লোকের উপাদান-উপাদেয়-ভাব-সম্বন্ধ সম্বন্ধ স্বরূপে বিগলিত হইয়া যায়। যখন আমাদের চিত্ত বহির্জগৎকে বা বহিস্থ জনসমুদয়কে আপনার মধ্যে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে

নিজের পরিচয়কে সাক্ষাৎ করে তখনও সেই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দ প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যেও নিজের অন্তর্নিগূঢ় যোগের যে আনন্দ তাহারই আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মসম্বন্ধচক্রের প্রত্যেক বহির্মুখী গতির সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তর্মুখী গতি আছে, একটি আত্মসামঞ্জস্যের বোধ আছে। এই অন্তর্মুখী গতি বা আত্মসামঞ্জস্যের বোধেই আনন্দরস প্রসৃত হয়। সেই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বলিয়াছেন যে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যেও এমন প্রাচুর্য্য ও নিস্পন্দতা আসিতে পারে যে তাহা দ্বারা মানুষ অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে। যে সম্বন্ধস্থাপনের দ্বারা সেই অন্তর্মুখী পরিচয়ের আনন্দ ফুটিয়া উঠে সেই আনন্দ সেই বহির্মুখী পরিচয়কে ডুবাইয়া দিয়া আপন উৎফুল্লতায় উপচিয়া উঠে, জ্ঞান আনন্দের মধ্যে তলাইয়া যায়। সাহিত্যরসের অনুভবের মধ্যেও দেখা যায় যে বিষয়বস্তু, বর্ণনার নানা ভঙ্গিমা, শব্দ সঞ্চয়ের নানা চাতুর্য্য, উপমার নানা বর্ণচ্ছটা ও ছন্দের নানা ঝঙ্কার ইহাদের সকলকে ছাড়াইয়া সাহিত্যিকের মনে এমন একটি রসবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে যাহার নিবিড় স্পর্শের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধপরম্পরা লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমালোচকের লোচনে সাহিত্য রচনার মূল কারণীভূত হইয়া যে সমস্ত সম্বন্ধপরম্পরা আপন পরিচয় দেয় রসজ্ঞের রসানুভূতির মধ্যে সেই সমস্ত সম্পর্কপরম্পরা যেন বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং একটি রসোজ্জ্বল কাব্যমূর্ত্তির আশ্লেষে তাঁহার হৃদয়

রসস্নিগ্ধ হইয়া উঠে। সেই রসস্নিগ্ধতার মধ্যেই রসজ্ঞ তাঁহার আত্মার রসপরিচয়কে সাক্ষাৎ করেন। এই রসপরিচয় আত্মসম্বন্ধচক্রের অন্তর্মুখী পরিচয়। সমস্ত জড়জগৎ জীবজগৎও জ্ঞানজগতের মধ্যে আত্মসম্বন্ধচক্রের যে বহির্মুখী বহির্বৃত্তিক পরিচয়ের কথা বিবৃত হইয়াছে তাহা ছাড়া আত্মসম্বন্ধচক্রের স্বধাতুর একটা অন্তর্মুখী বৃত্তি আছে। বহিস্থ বস্তু যখন অন্তরের মধ্যে গৃহীত হয় তখন সেই গ্রহণ কালে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাও এই অন্তর্মুখী বৃত্তিরই সাক্ষাৎকার। কিন্তু এমন কতগুলি বিশিষ্ট অনুভবের ক্ষেত্র আছে যেখানে বহির্মুখী বৃত্তি হয় গৌণ, অন্তর্মুখী বৃত্তিই হয় প্রধান। সেখানে জ্ঞান গৌণ, আনন্দ মুখ্য। অন্য সমস্ত স্থলেই বহির্বৃত্তি প্রধান তাই জ্ঞান মুখ্য, অন্তর্বৃত্তি অপ্রধান তাই আনন্দ গৌণ। আমাদের আত্মসম্বন্ধচক্র যেমন একদিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া বাহিরের জিনিষকে আত্মীয় করিয়া সর্ব্ব বস্তুর সহিত আপন আত্মীয়তার বিস্তার করিয়া সর্ব বস্তুর মধ্যে আপনার নূতন নূতন পরিচয় লাভ করে, অপরদিকে তেমনি অন্য বস্তুকে কেবল মাত্র উপলক্ষ করিয়া আপন সম্বন্ধচক্রকে এমন করিয়া অন্তর্মুখে আলোড়িত করিতে পারে যাহার ফলে তাহার আত্মস্থ সম্বন্ধচক্রের বিশিষ্ট সামঞ্জস্যের স্বরূপটি আনন্দময় রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আষাঢ়ের গাঢ় সন্ধ্যায় ঝিল্লীমুখর বৃষ্টিসম্পাতের শব্দ শুনিতে শুনিতে, মেঘমসীলিপ্ত শৈলশিখর দেখিতে দেখিতে চিত্ত যখন বহির্মুখে প্রসারিত হইতে পারে না,

নীলাম্বুরাশির মধ্যে ভাসমান হইয়া নীল আকাশের তলে নীল সমুদ্রের মধ্যে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া চক্ষু যখন অসম্বদ্ধ হইয়া আসে, অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটার চাতুর্য্যে বর্ণমালার বিচিত্র উর্মি সাগরে রূপকে যখন চক্ষু ধরিয়া রাখিতে পারে না, তখনও আমরা বাধাগ্রস্ত বহির্মুখী বৃত্তির অন্তরালে আমাদের নিবিড় আত্মস্পর্শে একটা বিশিষ্ট অনুভব ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি করি। আমরা বলি আমরা যেন বিভোর হইয়া গেলাম, বিহ্বল হইয়া গেলাম, কি একটা আনন্দ যেন অন্তরের মধ্যে লহর খেলাইল। এমনি করিয়া নানাবিধ উপলব্ধির মধ্য দিয়াই আমরা অনেক সময়েই আমাদের অন্তর্মুখী বৃত্তির আনন্দোদ্বোধের একটা স্পর্শ লক্ষ্য করিতে পারি। তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের আত্মসম্বন্ধচক্র কেবল যে বহির্মুখী হইয়া নিজেকে সার্থক করে তাহা নহে, তাহার অন্তরের মধ্যে যে একটা নিবিড় আলোড়ন চলিয়াছে, বাহিরের বিক্ষোভে তাহা কক্ষচ্যুত না হইলে তাহার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং এই উদ্ভাসের মধ্যে আমাদের অন্তরের রূপের একটি যথার্থ পরিচয় ঘটে।

তারুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের জীবনে যখন আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠি তখনই আমাদের অন্তরের এই যে আত্মপরিচয়ের দিকটি তাহা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিতে চায়। বাহিরের নানা রূপ ও নানা স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া তখন আমাদের জীবন তাহার এই

অন্তরের রূপকে জগতের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া, জগতের ছবির মধ্যে আরোপিত করিয়া আপন পরিচয় লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। কোনও প্রেমাস্পদকে আশ্রয় করিয়া যখন এই অন্তরের রূপটি অন্তরের আত্মপরিচয়টি আপনাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে চায় তখন তাহার উপলক্ষ হয় রূপ ও স্পর্শ, তাহার উপলক্ষ হয় ভাবের আদান প্রদান, ব্যবহারে পস্পরের আনুকূল্য, উপাদান উপাদেয়ভাবে পরস্পরের আত্মবিনিময়। কিন্তু এই উপায়-পরম্পরার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ যখন দান প্রতিদান চলিতে থাকে, জ্ঞান, কর্ম্ম, ইচ্ছা, বাসনা প্রভৃতির নানা আড়ালের অপরিচয়ের মধ্য দিয়া বহিরঙ্গ উপায়ে একটি প্রাণ অপরটিকে আপন সান্নিধ্যে আনিয়া আপন অঙ্গীভূত করিয়া, আপন আত্মার ব্যাপ্তির মধ্যে আশ্রয় দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করিতে থাকে, তখন একদিকে যেমন চলে বহিরঙ্গ পরিচয়ের লীলা অপর দিকে তেমনি সেই লীলার প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ভাব মূর্ত্তিতে আপন অন্তরঙ্গ পরিচয়টি আপনার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্রীভগবানকে অবলম্বন করিয়াই হউক আর মানুষকে অবলম্বন করিয়াই হউক প্রেমমাত্রেই একটি মূর্ত্ত অন্তঃপ্রত্যক্ষকে জাগ্রত করিয়া তুলে। আস্তিক্যশাস্ত্র বা Theologyর মধ্য দিয়া ভগবানের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে পরিচয়ের দ্বারা তাঁহার সহিত প্রেম সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। ভক্তের হৃদয় আপন চিত্তের অলৌকিক মহিমার বলে একটি

বিরাট পুরুষকে আপন হৃদয়ের মধ্যে নিতান্ত অন্তরঙ্গরূপে অপরিমেয় মধুময় রসে উপলব্ধি করে। যাহার এই উপলব্ধি নিজের স্বভাবের দ্বারা উপচিত হইয়া না উঠে তাহার পক্ষে ভগবৎ সাধনের উপায় বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্য বৈষ্ণব বলিয়াছেন "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য নাহি হয়।" কিন্তু ভগবান বলিয়া যে বিরাট পুরুষকে ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমের উদ্দেশ্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বস্তুতঃ তিনি তাহার উপলক্ষ মাত্র। প্রেম মাত্রেই নিজের অন্তর্মুখী বৃত্তির একটি বিশেষ বিভাবন ব্যাপার, একটি বিশেষ আত্মপরিচয়। ভগবানকে লইয়া যাহা দুর্গম বা দুঃসাধ্য হয় মানুষের মূর্ত্ত রূপের মধ্যে তাহা অনেক সময় সুসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। ইয়োরোপীয়দের অনেকে humanity কে ঈশ্বরস্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহার প্রতি প্রেমকে মুখ্য ধর্ম্মসাধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু humanityর ব্যাপক রূপকে না পাইয়া ও একটি মাত্র মূর্ত্ত পুরুষকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমস্ত অন্তর্ধাতু প্রেমান্দোলনে আন্দোলিত হইয়া উঠিতে পারে। কায়িক বাচিক সম্পর্কপরম্পরার মধ্য দিয়া যখন একে অপরের সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, একে যখন অপরের অনুকূলে আপনাকে প্রবর্ত্তিত করিতে থাকে, তখন সেই পরিচয়ের অন্তরালে বাহিক ভোগবৃত্তির ছায়ায় একটি নিতান্ত অন্তরতম আত্মস্বরূপের পরিচয় নিজের নিকট উপলব্ধ হইতে থাকে। এই উপলব্ধির দ্রবীভাবের মধ্যে যতই আপনাকে বিলীন করিয়া

দেওয়া যায় ততই আমাদের আন্তর ধাতুর নিবিড় তপস্যায় আমাদের চিত্ত তাহার নানা সম্বন্ধচক্রের মধ্যে যেন অসম্বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ আপনার একটি নূতন পরিচয় লাভ করে। উপনিষদের মৈত্রেয়ীপ্রসঙ্গে আমরা দেখি, যে মৈত্রেয়ী যখন অমৃতত্বের কামনা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ধনে তাঁহার প্রয়োজন নাই, যাহাতে অমৃতত্ব আছে তাহাই তিনি চান, তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "নবা অরে পত্যুঃকামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, নবা অরে জায়া কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি"। পতির জন্য পতি প্রিয় নয় নিজের জন্যই পতি প্রিয়, জায়ার জন্য জায়া প্রিয় নয় নিজের জন্যই জায়া প্রিয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রেমরসের যে আস্বাদন তাহা আমাদের আত্মপরিচয়ের আত্মসার্থকতার একটি রূপ মাত্র। পতিকে ও জায়াকে লক্ষ্য করিয়া উভয়কে অবলম্বন করিয়া তাহা আপনাকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তুলে। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বৃহৎ বা বৃহত্তম। ব্রহ্মচর্য্য অর্থ বৃহত্তমের দিকে যে আত্মচর্য্যা বা আত্মচেষ্টা। তাই অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন "ব্রহ্মচর্য্যেণ যোষা যুবানং পতিমভ্যেতি" স্ত্রী যখন পতির সহিত সঙ্গত হয় তখন সেই সঙ্গতির মধ্যে একটি বৃহত্তমের প্রতিষ্ঠা হয়, এই বৃহত্তমের প্রতিষ্ঠার অনেক রূপ ও অনেক সরণীর কথা আলোচনা করা যাইতে পারিত কিন্তু আজ আমি কেবলমাত্র এই একটি দিকের কথাই বলিতেছি সেটি হইতেছে

আত্মপরিচয়ের দিক। যে আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠাতে সমস্ত জড়লোক ও জীবলোকের সত্তা ও সার্থকতা, সেই আত্মপরিচয়েরই আর একটি অন্তরঙ্গ রূপ স্ত্রীপুরুষের সঙ্গতিতে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। আমাদের মধ্যে আমাদের আত্মসম্বন্ধচক্রের অন্তঃসৃষ্টিতে যে একটি আনন্দরূপমমৃতং রহিয়াছে, প্রেমের আস্বাদনের মধ্যে আমাদের অন্তর্লোকের সেই স্বরূপের পরিচয়টি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বাহিরের জগতে রূপ হইতে রূপান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে, সম্বন্ধ হইতে সম্বন্ধান্তরে আমাদের মন যতই বিচরণ করুক না কেন তাহার আপন নীড়ের সহিত তাহার এমন একটী সহজাত সম্পর্ক রহিয়াছে যে সেই নীড়ের পরিচয়টী প্রাপ্ত না হইলে আপনার পরিচয়টা পাওয়া যায় না। রূপ ও রূপসৃষ্টির আনন্দে রূপকার যেমন ইহাকে অনুভব করেন, ধ্যানাভ্যাসরসের মধ্যে যোগী যেমন ইহাকে পান, ভক্ত যেমন শ্রীভগবানের সংসর্গে ইহা লাভ করেন, প্রেমিক তেমনি, আপন প্রেমাস্পদের নিকট আত্মবিনিময়ে ও আত্মদানে ইহার মধ্যে ডুবিয়া যান। প্রেমের মধ্যে যে একটি নিবিড় যোগ আছে সে যোগ যতক্ষণ বহিরঙ্গ সম্বন্ধ লইয়া ব্যাপৃত থাকে বাচিক কায়িক ব্যবহারের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহার পূর্ণতা হয় না, ভক্ত যতক্ষণ ভগবানের পূজার্চ্চনায় ব্যাপৃত থাকে তখন তাহার সহিতও তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। ভক্ত যখন ভগবানকে আপন অন্তরঙ্গ প্রেমরসের একটী উপাদান রূপে অনুভব

করেন, স্ত্রীপুরুষের যখন রমণরমণীভাব বিগলিত হয় এবং একটি উভয়স্পর্শী প্রেমসম্পর্কের আত্মপরিচয়ের মধ্যে উভয়ে বিধৃত হইয়া থাকেন তখনই তাঁহাদের যথার্থ সার্থকতা লাভ হয়। জ্ঞান দেহকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় কিন্তু উৎপন্ন হইয়া সে যেমন একদিকে দেহকে ছাড়াইয়া যায় অপরদিকে তেমনি দেহকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কায়িক বাচিক ব্যবহারের মধ্যে যে বহিরঙ্গ আত্মপরিচয় রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া যখন অন্তরঙ্গ পরিচয়ের স্পর্শ টি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন সেই পরিচয় স্পর্শের স্বরূপটি সমস্ত কায়িক বাচিক ব্যবহারকে অতিক্রম করিয়া আপন সার্থকতায় মহিমান্বিত হইয়া উঠে। তথাপি সেই কায়িক বাচিক অবলম্বনকে সে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে যখন ভগবান আবির্ভূত হন তখন স্তোত্র ও নমস্কারে সমস্ত চরিত্রের মাধুর্য্যরসকে অবলম্বন না করিয়া তাহা প্রস্ফুট হইতে পারে না। কবি যখন তাঁহার পরিকল্পনার রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠেন তখনও সেই পরিকল্পনার বহিরঙ্গরূপে বাক্যকে তিনি বর্জ্জন করেন না। যোগীর ধ্যানাভ্যাসের মধ্যেও তাঁহার আসন ও প্রাণায়ামের অবলম্বন অনিবার্য্য। বাচিক ও কায়িক ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্তরঙ্গ প্রেমধাতু যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায় তখন সেই ধাতুর স্পর্শে আমাদের অন্তরের যথার্থ স্বরূপের সহিত তাহার যে পরিচয় ঘটে তাহার মাধুর্য্য আমাদের সমস্ত চরিত্রকে ও বহিরঙ্গ লোকের সহিতআমাদের সমস্ত ব্যবহারকে আপ্লুত

করিয়া দেয়। তৈল ও বর্ত্তিকাকে অবলম্বন করিয়া যেমন দীপশিখাটি প্রোজ্জ্বলিত হয়, তেমনি বহিঃপরিচয়ের সহিত আরম্ভ করিয়া, বহিঃপরিচয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরের প্রেমদীপটিও কায়িক বাচিক ব্যবহারকে অবলম্বন করিয়া অন্তর্লোকে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, এবং তাহারই সেই শিখায় আমরা সমস্ত মনুষ্যলোককে আমাদের অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কর্দ্দমের মধ্য হইতে মৃণালদণ্ড যেমন উর্দ্ধমুখ হইয়া উদ্গত হইতে হইতে সূর্য্যালোকের মধ্যে বর্ণচ্ছটায় আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলে তেমনি বহিরঙ্গ পরিচয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় আমাদের হৃদয়লোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যতক্ষণ বহিরঙ্গ পরিচয় শুধু বহির্লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে কায়িক বাচিক ব্যবহার যতক্ষণ তাহার বাহ্যিকতার মধ্যে থাকে, পরস্পরের উপাদান উপাদেয়ভাব যতক্ষণ ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আমরা পঙ্কের মধ্যেই থাকি। কিন্তু পঙ্ককে বাদ দিয়া পদ্মের জন্ম হয় না, তাই পঙ্ক হইতে মৃণালদণ্ডের ন্যায় আমাদের চিত্ত ক্রমশঃ পঙ্কভূমিকে অতিক্রম করিয়া বহিরঙ্গ পরিচয়ে বহিরঙ্গতাকে অপসারিত করিয়া যখন অন্তরঙ্গ পরিচয় রসের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলে তখনই বাহ্য ও আন্তর এই উভয় পরিচয় যে একই সূত্রে আবদ্ধ তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি, এবং সেই অনুভবের দ্বারা আমরা বাহ্যের মধ্যে থাকিয়াও

বাহ্যকে অতিক্রম করি, দেহের মধ্যে থাকিয়া দেহকে বর্জ্জন করি, উপাদান উপাদেয় ভাবের মধ্যে থাকিয়াও তাহার অতীতলোকে সঞ্চরণ করি। এই দ্বিবিধ লীলার মধ্যেই আত্মপরিচয়ের সম্পূর্ত্তি। উপনিষদ বলিয়াছেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।" একই বৃক্ষকে দুইটী পক্ষী আলিঙ্গন করিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি শুধু ফল ভক্ষণ করে অপরটি না খাইয়াই তৃপ্ত থাকে। অন্তরঙ্গ প্রেমের মধ্যে আমরা আমাদের যথার্থ পরিচয় লাভ করি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া। বহিরঙ্গ প্রেমের মধ্যে আমরা পরস্পরকে দৈহিক ও মানসিক নানা প্রয়োজনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। এই উভয় পরিচয়ের মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গকে অতিক্রম করিলেও বহিরঙ্গকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সম্বন্ধের বিস্তারের মধ্য দিয়া আত্মার যে ব্যাপ্তিকে আমরা অনুভব করি প্রেমের দ্রবীভাবের মধ্য দিয়া সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া আমরা সেই অনুভবেরই যেন একটি প্রাত্যক্ষিক স্পর্শ অনুভব করি। এই অনুভবব্যতিরেকে আমাদের পরম পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না এবং এই পরিচয় সম্পূর্ণ হইলে অন্য পরিচয় সিদ্ধপ্রায় হইয়া আসে।

# জড়, জীব ও প্রাভুপুরুষ

পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—অজীব ও জীব। অজীবকে জানিবার জন্য যে সমস্ত শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহাকে জড়বিজ্ঞান বলে। জড়ের নানা ধর্ম্ম জানিবার জন্য নানা পন্থা ও নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহার প্রত্যেক পদ্ধতির অনুসরণে বিভিন্ন বিভিন্ন জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। Physics বা পদার্থ-বিদ্যা বলিয়া যে শাস্ত্রটি প্রচলিত আছে, তাহা অন্য সমস্ত দিক বর্জ্জন করিয়া কেবল তাহার দ্রব্যত্ব ( mass ) ও শক্তি ( energy ) এই উভয়ের আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত। ইংরাজিতে দ্রব্যত্ব বা mass-এর লক্ষণ বলা হইয়াছে, "mass is the quantity of matter contained in a body", অর্থাৎ যে বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থসঞ্চয় আছে, তাহাকেই তাহার দ্রব্যত্ব বলে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে, পদার্থ সঞ্চয় অর্থ কি ? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তনের ( volume ) মধ্যে যেখানে পরমাণুপুঞ্জের ঘন সন্নিবেশ যত বেশী এবং তাহাদের অন্তর্বর্ত্তী অবকাশ যত কম, সেখানে সেই পরিমাণেই পদার্থ-প্রচয়ের আধিক্য। কিন্তু এই উত্তরই শেষ কথা নয়, কারণ বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যেও পদার্থ-প্রচয়-গত তারতম্য আছে। কারণ পরমাণুগুলি proton ও electron-

এ গঠিত—কাজেই যে পরমাণুতে যত অধিক পরিমাণে proton ও electron আছে ও নির্দ্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে তাহাদের অন্তর্বর্ত্তী অবকাশ যত কম, সেই পরমাণুতেই দ্রব্যত্ব বা পদার্থ-প্রচয় (mass) তত অধিক; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর পদার্থপ্রচয় বা দ্রব্যত্ব সেই বস্তুর ঔপাদানিক এক বা বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সঙ্ঘটক proton ও electron এর সংখ্যা ও ব্যূহন বা সংযোজন-সম্বন্ধ ও সেই বস্তুর দ্ব্যণুকগুলির (molecules) মধ্যে পরমাণুগুলির ব্যূহন বা সংযোজনসম্বন্ধ ও দ্ব্যণুকগুলির মধ্যেও পরস্পরের ব্যূহনসম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পদার্থ-প্রচয়-প্রণালী বুঝিবার চেষ্টার মধ্যে একটু ও পদার্থ নাই, আছে কেবল সংখ্যা ও ব্যূহনসম্বন্ধ। সংখ্যা ও একরূপ সম্বন্ধেরই নামান্তর, কারণ এক, দুই, তিন বা বহু পরস্পরসাপেক্ষ ব্যাসজ্য-বৃত্তি-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। দুই তিন এর সহিত সম্পর্কে না বুঝিলে এককে বোঝা যায় না, এবং এককে না বুঝিলে দুই তিনকে বোঝা যায় না। পরস্পরসাপেক্ষ ও অন্যোন্যাশ্রয়ক সম্বন্ধজ্ঞানের উপর সংখ্যাজ্ঞান নির্ভর করে, কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পদার্থ-প্রচয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে বাস্তবিক দৃশ্যমান ও স্পৃশ্যমান পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধপরম্পরাকে কোনও বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলের দৃষ্টিতে অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে সম্বন্ধী বা বস্তু থাকে গৌণ এবং

সাঙ্কেতিক ভাষায় কেবল মাত্র সম্বন্ধাশ্রয়রূপে বেদ্য আর সম্বন্ধ হয় মুখ্য। তেমনি শক্তির দিক্ দিয়া অন্বেষণ করিতে গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তির আশ্রয়কে পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। একই সত্তা কোনও সময় শক্তিরূপে এবং কোনও সময় বা শক্তিমান্ বা শক্ত্যাশ্রয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে এবং কোনও সময় বা উভয়াত্মরূপেই আপনাকে প্রকাশ করে। কোনও শক্তিকে বুঝিতে হইলে যে ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে সেই শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তাহা ছাড়া সেই শক্তির অন্য পরিচয় পাওয়া কঠিন। জড়বিজ্ঞান শাস্ত্র যেদিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে, তাহার অনুসরণ করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, স্বতন্ত্ররূপে শক্তিকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। কারণ, কতকগুলি সম্বন্ধ-পরম্পরার ঘটন, বিঘটন বা অন্যথাঘটন এইটাই আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। এই সম্বন্ধ-পরম্পরার ঘটন-বিঘটনের মূল কারণ রূপে যে কোনও শক্তি আছে, ইহা কল্পনা করা কার্য্যোপযোগী নিছক কল্পনা মাত্র। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ এতদিন পর্য্যন্ত Physics বা পদার্থবিদ্যার একটী প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব পদার্থ-প্রচয় ও স্বাপেক্ষ দূরত্বের তারতম্য অনুসারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কেমন করিয়া পরস্পর অসংলগ্ন দুইটী বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা কল্পনা করা কঠিন। কাজেই এই আকর্ষণের মূল শক্তিরূপী কোনও অনির্ব্বাচ্য

পদার্থবিশেষকে স্বীকার করিতে হইত। আজ Einstein-এর অনেকান্তবাদের আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, মাধ্যাকর্ষণরূপী কোনও স্বতন্ত্র শক্তিকে স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পদার্থ-প্রচয়ের তারতম্যানুসারে পার্শ্ববর্ত্তী ব্যোমপ্রদেশে যে বিভিন্ন জাতীয় কুটিলতা ও বঙ্কিমতার সৃষ্টি হয়, বা যে নূতন সম্পর্ক-বিশেষের সংঘটন হয়, তাহারই সম্পর্কীভূত হইয়া যখন কোনও বস্তুর কোনও বিশিষ্টজাতীয় ক্রমান্বয়ী সম্পর্কধারার সঙ্ঘটন হয়, তাহাই স্থিতি-গতিরূপে প্রতিভাত হইয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রকাশরূপে পরিগণিত হয়।

চৌম্বক আকর্ষণ স্থলেও চুম্বক ও লৌহান্তর্বর্ত্তী ক্ষেত্রের যে নানা সম্পর্কের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারই ফলে লৌহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রের যে ধর্ম্মপরিণাম ঘটে, চৌম্বকাকর্ষণ তাহারই নামান্তর মাত্র। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঈথার বলিয়া একটী সর্ব্বব্যাপী পদার্থ স্বীকার করিতেন এবং ঈথার-তরঙ্গের সঞ্চরণকেই আলোকরশ্মি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এখন ঈথার সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় আসিয়াছে এবং ঈথারের সত্তা অনেকেই এখন কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতেছেন। সেইজন্য সূর্য্যমণ্ডল হইতে কোনও তরঙ্গ আসিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখীন হয়, আলোকের এই পরিচয় এখন ক্রমশঃ অপ্রতিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যমণ্ডলের কোনও বিশিষ্ট পরিণামের জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী আকাশমণ্ডলের মধ্যে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, সেই বিক্ষোভের ফলে ক্রমধারায় ক্রমসংলগ্ন

আকাশাবয়বের যে পরিবর্ত্তন হয়, সেই পরিবর্ত্তন যখন চক্ষুসংলগ্ন আকাশ-প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তখনই আলোকরশ্মি দেখিলাম বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এইরূপে Physics বা পদার্থবিদ্যার আলোচনা-প্রণালীর প্রতি অভিনিবেশ করিলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের মধ্যে দিক্-কাল-ঘটিত যে যে নানা সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধগুলির মধ্যে কি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে, তাহারই অনুসন্ধান এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

দিক্-কালের মধ্যে প্রত্যেকনিষ্ঠ ও পরস্পরনিষ্ঠ যে সমস্ত ব্যাপক সম্বন্ধ-পরম্পরা সংখ্যাসম্বন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ বা অনুসরণ করা যায় তাহারই অনুধাবন করা গণিতশাস্ত্রের কাজ। কোনও মূর্ত্ত বা প্রাত্যক্ষিক বাস্তব ( concrete ) জিনিস লইয়া গণিতশাস্ত্র আলোচনা করে না। বস্তুকে ছাড়িয়া দিক্-কাল-ঘটিত কতকগুলি ব্যাপক সম্বন্ধের ( universal ) ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে বলিয়াই গণিতশাস্ত্র বাস্তবতাবর্জ্জিত সংখ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গণিতের জগৎ আমাদের সাধারণ মানুষের জগৎ নহে। গণিত বিন্দুর ( point ) লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছে, "তাহাকেই বিন্দু বলা যায়, যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নাই।" রেখার লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছে, "তাহাকেই রেখা বলা যায়, যাহার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তৃতি নাই।"—এই বিন্দু ও রেখা আমরা কেহই প্রত্যক্ষ করি নাই, ইহার কোনও প্রাত্যক্ষিক মূর্ত্তি নাই অথচ এই রেখা বা ছিন্ন দিগ বস্তুর ধর্ম্ম নিরূপণ করাই জ্যামিতির লক্ষ্য।

এমন কোনও রেখা টানা যায় না, যাহার দৈর্ঘ্য আছে অথচ বিস্তৃতি নাই; কাজেই জ্যামিতি যখন রেখার কথা বলে তখন কোনও দীর্ঘ বস্তুর দীর্ঘত্বমাত্র আমাদের কল্পনার বিষয়ীভূত হয়। বিন্দুর লক্ষণেও দেখা যায় যে, কাল্পনিক অবস্থিতিমাত্রকে দ্যোতনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই কাল্পনিক দৈর্ঘ্যের দ্বারা দিগ্‌বস্তু নানারূপে অবচ্ছিন্ন হইতে পারে এবং বিভিন্ন কাল্পনিক দৈর্ঘ্যের পরস্পর সন্নিবেশে নানারূপ সম্বন্ধ প্রকটিত হইতে পারে। এই সমস্ত কাল্পনিক সম্বন্ধের ধর্ম্ম ও পরস্পরসাপেক্ষ সম্পর্ক বিচারই জ্যামিতির উদ্দেশ্য। মূর্ত্ত ও বাস্তব বস্তুর প্রাত্যক্ষিক ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করে না বলিয়া গণিতশাস্ত্রকে বিকল্পমূলক শাস্ত্র ( abstract science ) বলা যাইতে পারে। যাহার প্রত্যক্ষ ও মূর্ত্ত স্বরূপ নাই, অথচ ভাষা ও সঙ্কেতের ইঙ্গিতে যাহার স্বরূপ উৎপন্ন বা স্ফুট হয়, তাহাকেই বলে বিকল্প। দিক্-কালের স্বনিষ্ঠ ও পরস্পরনিষ্ঠ বহুজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট ও সার্ব্বভৌম সম্বন্ধের স্বরূপ সংখ্যার ইঙ্গিতে চিত্তপটে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই গণিতের কাজ। পদার্থবিজ্ঞান যেখানে তড়িৎশক্তি, আলোকশক্তি, চৌম্বকশক্তি, তাপশক্তি, অভিঘাত শক্তি ( mechanical force or force by impact ) প্রভৃতি বিবিধ শক্তির ও পদার্থ-প্রচয়াত্মক জড়দ্রব্যের সহিত তাহাদের নানা সম্বন্ধে যে সমস্ত নূতন নূতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পারীক্ষিক ( experimental methods ) উপায়ে তাহা প্রত্যক্ষ

করে, সেই হিসাবে বা সেই পরিমাণে তাহা দৃষ্ট শাস্ত্র (experment-al science ) ও গণিতশাস্ত্রের বহির্ভূত। জড়জগতের পরীক্ষাসিদ্ধ এই সমস্ত দৃষ্ট ব্যাপারের অন্তরালে তাহাদের কারণীভূত যে সমস্ত দিক্-কাল-সম্বন্ধ তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেইগুলির আলোচনার দ্বারা যখন গাণিতিক উপায়ে এই সমস্ত জগদ্ব্যাপারের কারণ ও তথ্যনির্ণয় করা যায়, তখন সেই আলোচনাপদ্ধতিকে গাণিতিক পদার্থ-বিজ্ঞান ( mathematical physics ) বলা যায়। গণিতে যে সমস্ত দিক্-কাল-সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলিই স্থূল ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে ব্যবহার করিয়া সেই সমস্ত ব্যাপার-পরম্পরার হেতুরূপে যে সেই সমস্ত গাণিতিক সত্যগুলি বিরাজ করিতেছে, ইহা দেখানই গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের কাজ। সেই জন্য গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতিতে স্থূল দৃশ্যমান জড়বস্তুর স্থান নাই; জড়বস্তু ও জড়শক্তি হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া তাহাদের যে ব্যাপক সম্বন্ধগুলি সংখ্যার দ্বারা দ্যোতিত হইতে পারে, গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান তাহা লইয়াই ব্যস্ত। সেই জন্য গণিত যেমন বিকল্পমূলক শাস্ত্র, গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানও সেইরূপ বিকল্পমূলক। গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ আমাদের দৃষ্ট জগৎ নহে, তাহা বিকল্পের জগৎ ( the world of abstraction )। গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানে দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি পারীক্ষিক উপায়ে দৃষ্ট হেতুর সহিত দৃষ্ট ফলের অবিনাভাব-সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাহার অন্তরালে তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ বা কাঠাম

স্বরূপ সঙ্ঘটক ও নিয়ামক যে সমস্ত দিক্-কালসম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার তথ্য উদ্‌ঘাটন করা, সেই দিক্-কাল-সম্বন্ধের ভাষায় জগদ্‌ব্যাপারের হেতুফল নির্ণয় করা এই পদ্ধতির উপেয়। অপর পন্থায় গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান কতকগুলি দিক্-কাল-সম্বন্ধের বিচার করিয়া যখন কোনও নূতন সম্বন্ধের আবিষ্কার করে, তখন সেই আবিষ্কারের বলে তদনুযায়ী প্রাত্যক্ষিক দৃষ্ট ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করে, সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সহিত যদি দৃষ্ট ফল মেলে, তাহা হইলে সেই গাণিতিক সম্বন্ধের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। Einstein তাঁহার অনেকান্তবাদ গাণিতিক উপায়ে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য যদি সত্য হয়, তবে সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্ররশ্মি সরল না হইয়া বাঁকিয়া যাইবে। সূর্য্যগ্রহণের সময় ফটো লইয়া দেখা গেল যে ছবিতে পরিস্ফুট নক্ষত্ররশ্মি বাঁকিয়া গিয়াছে। ডিব্রোলি ( De broglie ) গাণিতিক উপায়ে যখন এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জগতের সমস্ত জড়বস্তুই বিদ্যুৎস্পন্দাত্মক ( electrical ) তখন একরূপ উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। পরে পারীক্ষিক উপায়ে তাঁহার কথা সপ্রমাণ হইয়াছিল।

জগতের সমস্ত বস্তু দিক্-কাল সন্ততির (space-time-continuum) ঘূর্ণি বা ঊর্ম্মিপুঞ্জ হউক বা না হউক, কতকগুলি দিক্-কাল-সম্বন্ধের সংরচন-চক্র ( system ) যে সমস্ত জড়প্রক্রিয়ার পঞ্জরীভূত সত্য হইয়া রহিয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। এই

পঞ্জরীভূত সত্যের মধ্যে যতই গভীরভাবে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব, ততই সমস্ত জড়বস্তুর সর্ব্বসাধারণ ও সার্ব্বভৌম তথ্যগুলি আমাদের নিকট ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। কিন্তু একটি জড়বস্তুর যে সমস্ত নানা ধর্ম্ম আমরা নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি সেই সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্মগুলি এই সাধারণ ব্যাপক পঞ্জরীভূত দিক্-কাল-ঘটিত সম্বন্ধসংরচন-চক্রের ( system of relations ) অন্তর্ভূত করিয়া বুঝিতে পারি না। বিভিন্ন জাতীয় মূল পরমাণুগুলির পরস্পরসংশ্লেষে ও বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের উপাদানীভূত মূল পরমাণুগুলির পরস্পর বিশ্লেষে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় ও ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, তাহারই অনুশীলন করা রসায়ন শাস্ত্রের কাজ। পারমাণবিক সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে এই যে নানা জাতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, গাণিতিক বা গণিত-বৈজ্ঞানিক দিক্ কাল সম্বন্ধের ভাষায় বা সঙ্কেতে সেইগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। রাসায়নিক সংযোগে যখন দুইটি বা ততো'ধিক পরমাণু মিলিত হইয়া একটী দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক বা চতুরণুক হয়, তখন সেই দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক বা চতুরণুকের ( moleules ) মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুগুলির কিরূপ সন্নিবেশ হয় বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্র কিরূপ ভারাক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে গাণিতিক রসায়ন ( mathematical chemistry ) বা পদার্থবিজ্ঞান-ঘটিত রসায়ন ( physical chemistry ) অনেক ইঙ্গিত দিতে

পারে ও অনেক তথ্য আবিষ্কার করে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি proton ও electron-এর কি খেলা চলিতেছে, দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ও একটি অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হইয়া যে দ্ব্যণুক হয়, তাহার মধ্যে হাইড্রোজেন-পরমাণু দুইটির সহিত অক্সিজেন-পরমাণুটির কিরূপ সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য ও তাহাদের আকর্ষণক্ষেত্র কিরূপ ভারাক্রান্ত এবং তাহাদের কিরূপ পারমাণবিক বিশ্লেষ হয়, গাণিতিক বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিলে গাণিতিক বিজ্ঞানের সহিত রাসায়নিক নানা ধর্ম্ম ও ব্যাপারের যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহা বোঝা যায়, কিন্তু এই সম্বন্ধ-বিজ্ঞানের দ্বারা বা রসায়নের গাণিতিক ভিত্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা ( mathematical foundation of physics ) রাসায়নিক নানা ধর্ম্মের পরিচয় টানিয়া আনা যায় না। দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু, একটি গন্ধক ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণুর সন্নিবেশে একটী sulphuric acid-এর ত্র্যণুক হয়। Sulphuric acidএর ত্র্যণুকটির মধ্যে এই বিভিন্ন পরমাণুগুলির সমাবেশ-বৈচিত্র্য হইতে sulphuric acid-এর নানা ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্ম, রং, তাহার আস্বাদ, তাহার অন্যবিধ প্রতিক্রিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু মিলিলে এমন কি ঘটে যাহাতে তাহা এমন শ্বেত শুভ্র স্বচ্ছ দেখায় এবং আমাদের পিপাসা হরণ করে, তাহা বলা যায় না। একটি গোলাপ ফুলের মধ্যে আণবিক সন্নিবেশের সমস্ত তথ্য জানিলেও, সে জ্ঞানের দ্বারা

বর্ণে, গন্ধে, সুষমায়, কোমলতায়, সৌন্দর্য্যে তাহার যে সমস্ত মূর্ত্ত ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহার কোনও পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। গাণিতিক বা পদার্থবৈজ্ঞানিক দিক্-কাল-ঘটিত সম্বন্ধসংরচন-চক্র যে জাতীয় তত্ত্ব, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্মগুলি তাহা হইতে একেবারে বিভিন্ন পর্য্যায়ের সত্য। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিকে আমরাও কোনও রূপেই সংখ্যার ভাষায় বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে পারি না। অথচ তাহারা যে দ্রব্যের সহিত অন্বিত তাহার অভ্যন্তরীণ সংস্থানের প্রকৃতি সংখ্যার ভাষায় প্রকাশযোগ্য, সেই সংস্থানের পরিবর্ত্তনের যে সমস্ত নূতন দিক্-কাল সম্বন্ধের সঙ্ঘটন হয়, তাহাও সংখ্যার ভাষায় প্রকাশযোগ্য। ইহাও আমরা জানি, সেই সমস্ত অমূর্ত্ত সম্বন্ধের সামান্য পরিবর্ত্তনে ও রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি মূর্ত্ত ধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। অতএব অমূর্ত্ত ধর্ম্মের সহিত মূর্ত্ত ধর্ম্মের যে একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। অথচ অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তের প্রভেদ অনেক এবং দু'এর মধ্যেই যে গভীর ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। অমূর্ত্ত হইতে মূর্ত্তে আসিবার কোনও উপায়ই আমাদের জানা নাই। মূর্ত্ত ধর্ম্মগুলির মধ্যেও একটি হইতে অপরটিতে আসিবার কোনও উপায় নাই। রূপ হইতে রসে, বা রস হইতে রূপে পৌছিবার কোনও পথই আমাদের জানা নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি অমূর্ত্ত সম্বন্ধের সংরচনে যে স্থান নিম্মিত হইয়াছে, তাহাই জড়দ্রব্যের

ভিত্তি। তাহার উপর অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ঐন্দ্রিয়ক মূর্ত্ত ধর্ম্ম আপন আপন স্বগত নিয়মে পরস্পর একীভূত হইয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে। ঐন্দ্রিয়ক মূর্ত্ত ধর্ম্মগুলির যথার্থ স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা আমরা এ প্রবন্ধে করিব না, তবে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, অমূর্ত্ত ধর্ম্মের সংস্থানের সহিত একার্থসংযোগে সংশ্লিষ্ট হইয়া নানা পর্য্যায়ের মূর্ত্ত ধর্ম্ম আপন আপন নিয়মে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই একার্থসংযোগের তাৎপর্য্য এই যে, বিশেষ বিশেষ বিভাগের ( যেমন রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতির ) বিশেষ বিশেষ আত্মনিষ্ঠ সম্বন্ধ-পরম্পরার পৃথক্ পৃথক্ সংরচন থাকিলেও তাহারা পরস্পরের সহিত এমন একটি সহযোগে বা সহানুবর্ত্তিতায় আবদ্ধ থাকে যে, তাহাদের এই স্বনিষ্ঠত্ব ও স্বপৃথকত্ব মূর্ত্ত দ্রব্যের অখণ্ড ঐক্যটিকে ব্যাহত করে না। এই পরস্পরানুবর্ত্তিতার একটি তাৎপর্য্য এই যে, একটি অপরটির অনুকূলে প্রবৃত্ত থাকে। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্মপর্য্যায়গুলির প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলে। অথচ তাহারা পরস্পরের অবিরোধে এবং মূল দিক্‌কালঘটিত সম্বন্ধ-চক্রের অবিরোধে ও অনুবর্ত্তিতায় একটি অখণ্ড মূর্ত্ত দ্রব্যকে আমাদের সম্মুখে পরিচিত করে। এই অনুবর্ত্তিতা ও সহযোগিতাই বহু ভেদসমবায়ের মধ্যে কোনও বস্তুকে তাহার স্বসত্তায় অভিন্ন ও অখণ্ড করিয়া রাখিয়াছে।' কোনও বস্তুকে দেখিলে তাহাকে আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি

ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্মের সমষ্টি বলিয়া মনে করি না, কিংবা দিক্-কাল সম্বন্ধের একটি বিশেষ সংরচন মাত্র বলিয়াও মনে করি না, তাহাকে একটি অখণ্ড বস্তু বলিয়াই মনে করি। বস্তুর আভ্যন্তরীণ দিক্-কাল সম্বন্ধ-সংরচন তাহার মূল কাঠাম বা সংস্থান। তাহার সহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া নানা বিভিন্ন পর্য্যায়ের ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্মপরম্পরা পরস্পরের সহযোগে ও অবিরোধে প্রকাশিত হয়। চিনি দেখিতে সাদা, আস্বাদে মিষ্ট, উপাদানে কয়লা, স্পর্শে কর্কশ; তাহার আণবিক সংশ্লেষ-বিশ্লেষ ও অণুর অভ্যন্তরস্থ সংরচনের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা আরও অনেক নূতন নূতন তথ্যে উপনীত হইতে পারি। এই বিভিন্ন পর্য্যায়ের সত্যগুলির মধ্যে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহার নিজ নিজ পরিচয় দেয়, অথচ তাহারা একাত্মিভাব সম্বন্ধে একটি অখণ্ড বস্তুর ধর্ম্মরূপে নিজেদের জানায়। Berkeley যখন বলিয়াছিলেন যে, ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম্মগুলির যে পরস্পরের এবং তাহাদের মূল কাঠামের সহিত একটি একাত্মিভাব লক্ষণ সম্বন্ধে বন্ধন রহিয়াছে, তখন তিনি এই কথাটি অনুধাবন করেন নাই। Locke এবং বৈশেষিক যখন বলেন যে গুণ দ্রব্যাশ্রিত, তখন দ্রব্যকে গুণাশ্রয়ী ছাড়া আর কোনও লক্ষণ তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি যে, কতকগুলি ধর্ম্মপরম্পরা একটী মূল সম্বন্ধ-চক্রের অন্বয়ে ও অনুবর্ত্তিতায় পরস্পর একাত্মীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই একাত্মীভূত সংরচনপরম্পরার ঐক্যের নামই দ্রব্য। জড়ের আরম্ভ কেমন

করিয়া হইল, তাহা বলাও যেমন কঠিন, প্রাণের আরম্ভ কেমন করিয়া হইল, তাহা বলাও তেমনি কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নানা ধারার সম্বন্ধ-সন্তানের ( series of relations ) সমাবেশে জড়দ্রব্যের পরিচয়। এই সম্বন্ধ-সন্তানগুলি জড়ের আভ্যন্তরীণ নানা ব্যবস্থায় নানাবিধ জড়শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। জড়শক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকার,—আভিঘাতিক (molar), দ্ব্যণুক স্পন্দনাত্মক (molecular) ও বৈদ্যুতিক (electrical) ; এই তিনটি শক্তির প্রত্যেকটি অপরটিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ তাপশক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি করা যায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে পরিণত করা যায়, তেমনি অভিঘাত-শক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই মূল একই জড়শক্তি, অভিঘাত-শক্তি, বৈদ্যুতিক-শক্তি স্পন্দনশক্তি রূপে এবং তাহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা শক্তিরূপে ( যথা, রাসায়নিক, চৌম্বক ইত্যাদি ) আত্মপ্রকাশ করে। যখন বিভিন্ন প্রকারের জড়শক্তি কোনও একটা কেন্দ্রে সমাবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া যোগ-বিয়োগের ফলে যেটুকু অবশেষ থাকে, তাহারই পরিচয় পাই। যেখানে ঘাত-প্রতিঘাত হয় না, সেখানে প্রত্যেকটি শক্তি স্বতন্ত্রভাবে আপন স্বনির্দ্দিষ্ট রেখায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহার কোনটিই অপরটির অপেক্ষা রাখে না, বা অপরটির পরিবর্ত্তনে আপনাকে পরিবর্ত্তিত করে না। কিন্তু জড়শক্তিকে অবলম্বনীভূত করিয়া যখন প্রাণ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়,

তখন আমরা একেবারে একটি নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়ি। এই প্রাণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। কোনও জড়বস্তুর সম্বন্ধে যেমন আমরা মনে করি যে, সেই বস্তুতে নানা গুণ ও ক্রিয়া ধর্ম্মরূপে বা বিশেষণীভূত হইয়া আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, ভাষায় ভাবপ্রকাশের প্রণালীও অনেকট তদ্রূপ। ভাষা মাত্রেই কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বিশেষণ লইয়া গঠিত। এই ক্রিয়া, কর্ম্ম ও বিশেষণগুলি নানা প্রকার পরম্পরা-সম্বন্ধে জড়িত হইয়া কর্ত্তার বিশেষণ রূপে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন যে, কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি ইহারা সকলেই পরম্পরা-সম্বন্ধে ক্রিয়ার বিশেষণ। যে মতই গ্রহণ করা যাউক না কেন, দ্রব্যগুণ জাতীয় সম্বন্ধও যা', বিশেষ্য-বিশেষণ জাতীয় সম্বন্ধও তাই। কাজেই, আশ্রয়আশ্রিত ভাব ছাড়া অন্য জাতীয় ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রাণ-পর্য্যায়ের মধ্যে যে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে এরূপ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব নির্ণয় করা যায় না। যে সমস্ত বিবিধ ব্যাপার-পরম্পরার সংরচন-প্রক্রিয়ায় (organisation of relations) প্রাণ-পর্য্যায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার মধ্যস্থ কোনওটিকে কোনওটিতে আশ্রিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই নূতন পর্য্যায়ের তত্ত্বকে সেই জন্য ভাষায় ফুটাইয়া তোলা দুষ্কর। জড়দ্রব্যের প্রতিচ্ছবিতে ও জড়জাতীয় ভাবচ্ছবিতে মনকে আবিষ্ট না রাখিয়া মনের মধ্য হইতে একেবারে একটা নূতন

জাতীয় দৃষ্টি প্রসারিত করিতে না পারিলে, প্রাণ-পর্য্যায়ের লীলা কিছুতেই চিত্তপটে স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাণপর্য্যায়ের তিনটি বিশেষ স্বভাব প্রাণস্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস, রস-সঞ্চরণ ও পাকক্রিয়া এই তিনটি ব্যাপার বিদ্যমান রহিয়াছে। ত্রিদণ্ডী যেমন তিনটি দণ্ডের উপর সংধারিত, প্রাণ-প্রক্রিয়াও তেমনই এই তিনটি ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপার তিনটির যে কোনওটির অভাব হইলে প্রাণ-প্রক্রিয়া বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু, এই প্রক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য থাকিলেও তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। একই প্রাণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ যেন ত্রিধা বিভক্ত হইয়া এই তিনটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণ-প্রক্রিয়া ছাড়া এই তিনটির কোনওটিরই কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অথচ প্রাণ-প্রক্রিয়া আগে, কি এই তিনটি প্রক্রিয়া আগে, কি প্রাণ-প্রক্রিয়া অবয়বী ইহারা তাহার অবয়ব, এরূপ কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধ, বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ, আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ প্রভৃতি কোনও একমুখী সম্বন্ধের কথাই প্রাণ-প্রক্রিয়ার পর্য্যালোচন-প্রসঙ্গে উঠিতে পারে না। শ্বাসাদি ব্যাপার প্রাণস্বরূপে আশ্রিত, একথা যেমন সত্য, প্রাণ-প্রক্রিয়াও ঐ ব্যাপারগুলির উপর আশ্রিত হইয়া আছে, ইহাও তেমনি সত্য। প্রাণ-প্রক্রিয়া মূল, না

শ্বাসাদি প্রক্রিয়া মূল বা প্রথম, তাহা নির্ণয় করা যায় না। শ্বাসাদি প্রক্রিয়া ছাড়া স্বতন্ত্র কোনও প্রাণ-প্রক্রিয়াও আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। আবার শ্বাসাদি প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির সহিত অপরটির এমন একটি অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, তাহাদের একটির উৎকর্ষাপকর্ষে অপরটির উৎকর্ষাপকর্ষ সঙ্ঘটিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া যদি উত্তমরূপে চলে, তবে রসসঞ্চালন বা পরিপাকাদি ব্যাপারও সুনিষ্পন্ন হয়; আবার সঞ্চালনাদি ক্রিয়া যদি ভাল চলে, তবে শ্বাসক্রিয়া ও পরিপাকক্রিয়া ভাল চলে। আবার পরিপাক ক্রিয়া ভাল চলিলে শ্বাসাদি প্রক্রিয়া ভাল চলে। তেমনি ইহাদের কোনও একটির কিছু দুর্ব্বলতা হইলে অপরটিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই যে পরস্পরাপেক্ষিতা, ইহা শুধু অবিরোধে স্থিতি বা অনুকূল অবস্থায় স্থিতি নহে। সেই জন্য ইহাদের সম্বন্ধকে একার্থিভাব সম্বন্ধ বলা চলে না। ইহারা পরস্পরের সহায় হইয়া পরস্পরের মধ্যে পর্য্যাপ্ত একটী প্রাণব্যাপারকে সঞ্চালিত করিয়া রাখিতেছে। ইহারা যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া কাহাকেও পাইবার উপায় নাই। সেই জন্য এই সম্বন্ধকে এককারিত্ব বা একার্থকারিত্ব সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে।

আর এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রাণ-পর্য্যায়ের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ অন্যভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা স্বগৃহীত বর্জ্জন (self-disassimilation), স্বস্থাপন (self-preservation)।

অর্থাৎ গ্রহণ, বর্জ্জন, গতি ও আহরণাদি ক্রিয়া, স্বসৃষ্টি বা বংশবিস্তার ক্রিয়া (self-multiplication), স্বপরিণাম (self-development) এবং স্বনিয়ন্ত্রণ (self-regulation) অর্থাৎ স্বশরীর-যন্ত্রক্রিয়া নিয়মন, পারিপার্শ্বিক বস্তুজাতের স্বানুকূলে পরিবর্ত্তন সাধন ও তদপেক্ষায় স্বকীয় পরিবর্ত্তন সাধন এবং স্বকীয় বিবিধ বৈষম্য সম্পাদন ও বৈষম্যে সাম্যসাধন (self-differentiation, self-adaptation, self-adjustment ইত্যাদি) প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণ-পর্য্যায় পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ হইতে আপন দেহোপযোগী খাদ্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লয় এবং তাহার দ্বারা আপন দেহ গঠন করিয়া তোলে। বৃক্ষাদি চারিদিকের জল, বাতাস, আলোক ও ভূমিরস হইতে আপন দেহের উপযোগী খাদ্য আপনিই প্রস্তুত করিয়া লয় এবং সেই জন্য প্রত্যেক প্রাণ-পর্য্যায়ের প্রস্তুত খাদ্য (proteid) অপরাপর পর্য্যায় হইতে বিভিন্ন। প্রত্যেক প্রাণ-পর্য্যায়ের শরীরের মধ্যে এই যে খাদ্য-সংগ্রহণ ও শরীর-বিধারণের ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাকে ইংরাজিতে বলে anabolism এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব গৃহীতের অপচয় ও বিশরণ ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাকে বলে catabolism। এই উভয় ক্রিয়ার সমষ্টি ও সামঞ্জস্যের নাম metabolism। যেখানে জীবন আছে, সেখানেই আমরা তাহার এই গ্রহণ-বিশরণাত্মক ক্রিয়ার পরিচয় পাই। যে জৈব ধাতু বা proteid পদার্থের গ্রহণ-বিশরণ ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণপর্যায় আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত রাখে, সেই ধাতুটি প্রত্যেক প্রাণ-পর্য্যায়েরই স্বোপযোগী ইতর-ভিন্ন ও ইতর-ব্যাবর্ত্তক। ঘোড়ার রক্ত ঔপাদানিক বস্তু হিসাবে গাধার রক্ত হইতে বিভিন্ন। এই ধাতুগত বৈষম্য প্রযুক্তই অনেক সময় দেখা যায় যে, একজনের পক্ষে যাহা পুষ্টিকর, অপরের পক্ষে তাহা বিষতুল্য। জীব-শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিয়াছে, তেমনি তাহারই আনুষঙ্গিক ভাবে গ্রহণ চলিয়াছে। একটি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই গ্রহণ-বিশরণ ব্যাপারের এমন একটি ছন্দ আছে যে, সমস্ত আগম-নির্গম-গ্রহণ-বিশরণের মধ্য দিয়া একটি স্থায়ী প্রাণ-প্রবাহ আপনাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত রাখে। একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে যেমন নূতন জল বাহির হইয়া যায়, কিন্তু এই জলের আগম-নির্গমের মধ্যে ঘূর্ণিটি আপনাকে অব্যাহত রাখে, প্রাণ-ব্যাপারও তেমন একটি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বধাতুর উপচয়াপচয়ের মধ্যে আপন প্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়াও যদি এই গ্রহণ-বিশরণাত্মক প্রাণ-ব্যাপার স্তব্ধ থাকে, তথাপি প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কোনও হানি হয় না। কোনও কোনও বীজকে ৮৭ বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিয়াও অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্যাপারময় না হইয়াও একটী অখণ্ড প্রাণন কেমন করিয়া স্তব্ধীভূত হইয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহা মনীষিগণের ও দুর্জ্ঞেয়। প্রাণ-পর্য্যায় পারিপার্শ্বিক বহির্জগৎ হইতে শক্তি আহরণ করে, আহৃত শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখে, মিতব্যয়িতার

সহিত খরচ করে ও অপর প্রাণ-পর্য্যায় সৃষ্টি করে, এবং তাহাতে সেই শক্তি সংক্রামিত করে। "The animate system is aggressive on the energy available to it, spends it with economy and invests it with interest till death finally deprives it of all."

প্রাণ-পর্য্যায় যে কেবল বহির্জগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া নানা ব্যাপার-পরম্পরার পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিজের কার্য্যোপযোগী দেহ গঠন করিয়া তুলিয়া নানা ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চলে তাহা নহে, সে তার আপন সদৃশ প্রাণ-পর্য্যায় সৃষ্টি করিয়া ধারা-প্রবাহে নিরন্তর আপনাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। পারিপার্শ্বিক বাহিরের জগৎকে সে যেমন একদিকে আপন অনুকূলে, আপন দেহধাতুতে পরিণত করিয়া তোলে, তেমনি পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত সামঞ্জস্যে চলিবার জন্য আপনাকে তদনুকূলে পরিবর্ত্তিত করিয়া তোলে। উপনিষদে আছে "তদৈক্ষত বহুস্যাম্"। তাঁহার ঈক্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা তিনি আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া তুলিলেন। তেমনি দেখিতে পাই যে, একটি জীবকোষের মধ্যে কি অজ্ঞাত ঈক্ষণ-ক্রিয়ার ফলে তাহার অন্তর্গত ক্রোমোজম্‌গুলির মধ্যে কি এক প্রক্রিয়া চলে, যাহার ফলে সেই জীবকোষটি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দুই পৃথক্ প্রাণ-প্রক্রিয়ার আরম্ভ করে। আবার বহুকোষী (multicellular) প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে যদিও প্রত্যেকটি কোষের

স্বতন্ত্র জীবন-প্রণালী চলিয়াছে, তথাপি অন্য কোষের সান্নিধ্য ব্যতীত তাহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব। একটি স্পিনাশ গাছকে টুক্‌রা করিয়া ফেলিলে, তাহাদের প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবনই অসম্ভব হয়, আবার একটি স্পঞ্জ্‌কে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেও প্রত্যেক চূর্ণ আপন জীবনশক্তির প্রভাবে আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলে।

ডারুউইনের ক্রমবিকাশ মতের তাৎপর্য্য এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও আহারসংস্থানের জন্য জীব-জগতে প্রাণি-পর্য্যায়ের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা একটা দ্বন্দ্ব (struggle for existence) চলিয়াছে। সেই দ্বন্দ্বে ঘটনাক্রমে যে জীবের যে সুযোগটি আসে, সেইটিই তাহার সহায় হয় এবং বংশ-সন্ততির মধ্যে যাহাদের সেই সুযোগটি থাকে বা অন্য জাতীয় কোনও সুযোগ আসিয়া জোটে, তাহারাই জীবন সংগ্রামে টিকিয়া যায়। এমনি করিয়া দেখা যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী সুযোগসুবিধা লইয়া নানা প্রাণিসম্প্রদায় জন্মিয়াছে। বাহ্য জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্রাণিসম্প্রদায় তাহার অনুকূলে চলিতে পারে নাই, তাহারা ধ্বংস পাইয়াছে আর যাহারা স্বকীয় সুযোগসুবিধার সাহায্যে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহারা টিকিয়া গিয়াছে। এই যে অনুপযুক্তের মৃত্যু এবং উপযুক্তের স্থিতির একটি

বাছাই ( selection ) চলিয়াছে, ইহাকে বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ( natural selection )।

এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন একেবারে অসম্ভব হইত যদি জীবিতেরা যাহাদের উৎপন্ন করে, তাহারা সকলেই মাতাপিতার সর্ব্বথা অনুরূপ হইত। জীবিতেরা যাহাদের উৎপন্ন করে, তাহারা সকল সময়েই পিতামাতার কিঞ্চিৎ অনুরূপ ও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। এই বৈষম্য উৎপাদনের নাম আকস্মিক বৈষম্য বা accidental variation। প্রতি বংশে নূতন নূতন বৈষম্য হয় বলিয়াই সেই বৈষম্যগুলির মধ্যে যেগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামের উপযোগী, তাহার একটা বাছাই হইতে পারে ; এইরূপ একটু একটু বৈষম্যের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় বাছাই ও নূতন নূতন বৈষম্যের সৃষ্টি ও তাহাদের বাছাই চলিয়াছে এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই জগতের এই বহুধা বিচিত্র জীবরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই ডারউইনের মত। কিন্তু যদিও ডারউইনের এই মত মোটামুটি ভাবে অনেক পরিমাণে সত্য, তথাপি কেবলমাত্র সামান্য সামান্য বৈষম্যের সঞ্চয় হইতেই যে এত বিচিত্র জীবনপর্য্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। Weismann বলেন যে, প্রত্যেক জীবের জীবনীর মধ্যে দুইটি অংশ আছে। একটি দেহনির্ম্মাপক অংশ অপরটি মূল বীজাংশ (germplasm)। মূল বীজাংশটী বংশানুক্রমে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সংক্রমিত হইতে থাকে। প্রত্যেক বংশের মধ্যবর্ত্তী

পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এই বীজাংশ পরবর্ত্তীতে সংক্রমিত হইয়া তাহার জীবনের আরম্ভ করে। এই মূল বীজ হইতে আরব্ধ জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপন দেহ আপনি নির্ম্মাণ করিয়া লয়। কিন্তু এই ব্যাখাতেও এই অসংখ্যের বিচিত্র প্রাণ-পর্য্যায়ের উৎপত্তির কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন যে প্রত্যেক কোষের অন্তর্বর্ত্তী ক্রোমোজোম্‌গুলি যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবশক্তি সমন্বিত। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচিত্র শক্তিপুঞ্জের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত হইয়া কোষান্তর্বর্ত্তী ক্রোমোজোম্‌গুলির বিভিন্ন রকম ঘটনবিঘটনের উৎপত্তি হয়। এই ঘটন-বিঘটনের ফলে সেই ক্রোমোজোমগুলির যে বিচিত্র বিন্যাসপরম্পরা হয়, তাহারই ফলে নানা জীব-পর্য্যায়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন জীবকোষের মধ্যে ক্রোমোজোম্‌গুলির নানাবিধ সংখ্যাবৈচিত্র্য দেখা যায়। ক্রোমোজোমের এই সংখ্যা-বৈচিত্র্য মানিতে গেলে আদিম জীবকোষের বৈষম্য মানিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বিচিত্র জাতীয় জীববীজের সম্মিলনের দ্বারা নানা বিচিত্র জীব-পর্য্যায়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ মতেও গোড়া হইতেই জীববৈষম্য না মানিলে বিভিন্ন জাতীয় জীবকোষের সম্মিলন ব্যাখ্যা করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, একটি অখণ্ড প্রাণ-শক্তি নানাবিধ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। এই বাধাগুলির সহিত জীবশক্তির সর্ব্বদাই একটি দ্বন্দ্ব চলিয়াছে ; সেই দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন বাধাগুলি

যেমন যেমন বিচিত্র ভাবে অপসারিত হয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র প্রাণ-পর্য্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোনও মতকেই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। জীবভাবকে জীবশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে এই কথাই মনে আসে যে জীবশক্তিও বুঝি জড়শক্তির অনুরূপ আর একটি মূঢ়শক্তি মাত্র। তাহাই যদি হইল, তবে সে শক্তি ত জড়শক্তিরই প্রকার বিশেষ হইল। কিন্তু জীবভাবের মধ্যে গ্রহণ, ধারণ বর্জ্জন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার-পরম্পরার সামঞ্জস্য ও ঐক্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কোনও জড়শক্তি তাহা সম্পাদন করিতে পারে না।

প্রত্যেক জীবভাবের মধ্যেই আমরা শক্তি দেখি, কিন্তু সেই শক্তি সেই জীবভাবের ফল, হেতু নহে! আগে জীবভাব মানিলে তবে শক্তি সিদ্ধ হয়, শক্তির দ্বারা জীবভাবের উৎপত্তি হয় না। জীবের মধ্যে যত কিছু শক্তির পরিচয় আমরা পাই, সে সমস্ত জীবদেহের অন্তবর্ত্তী রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শক্তিবিশেষের ফল মাত্র। জড়শক্তি ছাড়া জীবের কোনও স্বতন্ত্র শক্তি নাই। পারিপার্শ্বিক জড়বস্তু হইতে উদ্ভিদ্ আপন আহার সংগ্রহ করে, আর অন্যান্য প্রাণীরা সেই উদ্ভিদ্ হইতে কিংবা অন্য প্রাণিদেহ হইতে আপন আপন আহার সংগ্রহ করে। সেই জন্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে সমস্ত আহারই জড় হইতে সংগৃহীত। এই আহৃত জড়বস্তুর শক্তি জীবজগতের অন্তর্ভূত হইয়া জীবশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। অথচ জড়শক্তিকে কোনও ক্রমেই জীবশক্তি বলা যায় না। যখন

কতকগুলি বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তি পরস্পরের মধ্যে ও বহির্জ্জগতের শক্তিচক্রের সংসর্গে এমন একটি একার্থকারিত্ব সম্বন্ধে এমন ভাবে অন্বিত হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকটি অপরটির সহায় হয় এবং এমন ওতপ্রোতভাবে অখণ্ডরূপে আপনাদের পরিচয় দেয় যে, প্রত্যেটিকে ছাড়িয়া ও সমগ্রকে ছাড়িয়া তাহাদের কোনটির কোন সত্তা নাই বা প্রকাশ নাই, তখন সেই সামঞ্জস্যে বিবিধ শক্তিচক্রের যে একটি ঐক্য সাধিত হয়, তাহাকেই জীবন বলা যায়। ইংরাজিতে purpose বা উদ্দেশ্য-প্রয়োজন বলিতে যা' বুঝা যায়, তাহার প্রথম পরিচয় আমরা জীবনেই পাই। এই যে গ্রহণ, ধারণ, বর্জ্জন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট নানা শারীর ক্রিয়া একটি অপরটির মধ্যে ও প্রত্যেকটি সমগ্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া একটি ঐক্যের (unity) সৃষ্টি করে, এবং এই যে ঐক্যটি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আপন সামঞ্জস্যকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা বহির্জ্জগতের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, বহির্জ্জগতের ধাতুকে স্বধাতুতে পরিবর্ত্তিত করিতেছে ও প্রয়োজনানুসারে আপন স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া বহির্জ্জগতের সহিত অনুকূলতা করিতেছে এবং আপনার মধ্য হইতে স্বানুরূপ নূতন নূতন সামঞ্জস্যের কেন্দ্রকে বীজীভূত করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া বহির্জ্জগতের মধ্যে আপনার মধ্যে আপনি পর্য্যাপ্ত থাকিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, ইহাকেই বলে জীবন। "(Life is a self-existing unity of self-purposive and self-revolving relations begetting similar unities out of

itself and carrying on itself in self-adaptation with its environment.)"

যেমন দিক্-কাল সন্ততির সম্বন্ধ সংরচনের ব্যবস্থায় যে একাধিভাব-লক্ষণ ঐক্যের বিধান হয়, তাহাতেই জড়বস্তুর উৎপত্তি হয়, তেমনি জড়শক্তিবর্গের সম্বন্ধ সংরচনক্রিয়ার (organisation of relation) এমন একটি সামঞ্জস্যের ঐক্য গঠিত হয়, যেখানে প্রত্যেকটি ব্যাপার অপর প্রত্যেকটি ব্যাপারের অপেক্ষায় ও সহায়তায় সঙ্ঘটিত হয়, অথচ সমগ্র হইতে প্রত্যেকশক্তিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া যায় না। "The very nomenclature of biology embodies the conception that life in whatever form it may occur occurs as a specific whole, in which the parts and actions are essentially relative to one another and cannot be isolated without destroying their nature. The working hypothesis of biology is that wholeness exists, and this working hypothesis has carried biology forward just successfully as the Newtonian conception has carried the physical sciences forward. Biologists are and always have been progressively tracing the specific co-ordination which shows itself in the structure, activities and environment of living organisims. This conception can

not be expressed in terms of ordinary physical and chemical conceptions. For this reason biology must be regarded as a distinct science or group of sciences."

এই যে জড়শক্তিকে উপায়ভূত করিয়া একটি অখণ্ড স্বান্তর্ভূত স্বপ্রয়োজক সমগ্র জীবসত্তার আবির্ভাব হয়, ইহা উহার পারিপার্শ্বিক সমস্ত বস্তুকে কেবলমাত্র ইহার আপন প্রয়োজনের চক্ষে দেখিয়া থাকে। উদ্ভিদেরা গতিশীল নহে। সেইজন্য একস্থানে থাকিয়া তাহারই চারিপার্শ্বে যাহা, তাহা লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু অতি নিম্নস্তরের জঙ্গমপ্রাণীর মধ্যেও এই জৈব স্বপ্রয়োজক ব্যাপারের একটা নূতন পর্য্যায় দেখা যায়। দেখা গিয়াছে যে, যদি বড় একটি "এমিবা" কীট একটি অত্যন্ত নিম্নপর্য্যায়ের এমিবা কীটকে আহার করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয় এবং যদি তাহার কবলগ্রস্ত হইয়াও সেই কীট পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়া নানাদিকে ধাবিত হয়, তবে সেই বড় এমিবা কীটটিও তাহার পিছনে পিছনে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং এইরূপ নানা অনুসন্ধানে ও চেষ্টায় তাহাকে ধরিয়া আহার করে। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রাণীর মধ্যে ক্রমশঃ এই স্বভাবটি স্ফুট হইয়া উঠে। নিজের আহার অনুসন্ধানে, প্রাণরক্ষণে, নিজের সন্ততিকে ভয়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অর্থাৎ প্রায় সমস্ত স্বরক্ষণ ( self-preservation ) এবং

বংশরক্ষণের ( race-preservation ) ব্যাপারে বহির্জগতে লোভের বা ভয়ের যা কিছু ঘটনা ঘটে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে প্রাণিশরীরে তাহা অজ্ঞাত উপলব্ধিরূপে থাকিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তাদৃশ ঘটনা ঘটিলে পূর্ব্বসঞ্চিত উপলব্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া স্বরক্ষণ বা বংশরক্ষণ ব্যাপারের অনুকূল কার্য্যে তাহাদিগকে প্রণোদিত ও প্রোৎসাহিত করে। এমন অনেক সময়ে দেখা যায় যে, একটা ইঁদুর যদি একবার কলে পড়িয়া কোনও ক্রমে ছাড়া পায়, তবে পুনরায় তাহাকে কলে ফেলা দুঃসাধ্য হয়। একটা বিড়াল যদি কোনও ক্রমে একটা খাবারের ঢাক্‌না খুলিয়া ফেলিতে পারে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে তাহার পক্ষে সেই কার্য্য ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে। W. K. Clifford বলিয়াছেন, "It is the peculiarity of living things that they change under the iufluence of surrounding circumstances but that any change which takes place in them is not lost, but retained and as it were, built into the organism to serve as the foundation of future actions." Bergson এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "Its past in its entirety, is prolonged into its present and abides there actual and acting." এই যে নানা জাতীয় ব্যাপারকে একীভূত করিয়া একটি অবিচলিত সামঞ্জস্যে সমস্ত বহির্জগৎকে স্বপ্রয়োজনের উপায়ভূত রূপে ব্যবহার করিয়া নানা প্রতিকূল

অবস্থার মধ্য দিয়া জীব আপনাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে, এই অখণ্ডজীবভাবকেই জীবপুরুষ ( biological personality ) বলা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর বিচিত্র প্রাণপ্রক্রিয়ার ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি জীবপুরুষের প্রাণব্যাপারের একটি স্বতন্ত্রতা ও বিশিষ্টতা আছে। তাহার গ্রহণ, ধারণ, বর্জ্জন, বহির্জ্জগতের সহিত ব্যবহার, বহির্জ্জগৎকে সে যে প্রণালীতে আপন প্রয়োজনের অন্তর্গত করে, বহির্ব্যাপার তাহার মধ্যে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, এবং সেই প্রতিফলনের অনুসারে সে কি ভাবে আপনাকে চালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে, সে সমস্তগুলিরই এক একটি বিশিষ্ট প্রণালী আছে। সেই প্রণালীটি সেই জীবপুরুষের অন্তঃস্থিত আধান-পদ্ধতি ( structrual scheme ) হইয়া রহিয়া সেই জীবপুরুষের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে সুব্যক্ত করিয়া তোলে। বহির্জ্জগতের সহিত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এই আধান-পদ্ধতিটিই ঈষৎ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয় এবং ক্রমবিকাশের ধারায় এই পরিবর্ত্তিত আধান-পদ্ধতিটি জীব হইতে জীবান্তরে সংক্রমিত হয়। আবার প্রত্যেক জীবের স্বকীয় ব্যবহারে যে সমস্ত নূতন নূতন উপলব্ধি ঘটে, সেগুলির দ্বারা তাহার প্রাক্লব্ধ আধান-পদ্ধতিটি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় এবং সেই সঙ্গে তাহাতে নূতন নূতন শরীরক্রিয়া ও নূতন নূতন যন্ত্রাদিরও সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন এই আধান-পদ্ধতিটি মূর্ত্তভাবে মূলবীজের ক্রোমোজোম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সেগুলির মধ্যে

নানা ঘটন-বিঘটন, নানা সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া প্রাণিশরীরের সংস্থান ও স্বভাব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। প্রত্যেক প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত জৈব প্রক্রিয়া চলে, এবং বহির্জগতের সহিত সে যে ভাবে ব্যবহার করে, তাহার সমস্ত প্রক্রিয়াই প্রায় তাহার জীবপুরুষের আধান পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন কোনও জীব পারিপার্শ্বিক কোনও বহির্বস্তুকে আপন প্রয়োজনের অনুকূল করিতে চেষ্টা করে, তখন যদি সেই জীবের আধান-পদ্ধতি সহজে তাহাকে গ্রহণ করিতে না পারে, বা গ্রহণের পথে কোনও বাধা উপস্থিত হয়, বা, কোনও কারণে গ্রহণ করিতে বিলম্ব বা বিরুদ্ধতা ঘটে, তবে সেই আধান-পদ্ধতির সহিত বহির্বস্তুর অল্পবিস্তর সংঘর্ষ ঘটে ; সেই সংঘর্ষই জীবপুরুষের নিকট দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। আধান-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ উদ্দেশ্য স্বরক্ষণ ও বংশরক্ষণ ; কিন্তু, তথাপি কোনও বিশেষ আধান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলেই যে সেই বস্তুটি সেই বিশিষ্ট জীবের স্বরক্ষণ বা বংশরক্ষণের প্রতিকূলে, তাহা বলা যায় না। ক্রমপরিবর্ত্তমান বিচিত্র অবস্থা-সম্পাতের মধ্যে পড়িয়া প্রত্যেক বিশিষ্ট আধান-পদ্ধতিকে একটু একটু বদলাইতে হয়। এই বদলাইবার ক্ষমতাতেই স্বরক্ষণ ও বংশরক্ষণে ক্রমশঃ পটুতা জন্মে।

সেই জন্য biological experience বা জৈবসংস্কার বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই আধান-পদ্ধতিতেই ক্রমবিকাশের

ধারায় সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে আধান-পদ্ধতির যে নূতন নূতন পর্য্যায়ে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি চলিতে থাকে, তাহার দ্বারা বহির্জগতের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান ক্রমশঃ সহজ হইয়া উঠে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যেমন দিক্-কাল সন্ততির নানা সম্বন্ধ-সংরচনচক্র নানা আধান-সংহতি হইয়া নানা জড়দ্রব্যরূপে আপনাকে পরিচিত করিতেছে, তেমনি সেই জড়দ্রব্যাত্মক আধান-সংহতির উপর পদক্ষেপ করিয়া একার্থকারিত্ব সম্বন্ধে নূতন নূতন আধান-পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করিয়া নানা জীবরূপে আপনাকে পরিচিত করিতেছে।

মনুষ্যেতর প্রায় সমস্ত প্রাণীরই জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জৈবব্যাপারের অনুরোধে ছাড়া পারিপার্শ্বিক বহির্বস্তুর সহিত তাহাদের আর কোনও জাতীয় সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। যখনই বহির্জগতের সহিত কোনও জৈবসংঘর্ষ ঘটে, এবং নূতন নূতন আপদ্-বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখনই আধান-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সঞ্চিত শক্তির ব্যবহারে জীবপুরুষেরা সেই বিপদ্ হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে, এবং যে উপায়ে ত্রাণ পাইল, সেই উপায়ের সহিত বিপদ্‌টি একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে তাহার আধান-পদ্ধতির মধ্যে সংহিত হইয়া যায়। শুধু বিপদ্-আপদের বেলাই যে একথাটি ঘটে তাহা নয়, আহার-বিহার, স্বরক্ষণ, প্রভৃতি সকল জৈবব্যাপারেরই অনুকূলে প্রতিকূলে বাহ্য জগতে যাহা কিছু ঘটে, সে সমস্তগুলি তাদৃশ জৈবব্যাপারের সহিত

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আধান-পদ্ধতির মধ্যে মুদ্রিত হইয়া যায়। তাহার ফলে যখনই জৈবব্যাপারের কোনও সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ব্বাভ্যস্ত অনুকূল ক্রিয়ার দিকে আধান-পদ্ধতি উৎসাহিত হইয়া উঠে এবং তাহার অনুসরণ করিয়া সেই জীবপুরুষটি বহির্জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। অনেক সময়ে বংশগত পূর্ব্বসঞ্চিত জৈবসংস্কারের ফলে আধান-পদ্ধতি স্বভাবতই স্ব স্ব জীবনোপযোগী উপায়-পরম্পরার মধ্যে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে। এই জাতীয় সমস্ত ব্যবহারকেই আকৃতি বা instinct বলা যায়। কিন্তু এই সমস্ত আকৃতিক ব্যবহারের বিশিষ্টতা এই যে, সেই সমস্ত ত্রাণোপায়, আহারোপায় বা রক্ষণোপায় প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার-পরম্পরা জৈব সমস্যাটি উপস্থিত হইলেই আধান-পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়, অন্য সময়ে তাহাদের অস্তিত্বের কোনও পরিচয়ও পাওয়া যায় না। উপায়গুলি সর্ব্বদাই মূর্ত্তরূপে জৈবসমস্যার সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, এবং কেবলমাত্র জৈবসমস্যার নির্ব্বাহকরূপে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ইতর প্রাণীদের মধ্যেও এই বহির্বস্তুর প্রতিফলন ও তদনুরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ-পদ্ধতিটি যে জৈবসমস্যা ছাড়াও উপস্থিত হইতে পারে, তাহার একটা সূচনা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়; নানাবিধ গৃহপালিত জন্তুকে যে মনুষ্যোচিত নানারূপ কাজ শিখাইতে পারা যায়, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যেই আমরা সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধি ও জ্ঞানাত্মক একটি নূতন ভূমির বিকাশ দেখিতে পাই। এই বুদ্ধি-ভূমির স্থিতি ও

সন্ধারণ-ভিত্তিরূপে আমরা যে একটি বিশেষ আধান-পদ্ধতি দেখিতে পাই, তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলা সহজ নহে। ইহার চৈত্তিক বৃত্তিতে (psychoological function) বহির্জগতের নানাজাতীয় শক্তি ইন্দ্রিয়যন্ত্রের দ্বারা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিরূপে চিত্ত-ভূমিতে আসঞ্জিত হয়। সেইগুলি আবার চৈত্তিক বৃত্তির গ্রহণ, সন্ধারণ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্ত্যন্তরের দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হইয়া ও পরস্পর একীভূত হইয়া বিভিন্ন মূর্ত্ত বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ রাখিয়া যায়। প্রাথমিক দশায় এই বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ জীব-পুরুষের উপযোগিতাতেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ চৈত্তিক আধান-পদ্ধতিতে বিভিন্ন বস্তুগুলি ও তাহার ব্যাপারগুলির যে বিভিন্ন বিভিন্ন সম্বন্ধ সজ্ঘটিত হয়, তাহার তাৎপর্য্য থাকে জৈবপ্রয়োজন-সাধনের মধ্যে। কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের জগতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক যেমন জৈবপ্রয়োজনকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া হইয়া থাকে, মনুষ্যের মধ্যে তাহা হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া অনবরত নানা বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ আধান-পদ্ধতির ক্রিয়ায় সর্ব্বদা চিত্তের মধ্যে সংহিত হইতেছে, সেগুলি জৈব প্রয়োজনাপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। কাজেই, যতই বয়স বাড়িতে থাকে ততই এই জাতীয় নূতন উপলব্ধিগুলি একদিকে যেমন জ্ঞাতসারে হয়ত বা গৌণ জৈবপ্রয়োজনসিদ্ধির সহিত অন্বিত হইতে থাকে, হয়ত বা উপলব্ধিগুলির কোনওটিকে মুখ্য করিয়া অপরগুলি

তাহার সহিত গৌণভাবে জড়িত হইতে থাকে, তাহাদের কতক-গুলি আবার সম্বন্ধসংস্থানের মধ্যে স্থান না পাইয়া কিছুকালের জন্য ভাসিয়া থাকিয়া আবার চিত্তাভ্যন্তরে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতে থাকে; অপরদিকে তেমনি নানা রূপের, নানা শব্দের, নানা আকৃতির যে সমস্ত বিচিত্র সন্নিবেশচাতুর্য্য পৃথিবীর চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সেইগুলি চিত্তের অজ্ঞাতসারে চৈত্তিক আধান-পদ্ধতিতে তাহার গভীর সংস্কার রাখিয়া যায়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মূর্ত্ত বস্তুগুলি একদিকে জৈবপ্রয়োজনের সহিত অন্বিত হইয়া চিত্তের আধান-পদ্ধতির মধ্যে সংহিত হয়, আবার যেগুলি জৈবপ্রয়োজনের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে অন্বিত হয় না সেগুলিও হয়ত কোনও না কোনও রকমে গৌণভাবে অন্বিত হয়, কিংবা চিত্তের আধান-পদ্ধতি নিজের স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলির মধ্যে কোনওটিকে প্রধান করিয়া, অপরগুলিকে গৌণ করিয়া, তাহাদের পরস্পরের নিজের ভাবে একটা তাৎপর্য্য সৃষ্টি করিয়া, সেগুলিকে সঞ্চিত করিয়া রাখে। আবার আর একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, নানা প্রকারের রূপের খেলা চলিয়াছে, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, শৈল প্রভৃতির যে বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশের কারুকার্য্য, যে বিবিধ রেখায় বিচিত্র বিন্যাস-পরম্পরা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া চিত্তের আধান-পদ্ধতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, সে বস্তুগুলি ভুলিয়া গেলেও সেই বিন্যাস-বিশেষের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য আধান-পদ্ধতির মধ্যে তাহার গভীর

সংস্কার রাখিয়া যায়। আমরা কোনও একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিলে সে দৃশ্যটি আমাদের চিত্তপটে আঁকা থাকিতে পারে, এবং কল্পনার ছবিতে অন্য সময় সেটিকে মনের সম্মুখে আনিতে পারি। কিন্তু এমনও ঘটে যে, সেই দৃশ্যটির কথা আমাদের কিছুই মনে নাই, কিন্তু যে রেখা ও অবয়ব-বিশেষের সমানুবর্ত্তিতায় (symmetry) বা বিচিত্র রঙ্গের খেলায় দৃশ্যটিকে সুন্দর করিয়াছিল, তাহার একটা যৌথ-সংস্কার চিত্তের অজ্ঞাতে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এমনি করিয়া প্রকৃতির সমস্ত বস্তুরই সমানুবর্ত্তিতায় ও সুসমঞ্জসতায় যে একটি সম্বন্ধচক্র চারিদিকে রচিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সংস্কার সর্ব্বদাই আমাদের চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত ও আহিত হইতেছে। ইহা কোনও abstraction বা বিকল্পাত্মক বৃত্তি নহে, ইহা মূর্ত্ত না হইয়াও একরূপ মূর্ত্ত। অথচ কোনও বস্তু-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নাই বলিয়া ইহা ব্যাপক (universal)। চিত্তের আধান-পদ্ধতির সৌষমিক ব্যাপার (aesthetic activities) বলিয়া একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার বা বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা এই সংস্কারগুলির সহিত যখন তাহার অনুপাতী অন্য উপলব্ধির মিলন ঘটে, তখন ইহা সেগুলিকে পূর্ব্বসঞ্চিতগুলির সহিত সম্পর্কীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার ফলে আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠে। আবার এই বৃত্তির দ্বারাই অন্তর্নিগূঢ় এই সামঞ্জস্যের সংস্কারগুলিকে আবার নূতন নূতন রূপে, শব্দে, রঙ্গে, রেখায়, ঝঙ্কারে প্রকাশ করিতে পারে। চিত্তভূমির আধান-পদ্ধতির আর

একটি বিশেষ বৃত্তি এই যে, তাহার দ্বারা মূর্ত্ত বস্তুর বিবিধ ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, শব্দের সাহায্যে মনের সম্মুখে বিধৃত করিতে পারে, এবং সেই বিধৃত, বিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর মধ্যে নানা প্রকারের সম্বন্ধজাল সংরচিত হইতে পারে। এই বৃত্তিকে বিকল্পাত্মক বৃত্তি বা logical function বলা যাইতে পারে। চিত্তের অন্তর্নিহিত আধান-পদ্ধতি সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা জাতীয় ধর্ম্মের মধ্যে ও নানা জাতীয় ধর্ম্মীর মধ্যে নানা রূপ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে। এই সম্বন্ধ সংরচনের একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা আছে, তাহারই অনুসরণ করিয়া মানুষের চিন্তাপদ্ধতি নানাদিকে প্রধাবিত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

আবার এই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তভূমির মধ্যে অর্হবোধ বা value sense নামে একটা নূতন পর্য্যায়ের প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রকাশটি চৈত্তিক আধান-পদ্ধতির যেন দিব্যচক্ষু স্বরূপ। চৈত্তিক আধান-পদ্ধতি যে পরিমাণে জৈবপুরুষের প্রয়োজন সাধনে ব্যস্ত তাহার দৃষ্টিতে অর্হবোধ কোন্ কার্য্যটি জৈববৃত্তির অনুকূল হইল না, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বদাই যেন মানুষের সকল জৈববৃত্তিকে শাসন করিয়া চলিয়াছে, এবং সেই অনুসারে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত এই বোধের সৃষ্টি করিতেছে। আবার মানুষের চিত্ত জৈবপ্রয়োজনকে ছাড়িয়া তাহার নিজের মধ্যে যে অন্তবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া তোলে, কি পরিমাণে মানুষের কার্য্য তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল

হইল, এই অহংবোধই তাহার নূতন নূতন শাসনবাণী প্রচার করিয়া থাকে।

মানুষের চিত্তভূমির অন্তর্নিহিত আধান-পদ্ধতির যে সমস্ত বিবিধ প্রক্রিয়ার কথা বিবৃত করা গেল, সেইগুলি সংহত করিলে মানবীয় চিত্তভূমির নানা বিশিষ্টতার কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। মানুষের চিত্ত তাহার চিন্তা-পদ্ধতি, তাহার বিশ্লেষণ-শক্তি, তাহার অতীতগামী স্মৃতির দ্বারা জৈবসমস্যা উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই মানুষকে জৈবপ্রয়োজনের প্রতিকূল পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া অনুকূল পথে চালিত করিতে পারে, এই জন্য মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের পক্ষে জৈবপ্রয়োজন সাধন করা অনেক সুগম। প্রথম দশায় মানুষের চিন্তাশক্তি প্রায় সমস্তটাই জীবপুরুষের বশবর্ত্তিতায় নিয়োজিত হয়, কিন্তু মানুষের চিন্তার সামগ্রী, শক্তি ও বিষয় যতই বাড়িতে থাকে, ততই সেই চিন্তারাজ্যের মধ্যে জীবপুরুষের প্রয়োজনাতিক্তি নূতন সামঞ্জস্য ও ঐক্যের সংরচন-চক্র গঠিত হইয়া থাকে। সর্ব্বমানবের চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে একটা সাম্য থাকিলেও প্রত্যেক মানুষের চিন্তার গতি ও প্রকারের গৌণ-মুখ্য বিচারের নানাবিধ তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। সর্ব্বজীবের জীবন-পদ্ধতিতে একটা সাম্য থাকিলেও প্রত্যেক জীবের যেমন বহির্বস্তুকে স্বপ্রয়োজনের আনুবর্ত্তী করিবার একটা ভঙ্গী বা আধান-পদ্ধতি আছে, প্রত্যেক মানুষেরও তেমনি বহির্বস্তুকে ও তাহাদের বিবিধ ধর্ম্মনিচয়কে নিজের চিত্তভূমির

অন্তরঙ্গ করিবার একটা বিশেষ আধান-পদ্ধতি আছে। এই আধান-পদ্ধতির বিভিন্নতাতেই মত, চিন্তা, বাসনা প্রভৃতির এত বৈষম্য। জীবপুরুষের বেলায় যেমন তাহার জৈব আধান-পদ্ধতির অনুকূলতায় ও প্রতিকূলতায় সুখদুঃখের উদ্ভব, বৌদ্ধপুরুষেরও ( intellectual personality ) তেমনই তাহার চিন্তার আধান-পদ্ধতির অনুকূলতায় ও প্রতিকূলতায় সুখদুঃখের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ পুরুষের এই আধান-পদ্ধতিকে সেই জন্য তাহার ধাতুপুরুষ ( structural personaity ) বলা যাইতে পারে। এই ধাতু পুরুষকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই নানা ব্যাপারের ফলে যে নানাবিধ জ্ঞান, চিন্তা, উপলব্ধি, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বিচিত্র চিন্ময় পদার্থ (conscious state) প্রমুষ্টতত্ত্বাক স্মৃতি সংস্কার ও সুপ্ত সংস্কার সঞ্চিত ও পিণ্ডীভূত হইয়া থাকে, সেই যৌথ ঐক্যটিকে অনুভূতিপুরুষ বলা যাইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, জৈবপুরুষের উপর অবলম্বন করিয়া যে ধাতুপুরুষটি গড়িয়া উঠে, তাহারই ভিত্তিতে অনুভূতি পুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষরূপে সমগ্র মানুষের চিত্তটি গড়িয়া উঠে। জৈবপুরুষের আধান-পদ্ধতিটি যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ধাতুপুরুষের আধান-পদ্ধতিটি ও তেমনি অনুভূতিপুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষের ব্যাপকতার সহিত ক্রমপরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এবং এই জন্য সে ধাতুপুরুষের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া আপন অহংবোধের অনুকূলতায় আপনাকে

প্রবর্ত্তিত করে। অহং বোধও তেমনি প্রথম দশায় জৈবপুরুষের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত থাকে, কিন্তু অনুভূতিপুরুষ ও বৌদ্ধ পুরুষের ব্যাপ্তির ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বৌদ্ধপুরুষের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে আপনাকে প্রবর্ত্তিত করে। জৈবপুরুষের মধ্যে যেমন একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে, বৌদ্ধপুরুষের মধ্যে সেরূপ ঐক্য নাই কিন্তু ঐক্যের প্রচেষ্টা আছে। বৌদ্ধপুরুষের মধ্যে নানা বৃত্তির নানা দাবী এক সময়ে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রবল ও দুর্ব্বল হইয়া উঠে। সেই প্রবল-দুর্ব্বল বৃত্তিনিচয়ের পরস্পর যে পরিমাণ সামঞ্জস্য সঙ্ঘটিত হইতে পারে, সেই পরিমাণেই বৌদ্ধপুরুষ জৈবপুরুষ হইতে মুক্তিলাভ করে। বৌদ্ধপুরুষের প্রক্রিয়া যে পর্য্যন্ত না ধাতুপুরুষকে পরিবর্ত্তিত করে, সে পর্য্যন্ত এই ঐক্য-সমাধানের চেষ্টা বৃথা। সেই জন্য সমস্ত সাধন-পদ্ধতিরই চরম চেষ্টা এই বৌদ্ধপুরুষের ঐক্য সম্পাদনের অনুকূলে পরিবর্ত্তিত করা। বৌদ্ধপুরুষের সমস্ত গূঢ় রহস্যই প্রায় এই ধাতুপুরুষের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতির যে গতিতে জড় হইতে জীব হইয়াছে এবং জীব হইতে বৌদ্ধপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার চরম আদর্শ বৌদ্ধপুরুষের বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করা। সেইজন্য বৌদ্ধপুরুষের বিস্তারের দ্বারা ধাতু-পুরুষকে স্পর্শ করাই আমাদের লক্ষ্য।

"ইহ চেদবেদীঽ অথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।"

# বেদ ও বেদান্ত

বৈদিক সাহিত্য চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতার মধ্যে ঋক্ ও অথর্ব্ব এই দুইটিই মৌলিক। যজুঃ (সূক্তাংশ) ও সাম এই দুই বেদ প্রধানতঃ ঋগ্‌বেদ হইতেই সংগৃহীত। এই বেদ সাহিত্যের শেষ অংশ উপনিষদ, সেই জন্য উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা হয়, ঋগ্‌বেদের ও অথর্ব্ববেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্ত গুলির সহিত উপনিষদের তত্ত্ববিদ্যার সাদৃশ্য আছে। এবং অনেক সময় এইরূপই মনে হয় যে, যে প্রেরণায় ঋগ্বেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্তগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রেরণাতেই উপনিষদের তত্ত্বালোচনারও উদ্বোধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে লিখিত আছে, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌……পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ,… তাঁহার এক অংশ অমৃত লোকে বিরাজ করে। এই পুরুষ হইতেই সমস্ত জড় ও জীবলোক উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের দশম মণ্ডলের সপ্তমসূক্তে ও অষ্টমসূক্তে যে স্কম্ভ ও ব্রহ্মের বর্ণনা দেখা যায় তাহাতেও লিখিত আছে, যে স্কম্ভের বিরাট দেহের মধ্যেই এই বিশ্বভুবন নিহিত রহিয়াছে, শুধু বিশ্বভুবন নহে, তপঃ শ্রদ্ধা এবং কাল ও তাঁহার মধ্যেই নিহিত আছে।

"কস্মিন্নঙ্গে তপোঽস্যাধিতিষ্ঠতি,
কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতং
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাঽস্য তিষ্ঠতি,
কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্
কস্মাদঙ্গাৎ দীপ্যতেঽগ্নিরস্য,
কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা
কস্মাদঙ্গাৎ বিমিমীতেঽধি চন্দ্রমাঃ
মহঃ স্কম্ভস্য মিমানোঽঙ্গম্
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি অন্তরিক্ষম্
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি আহিতা দ্যৌঃ
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি উত্তরং দিবঃ"

ইহার কোন অঙ্গে ঋত, শ্রদ্ধা, ব্রত ও সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহার কোন অঙ্গে অগ্নি দীপ্তি লাভ করিতেছে, বায়ু বহন করিতেছে, চন্দ্রমা আলোক বিতরণ করিতেছে। পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গলোক ও স্বর্গোত্তরলোক ইহার কোন্ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ সূক্তেরই ৩৭ মন্ত্রে লিখিত আছে।

"কথং বাতো নেলয়তি
কথং ন রমতে মনঃ
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী
নেলয়ন্তি কদাচন

মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসিক্রান্তং
সলিলস্য পৃষ্ঠে
তস্মিন্ শ্রয়ন্তে যে উ কেচদেবাঃ
বৃক্ষস্য স্কন্ধঃপরিত ইব শাখাঃ"।

বায়ু কিহেতু সদাই বহমান, আমাদের মন কেন সদাই চঞ্চল, সত্যের অন্বেষণে যে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহার বিশ্রাম নাই কেন? ঐ যে মহা যক্ষ সলিলের মধ্যে আপন তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছে ; শাখা যেমন বৃক্ষতে সম্বন্ধ থাকে তেমনি সমস্ত দেবতারা তাঁহাতে সম্বন্ধ রহিয়াছেন ।

"অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্মনা।
সর্ব্বানি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ"। তিনি অন্ধকার দূর করিয়াছেন, তিনি পাপ নির্ম্মুক্ত এবং যে তিনটি জ্যোতিঃ প্রজাপতির মধ্যে রহিয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহার মধ্যেই নিহিত আছে। অথর্ব্ববেদের দশমমণ্ডলের অষ্টমসূক্তে দেখিতে পাই—

"যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং
যশ্চাধিতিষ্ঠতি
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায়
ব্রহ্মণে নমঃ।
যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণদঃ
প্রাণৎ নিমিষচ্চ যদ্ভুবৎ

তদ্দধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং
তৎসম্ভূয় ভবত্যেকমেব।
অনন্তং বিততং পুরুত্রা অনন্তং
অন্তবচ্চ আ সমন্তে…
যতঃ সূর্য্য উদেতি অস্তং যত্রচ গচ্ছতি
তদেব মন্যেঽহং জ্যেষ্ঠং তদুনাত্যেতি কিঞ্চন…
পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতং
তস্মিন্ যদ্ যক্ষং আত্মন্বং তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ
অকামো ধীরোঽমৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানং।"

যিনি অতীত অনাগত ও বিশ্বভুবনকে অধিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন, এবং স্বর্লোক কেবল যাঁহারই আয়ত্তীভূত, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। যাহা কিছু জঙ্গম, উৎপতনশীল, স্থাবর, যাহা কিছু প্রাণবান্ ও প্রাণহীন, যাহা এই বিশ্বরূপ পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে, তাহা সমস্ত তাঁহার মধ্যে একীভূত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্ববিসারি যাহা কিছু অনন্ত, যাহা কিছু সান্ত, সমস্তই তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যে স্থান হইতে সূর্য্য উদিত হয় ও যেখানে অস্ত যায় তিনিই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ত্রিগুণের দ্বারা আবৃত নবদ্বার পুণ্ডরীকের

মধ্যে ব্রহ্মবিদেরা তাঁহার সন্ধান পান। সেই অকাম, অমৃত, ধীর, আত্মরসপরিতৃপ্ত, স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ, অজর, চিরতরুণ আত্মাকে জানিলে মৃত্যুর ভয় থাকে না। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়—

"ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্রে আসীৎ, তদ্দেবানসৃজত, তদ্দেবান্ সৃষ্ট্বা এষু লোকেষু ব্যারোহয়ৎ, অস্মিন্নেব লোকে অগ্নিং বায়ুং অন্তরীক্ষে দিবি এব সূর্য্যম্…অথ ব্রহ্মএব পরার্দ্ধমগচ্ছৎ, তৎপরার্দ্ধং গত্বা ঐক্ষত কথং ন্বু ইমান্ লোকান্ প্রত্যাবেয়াম্ ইতি। তদ্দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈৎ রূপেন চৈব নাম্না চ সঃ। যস্য কস্য চ নাম অস্তি তন্নাম। যস্য অপি নাম নাস্তি যদ্বেদ রূপেণ, "ইদংরূপম্" ইতি তদ্রূপং চৈব নাম চ। তে হ এতে ব্রহ্মণো মহতী অভ্বে।…বেদ মহদ্ হ এব অভ্বং ভবতি।…স যোহ এতে মহতী যক্ষে বেদ মহদ্ হ এব যক্ষং ভবতি। তয়োরন্যতরজ্জ্যায়োরূপমেব। যদ্ হ্যপি নাম রূপমেব তৎ। স যোহেতয়োর্জ্যায়ো বেদ জ্যায়ান্ হ তস্মাদ্ভবতি। যস্মাজ্জ্যায়ান্ বুভূষতি "মনো বৈ রূপং মনসা হি বেদ" ইদংরূপম্ ইতি তেন রূপমাপ্নোতি অথ যং বাচ আথারয়তি বাগ্ বৈনাম, বাচা হিনাম গৃহ্ণাতি। এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্রূপং চৈব নাম চ। তৎসর্ব্বমাপ্নোতি। সর্ব্বং বৈ অক্ষয্যম্।"

প্রথম কেবল ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিবেশিত করিলেন, পৃথিবীতে অগ্নিকে বসাইলেন। অন্তরীক্ষে বসাইলেন বায়ুকে, এবং সূর্য্যকে

বসাইলেন দ্যুলোকে। সত্যলোকে আরোহণ করিয়া ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন, কি উপায়ে আমি বিশ্বলোক ব্যাপ্ত করিতে পারি, নামে এবং রূপে। যাহা কিছুর নাম আছে তাহাকেই বলি নাম, যাহা কিছুর নাম নাই, অথচ যাহাকে রূপের দ্বারা জানা যায়, "ইহা এইরূপ" তাহাকেই বলি রূপ। এই উভয় লইয়াই নাম এবং রূপ। এই উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। এই উভয় রূপকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মের মহা ব্যাপ্তিকে প্রাপ্ত হন। এই দুইটিই ব্রহ্মের বৃহৎ প্রকাশ। যিনি এই দুইকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মের বৃহৎ প্রকাশের সমতা প্রাপ্ত হয়েন। নাম এবং রূপের মধ্যে রূপই বড়। যাহা কিছুর নাম আছে তাহা রূপই। এই বৃহৎ স্বরূপ রূপকে যিনি জানেন, তিনি যাহা হইতে বড় হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইতেও বড় হন।...মনের দ্বারা "এই রূপ" এইভাবে রূপকে আমরা জানি, সেই জন্য মনকে বলি রূপ। বাক্যের দ্বারা যাহাকে আহরণ করি, তাহাকে বলি নাম। যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই নাম এবং রূপ। ব্রহ্ম আপনাকে নাম রূপের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। সেই জন্য এই নামরূপাত্মক সমস্তই অক্ষয়। এই অক্ষয়রূপে যিনি নাম রূপকে জানেন তাঁহার সুকৃত অক্ষয় এবং অক্ষয় লোকে তাঁহার প্রতিষ্ঠা।

বাজসনেয়ী সংহিতায় ৩১।১৯ লিখিত আছে—

"প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো
বহুধা বিজায়তে।

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্

হ তস্থূর্ভু বনানি বিশ্বাঃ"।

প্রজাপতি গর্ভের মধ্যে ভ্রমণ করেন, অজাত হইয়া ও তিনি বহুবিধ প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহার মধ্যে বিশ্বভুবন নিহিত রহিয়াছে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই কারণপুরুষকে প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন।

এই প্রবন্ধে বেদ উপনিষদাদির যে সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার যথাশ্রুত তাৎপর্য্যানুবাদমাত্র দেওয়া হইয়াছে। কোনও বিশেষ মতে অর্থ দেওয়া হয় নাই আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি প্রয়াস করা হয় নাই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে দেখা যায়—

"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ

পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায়

হবিষা বিধেম।

য আত্মদাঃ বলদাঃ যস্য বিশ্বে উপাসতে

প্রশিষম্ যস্যদেবাঃ।

যস্য চ্ছায়া অমৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়

হবিষা বিধেম।

য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা একঃ

ইদ্ রাজা জগতোবভূব।

য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম।...
যেন দ্যৌ রুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃস্তভিতং
যেন নাকঃ।
সোহন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম।
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যাঃ যো বা
দিবং সত্যধর্ম্মা জজানা।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজানা কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম।"

প্রথম হিরণ্য গর্ভই উত্থিত হইয়াছিলেন তিনি জন্মমাত্রই দেখিলেন তিনি সমস্ত পৃথিবীরই ঈশ্বর। তিনি পৃথিবী ও দ্যুলোক যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কোন্ দেবতাকে আমরা যজ্ঞের দ্বারা পরিতুষ্ট করিব। যিনি আত্মাকে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, যাঁহার নির্দেশ দেবতারা পালন করেন মৃত্যু ও অমৃত যাঁহার ছায়া, কোন দেবতাকে ইত্যাদি......। যিনি আপন বীর্য্যের দ্বারা সমস্ত প্রাণলোকের সমস্ত দ্বিপদের ও চতুষ্পদের প্রভুরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন, কোন দেবতাকে ইত্যাদি.....। যিনি আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছেন, পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, স্বর্গলোককে স্তব্ধ রাখিয়াছেন, বায়ুমণ্ডলকে স্ববশে রাখিয়াছেন, কোন্ দেবতাকে ইত্যাদি...।

যিনি পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন, আপন স্থির নিয়মবর্গের দ্বারা তাহাকে শাসন করিতেছেন, যিনি স্বর্গলোকের জনক, যিনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃহৎ জলরাশিকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে আঘাত না করেন, কোন্ দেবতাকে ইত্যাদি...···।

আবার ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের

৮২ সূক্তে ৩য় মন্ত্রে

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা
যো দেবানাং নামধাঃ এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি অন্যা
পরো দিবা পরঃ এনা পৃথিব্যা
পরো দেবেভিরসুরৈ র্যদস্তি···
ন তং বিদাথ যঃ ইমা জজান
অন্যদ্ যুষ্মাকং অন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতাঃ জল্প্যাচ
অসুতৃপঃ উকৃথশাসশ্চরন্তি"।

যে বিশ্বকর্ম্মা আমাদিগের পিতা, জনিতা ও বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনকে ও বিশ্ব চরাচরকে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, যিনি দেবদিগের নামকরণ করিয়াছেন, সংশয় ভঞ্জনের জন্য যিনি সকলের শরণ্য, যিনি দ্যুলোকের, পৃথিবী লোকের, অসুর লোকের, ও দেবলোকের পরপারে অবস্থিত, যিনি এই সকলকে উৎপন্ন করিয়া-

ছেন, তাহাকে তোমরা জানিতে পার না, তিনি অন্য রূপে তোমাদের মধ্যে অবস্থিত। যাহারা কেবল বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফেরে, এবং বৃথা বাগ্‌জল্পনায় আপন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না সেই মন্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণেরা কুজঝ্‌টিকায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

বেদ ও ব্রাহ্মণের এই সমস্ত মন্ত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই সমস্ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে প্রাণী ও অপ্রাণী লইয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র লইয়া, সরিৎ সাগর হিমাচল লইয়া, স্বর্গলোক অন্তরীক্ষ পৃথিবী লইয়া, এই যে বিশ্বভুবন রহিয়াছে, ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের সমস্ত শক্তিই তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মে বিশ্ব সংসার প্রবর্ত্তিত হইতেছে, মৃত্যু ও অমৃত তাঁহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বভুবন রূপে তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু বাহিরের জগতের দিক্ দিয়া নহে আমাদের অন্তর্জগতের আমাদের মনোরাজ্যের, সমস্ত মননক্রিয়া, সমস্ত প্রাণস্পন্দন তাঁহারই প্রভাবে, তাঁহারই লীলায় সম্পন্ন হইতেছে; তিনিই আমাদের চক্ষুর পিতা "চক্ষুষঃ পিতা"। তিনি আমাদের মনের প্রেরক; তিনি আপনাকে নাম রূপের মধ্য দিয়া, বাক্য ও বস্তুর মধ্য দিয়া প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি বহির্জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন; অপর দিকে তেমনি আমাদের অন্তরের মধ্যে আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।

বাহিরের জগতে বহিরঙ্গ উপায়ে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া যখন আমরা হতাশ হই, তখন ফিরিয়া দেখি, তিনি আপন মহিমায় আমাদের অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহাকে জগতের অখণ্ড কারণরূপে এবং জগতের সমস্ত শক্তির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠারূপে আমরা বুঝিতে পারি, অপরদিকে তেমনি তাঁহাকে আমরা আমাদের পিতা, জনিতা ও বিধাতারূপে আমাদের পরম মঙ্গলের আস্পদরূপে, আমাদের গুরুরূপে, আমাদের সমস্ত অর্চ্চনার মধ্য দিয়া তাঁহার সন্নিকৃষ্ট হইতে পারি। এই বিশ্বভুবনের মধ্যে তিনি আপনাকে নিঃশেষে সমাপ্ত করিয়া দেন নাই, এই বিশ্বভুবন এই আকাশ বাতাস অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য তাঁহারই অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপের একপাদ মাত্র এই জগৎ রূপে এই শক্তিচক্রের সংস্থানরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতময় লোকে বিরাজ করিতেছে। বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াও তিনি অব্যাপ্ত; তিনি সকলের পরপারে, প্রাণের কারণ হইয়াও তিনি প্রাণকে অতিক্রম করিয়াছেন। মূর্ত্তির কারণ হইয়াও তিনি মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন, রূপের কারণ হইয়াও রূপকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং নামের কারণ হইয়াও নামকে অতিক্রম করিয়াছেন। কেবল বেদমন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার স্বরূপের যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক।

উপনিষদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলে আমরা দেখিতে পাই

যে এই যে ভাবধারা বেদ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, তাহাই উপনিষদের মধ্যে বিশেষভাবে স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। কেনোপনিষদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ, কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃশ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ··· ন তত্রচক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদ্ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি······ যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে।"

কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া আমাদের মন চালিত হয়, কাহার দ্বারা আমাদের প্রাণ প্রেরিত হয়, আমাদের বাক্য কথা কহে, আমাদের চক্ষু ও শোত্রকে কোন্ দেবতা স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, তাহাকে আমরা জানি না, জানিতে পারি না। তাহার কথা আমরা কি করিয়া বলিব। তিনি জানা ও অজানার বাহিরে। চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে আর যাহা কিছু উপাসনা কর তাহা ব্রহ্ম নহে।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"।

(কেন ২।১১)

যিনি মনে করেন, তাঁহাকে জানিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে জানেন নাই, তাঁহাকে জানা যায় না, এই জানাই তাঁহাকে জানা। ইহার পরেই দেখা যায়, যে ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা জয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অভিমানবশতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিজেরই সামর্থ্যে তাঁহারা পৃথিবীতে প্রভাবশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট যখন ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন, তখন দেবতারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অগ্নি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, তোমার কি শক্তি, অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি, আমি সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিয়া বলিলেন, এই তৃণটিকে দগ্ধ কর ত, কেমন তোমার সামর্থ্য! অগ্নি সমস্ত শক্তিতেও তৃণটিকে দহন করিতে পারিলেন না। বায়ু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি বায়ু, আমি সমস্ত পৃথিবী উড়াইয়া দিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিয়া বলিলেন, ইহাকে উড়াও দেখি, কেমন তোমার সামর্থ্য; সমস্ত চেষ্টাতেও বায়ু তাহা উড়াইতে পারিলেন না। অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তির দ্বারাই জগতের সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি শক্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মের প্রভাবেই তাঁহাদের প্রভাব।

"ওঁ ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমং সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।"

ব্রহ্মই পৃথিবীর কর্ত্তা, তিনিই পৃথিবীর পালয়িতা।

"যত্তদদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রং,
যদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্,
তদব্যয়ং তদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

ব্রহ্মকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না। তিনি পাণিপাদ রহিত, নিত্য, সূক্ষ্মতম, সর্ব্বগত ও বিভু; তিনি অব্যয় ও সকলের কারণভূত। ঊর্ণণাভ যেমন আপনার মধ্য হইতে তাহার জাল বাহির করিয়া আনে এবং আপনার মধ্যেই সংহরণ করে, পুরুষের আপন শরীরের মধ্য হইতে যেমন কেশ ও লোম উৎপন্ন হয়, তেমনি সেই পরম অক্ষর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যা ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।"

• সেই ব্রহ্মের জ্ঞানময় তপস্যার দ্বারাই নামরূপ ও অন্নময় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায়—এই জগৎ সত্য, এবং ইহার উৎপত্তিও সত্য, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার স্বরূপভূত সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসে, তেমনই সেই অক্ষর হইতে বিবিধ বস্তুজাত উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

"তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাৎ সহস্রশঃ

প্রভবন্তি স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।”

“স তপোহতপ্যত। সন্তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।… নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে।” (তৈত্তিরীয়—২।৬)

তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজের তপের দ্বারা এই যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই তাহা সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সত্য ও মিথ্যা, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান, উক্ত অনুক্ত সমস্তই সত্য, সমস্তই তাঁহার আত্ম প্রকাশ, এবং যাহা কিছু আমরা আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই, উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা সমস্তই সত্য। তাঁহারই ভয়ে বায়ু বহন করে, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নি ও ইন্দ্র আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে ও মৃত্যু বিচরণ করে।

“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।”

ঐতরেয় উপনিষদে প্রশ্ন উঠিল যে, আমাদের আত্মা কি? কাহার দ্বারা আমরা দর্শন করি শ্রবণ করি, ঘ্রাণ করি, কথা বলি, এবং আস্বাদ করি, কাহাকে আমরা উপাসনা করি। উত্তর হইল—হৃদয়, মন, বিজ্ঞান মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, জীবন, কামনা, এই সমস্তই আত্মা। এই আত্মাই ব্রহ্ম।

ইনি ইন্দ্র, প্রজাপতি, এবং সমস্ত দেবতা, পঞ্চ মহাভূত, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ। ইনিই সমস্ত বীজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, যাহা কিছু প্রাণিজাত, যাহা কিছু জঙ্গম, যাহা উড্ডয়নশীল, যাহা কিছু স্থাবর, তাহা সমস্তই তিনি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে—যেমন মধুকরেরা নানা পুষ্পের রস আহরণ করিয়া আপন মধুচক্রের মধ্যে এক করিয়া লয়, এবং সেই একত্বের মধ্যে মিলিত হইলে যেমন তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায় না, তেমনি যাহা কিছু সংসারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যখন ব্রহ্মাকারে লীন থাকে তখন তাহাদিগকে তাহাদের পৃথক স্বরূপে কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না। যেমন সমস্ত নদী সাগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদের পৃথক্ পৃথক সত্তাকে পৃথক্‌ভাবে জানা যায় না, তেমন ব্রহ্মের মধ্যে লীন হইলে যাহা কিছু বিভক্ত, যাহা কিছু পৃথক, তাঁহার মধ্যে অবিভক্তরূপে অপৃথক্‌স্বরূপে বিরাজ করে। যেমন একটি বটের বীজের মধ্যে সমস্ত বটবৃক্ষটি অবিভক্তভাবে সূক্ষ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে তেমনি পরমসূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে এই জগৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে, সেই জন্যই এই সমস্ত জগৎ আত্মারই স্বরূপ। যেমন লবণ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে লবণকে সেই জলের মধ্য হইতে পৃথক্ করিয়া আনা যায় না তেমনি ব্রহ্মের মধ্যে, সমস্ত জগৎ অবিভক্তভাবে ঐকাত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছে, সমস্ত জগতের সত্তা ব্রহ্মসত্তার মধ্যে পৃথক্ অপৃথক্ স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

ছান্দোগ্যে আরও লিখিত আছে, যে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, কারণ মৃণ্ময় বস্তুগুলি কেবল মাত্র মৃত্তিকার বিকার, এবং এই বিবিধ বিকারগুলি নানা নামে অভিহিত হয়, তাহাদের মধ্যে মৃত্তিকা এইটুকুই যথার্থ সত্য। "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" ইহার অর্থ ইহা নহে, যে মৃত্তিকাই সত্য, আর সমস্ত মিথ্যা। কারণ বিকারাকারে যে মৃৎপিণ্ডকে আমরা দেখি তাহা মৃৎপিণ্ডেরই আকার, মৃত্তিকার পিণ্ডাকার ও যেমন একটি আকার, তাহার ঘটাকারও তেমনি একটি আকার। এই মৃত্তিকা নিজেকে কখন পিণ্ডাকারে কখন ঘটাকারে প্রকাশিত করিতেছে, এবং ঘটাকার মৃত্তিকাকে যখন মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না এবং ঘটাকার যখন মৃত্তিকারই একটি আকার তখন মৃত্তিকার স্বরূপ পরিণাম হিসাবে ঘটকেও সত্যই বলিতে হয়। ঘট মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই নহে, ঘটশরাবাদি বিভিন্ন আকার মৃত্তিকার মধ্যেই লীন ও বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সমস্ত আকারের মধ্যেই অনুগত রহিয়াছে বলিয়া সেই আকার অপেক্ষায় মৃত্তিকাকে অধিকতর ব্যাপক বলিয়া অধিকতর সত্য, বা বৃহত্তম বা জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম বলিয়া মানা যাইতে পারে। কিন্তু আকারগুলিকে যখন কোনক্রমেই স্বতন্ত্ররূপে পাওয়া যায় না, তখন মৃত্তিকার পুরস্কারে মৃত্তিকা যেমন আকারকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে,

আকারত্ব পুরস্কারে আকারও তেমনি মৃত্তিকাকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, সেই জন্য কোন একটি আকার অপেক্ষা মৃত্তিকাকে অধিকতর ব্যাপক বলিয়া মানা গেলেও আকারত্ব-সামান্য অপেক্ষা মৃত্তিকাত্ব-সামান্যের অধিকতর ব্যাপকতা নাই। এইজন্য উপনিষদের এই বাক্যটিকে জগন্মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়—

"দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ", ব্রহ্মের দুই রূপ, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য এবং অমৃত। আকারের মধ্যেও ব্রহ্ম যেমন সত্য নিরাকারের মধ্যেও তিনি তেমন সত্য। বৃহদারণ্যকে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, আত্মার মধ্যে যিনি ব্রহ্মের সন্ধান পান নাই, তিনি ব্রহ্ম হইতে দূরে গিয়াছেন। দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণার মধ্যে যেমন তাঁহাদের সমস্ত শব্দ গৃহীত রহিয়াছে, তেমনই বিশ্বভুবন সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রহ্ম স্বভাবের মধ্যে যখন সমস্ত জগৎকে একীভূতভাবে বিধৃতরূপে দেখিতে পাই, তখন সমস্ত দ্বৈতরূপ, জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় ভাব যেন অপসারিত হয়। যেখানে উপনিষদে লিখিত আছে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" অর্থাৎ যে এই পৃথিবীর বস্তুজাতকে কেবল তাহাদের পৃথক স্বরূপে দেখিয়া থাকে, সে গহনতম মৃত্যুর আশ্রয় করে। কিম্বা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ পৃথক্ স্বরূপে কিছুই নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে

কেবলমাত্র পৃথক্‌রূপে বা নানারূপে দেখিলে পৃথিবীকে তাহার ক্ষয়ের রূপে মৃত্যুর রূপেই দেখা যায়। সমস্ত নানাত্বের মধ্য দিয়া যে এক ব্রহ্ম অন্বিত রহিয়াছেন, এই দৃষ্টিতে দেখিলে নানাত্বের সত্যস্বরূপে নানাত্বকে দেখা হয়। রূপ হইতে রূপান্তরে, নিয়ত যে পরিবর্ত্তন, তাহাই রূপের ধ্বংসের রূপ। তাই কেবলমাত্র পৃথক রূপে অপর হইতে বিচ্ছিন্নরূপে সংসারে কিছুই নাই। জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, ও তাঁহার স্বরূপের মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া অবিভক্তভাবে রহিয়াছে। সেই জন্য কেবল পৃথক্‌রূপে দেখিলে তাহাদের যথার্থস্বরূপ দেখা যায় না। কিন্তু সে জন্য একথা বলা চলে না যে যে, পৃথক্‌রূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, যাহার শক্তি ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ও ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মের মধ্যে যাহা বিধৃত, তাহা মিথ্যা।

শ্বেতাশ্বতর অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনো উপনিষদে শঙ্করাচার্য্যের মায়ার কোনো উল্লেখ দেখা যায় না, বৃহদারণ্যকে যেখানে লিখিত আছে,—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" যেখানে তাহা দ্বারা জগতের মায়াময়ত্ব বা মিথ্যাত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। শ্বেতাশ্বতরে মায়ার কথা যে উল্লেখ আছে,—তাহাকে একস্থলে প্রকৃতিরই নামান্তর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ", যেখানে শ্বেতাশ্বতরে "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" এই প্রয়োগটির উল্লেখ দেখা যায়,

সেখানে মায়াশব্দ মোহার্থক বলিয়া মনে করাও যাইতে পারে।

তাঁহা হইতেই প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অগ্নি তাঁহার মূৰ্দ্ধা, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার কর্ণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদযুগল। অথচ তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তাঁহা হইতেই দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, শস্য, তৃণ প্রাণ, অপান, তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি, সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহা হইতেই গিরি সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহা হইতেই নদীর নানা ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হইতেই সমস্ত ওষধিরা উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি এই বিশ্ব, কর্ম্ম এবং তপস্যা, অথচ তিনি সকলের অন্তরাত্মা, সমস্ত বহির্জগতকে ব্যাপ্ত করিয়াও সমস্ত অন্তর্জগতকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তিনি যে প্রাণকে প্রেরণ করিয়াও অপ্রাণ, মনকে প্রেরণ করিয়াছেন অমনাঃ, পর হইতে পর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, এই পরম গুহ্যতম সত্যকে যিনি জানেন তিনি অবিদ্যা গ্রন্থিকে ভিন্ন করিতে পারেন।

"এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য" তিনি জ্যোতিষ্মান, তিনি অণু হইতে অণু এবং তাঁহাতেই এই সমস্ত ভুবন ও ভুবনবাসী চরাচর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই জন্যই এই জগৎ সৎ, এবং যিনি অনৃত স্বরূপ, যাঁহাতে দ্যৌঃ

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ, আমাদের সমস্ত প্রাণ মন, ওতঃপ্রোত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই একমাত্র মৃত্যু ও অমৃতের মধ্যে সেতু। অন্য সমস্ত বর্জ্জন করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই জানিতে চেষ্টা কর। সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎ, তারা, অগ্নি কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহার দীপ্তিতেই ইহারা দীপ্তিমান্ হইয়া রহিয়াছে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও উত্তরে অধোদেশে ও ঊর্দ্ধদেশে মৃত্যুহীন এই যে বিশ্ব রহিয়াছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।"

কেনোপনিষদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, যে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, জৈবশক্তি ও মন যেমন একদিকে ব্রহ্মেরই শক্তিতে প্রভাবান্বিত হইয়া আপন আপন সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি বহির্জগতের সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিও তাঁহারই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আপন আপন প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মুণ্ডকে দেখিতে পাই যে, সত্যস্বরূপ এই জগৎ, সত্য স্বরূপ সেই ব্রহ্ম হইতে উর্ণনাভের তন্তুর ন্যায়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, পুরুষের কেশ লোমের ন্যায়, উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হইয়া

রহিয়াছে। মুণ্ডকে এই ভাবধারাটিই আর একভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, বহির্জগতে যাহা কিছু আমরা দেখি ও অন্তর্জগতে যাহা কিছু আমরা উপলব্ধি করি, যাহা কিছু গরিষ্ঠ, জড়, জীব, প্রাণী, দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে, অধস্তলে চিন্তায় মননে যাহা কিছু পাই, সমস্তই ব্রহ্মের আত্মস্বরূপের অমৃতময় প্রকাশ। আর এই বিশ্বভুবনে যিনি আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন তিনিই আমাদের অন্তর্লোকের অন্তরাত্মা রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সমস্ত জগতের যেখানে যাহা কিছু গতি দেখি, শক্তি দেখি, দীপ্তি দেখি সমস্তই তাহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি একদিকে যেমন বৃহৎ, অপর দিকে তেমনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। তিনি যেমন অতিদূরে তেমনি আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে অতি নিকটে "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং, সূক্ষ্মাৎচৈতৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়—

"সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।" তবেই দেখা যাইতেছে, যে ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যে ভাবধারাটি প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, প্রৌঢ়ি-বাদকে আশ্রয় না করিলে, তাহা দ্বারা কোন ক্রমেই জগন্মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। গীতার মধ্যে যে সমস্ত স্থলে মায়া শব্দের উল্লেখ দেখা যায় যেমন "মম মায়া দুরত্যয়া" (গীতা ৭।১৪) "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"

( গীতা ১৮।৬১ ) সেখানে মায়াকে ভগবানের শক্তিরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার যেখানে "মায়াপহৃতজ্ঞানা" ( গীতা ৭।১৫ ) বলিয়া বলা হইয়াছে, সেখানে মায়াশব্দ মোহার্থক বলিয়া বলা যাইতে পারে। ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভাস্কর, যামুন, রামানুজ, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু বল্লভ ও বলদেব প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের সমস্ত ব্যাখ্যাতারাই মোটামুটিভাবে এই একই মত পোষণ করিয়াছেন, যে জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তাঁহা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। দুগ্ধে যেমন জল অবিভক্তভাবে মিশ্রিত হয়, অঙ্গী যেমন অঙ্গের সহিত অবিভক্তভাবে থাকে, সমুদ্র যেমন বীচিতরঙ্গের মধ্যে আপনাকে ঢেউ খেলাইয়া যায়, ব্রহ্ম ও তেমনি জগতের মধ্যে আপনাকে পৃথক্ অপৃথক্‌রূপে ভিন্নাভিন্নরূপে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত রূপে প্রকট করিয়াছেন। এই তথ্যটি সমস্ত পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্য দিয়া নানা আখ্যানে ব্যাখ্যানে প্রচারিত হইয়াছে। জগদাকারে এক দিকে যেমন আমরা ব্রহ্মকে দেখিতে পাই, অপরদিকে তিনি তেমনি জগৎকে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছেন। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"। কোন স্থানে হয়'ত কোনও প্রকরণের অনুরোধে ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অবাঙ্‌মনসাগোচর চিৎস্বরূপ তত্ত্বকে পরম সত্য বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। আবার কোনও স্থলে বা তিনি যে জগদাকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন এইদিক্‌টিই প্রধান ভাবে দেখান

হইয়াছে। আবার কোন সময় হয়ত জগৎকে সৃষ্টি ও পালন করেন বলিয়া জনিতা, পাতা, বন্ধু, সখা, প্রেমাস্পদরূপে তাঁহাকে ধ্যানরসের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। আবার কোনও স্থলে হয়'ত তাঁহার কূটস্থ স্বরূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম-সূত্র ব্যাখ্যাসম্বন্ধে বলিতে গিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে ( ১।১।৩ সূঃ ) বলিয়াছেন "নেদং ব্যাসদর্শনমপিতু সপ্তমং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধদর্শনমেব।" ইতি।

# তত্ত্ব কথা।

সত্য বলিলেই সাধারণতঃ বুঝায় এই যে যাহা বাস্তবিক আছে বা ছিল এবং থাকিবে। যখন পরস্পরের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ হয় তখন একে অপরকে বলে আমার কথাই সত্য ; বিশ্বাস না হয় চল দেখাইয়া দিতেছি ; না হয় আরও দশজন লোক লইয়া আইস ; যদি দেখাইবার যোগ্যও না হয় তবে সে আরও দশজন লোকের কথা বলে ; রাম বাবু দেখিয়াছেন ; শ্যাম বাবু দেখিয়াছেন ; যদু ও কানাই কাঞ্জিলালও দেখিয়াছে ; ইহা মানিবে না কেন, অর্থাৎ দশজনে দেখিয়াছে দশজনে স্পর্শ করিয়াছে, উপলব্ধি করিয়াছে ইহা দেখাইয়া দিয়া বস্তুটির সত্তা সম্বন্ধে যে সংশয় আসিয়াছিল তাহা দূর করিয়া দেয়। আর যে সমস্ত স্থলে দেখাইয়া বা লোকের কথার দোহাই দিয়া প্রমাণ করা চলে না সেখানে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে। যুক্তি জিনিষটা কি তাহা যদি চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে তাহা যে একটি স্বতন্ত্র উপায় বা উপাদান তাহা নহে ; কথাটা খুব জমকাল রকমের শুনাইলেও তাহার উপায়টা খুবই স্বাভাবিক সরল এবং সহজ। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হয় বুঝিতে পারা যায় যে এটা একটা সাদা কথা যে কোনও একটা বস্তু এবং তাহার

উল্টা স্থিরভাবে কখনও একত্র থাকিতে পারে না। অর্থাৎ একই বস্তু একই সময়ে তাহার উল্টা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। উল্টা বলিতে আমি ইহা বুঝিনা যে একেবারে কলের ছাঁচে ফেলিয়া কোনও জিনিষের উল্টা করিবার কথা বলিতেছি; যে কোনও প্রকারে অন্যবিধ বা অন্য প্রকারের হইলেই চলিতে পারে। স্থূলকথা এই যে, কোনও বস্তু একক্ষণে যা থাকে সে তাহাই থাকে; অর্থাৎ একই ক্ষণে একই বস্তুকে গৌর বলিলে, সেইক্ষণেই তাহাকে ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ণ বলা চলে না। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে, যে কোনও একটি বস্তু যখন আছে তখন সে যেরূপ সিদ্ধ, নিষ্পন্ন, নানা বিশেষণে তাহার সত্তাটি যে ভাবে বিশেষিত, ঠিক সেইভাবের বিশেষিত সত্তা লইয়াই আর একটি বস্তু কখনই সেইক্ষণে থাকিতে পারে না।

কথাটি সহজ হইলেও আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে বড়ই কঠিন। আজ এই মুহূর্ত্তে যে বীজটি মাটিতে প্রোথিত করিলাম, ঠিক দশ বৎসর পরে হয় ত দেখিব যে সেখানে একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ হইয়াছে; আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে এই প্রকাণ্ড মহীরুহটি কোথা হইতে আসিল; অন্যস্থান হইতে কেহ আনিয়া লাগায় নাই তবে এ কোথা হইতে আসিল; তবে কি যে সময় বীজ মাটিতে পুঁতিয়াছিলাম সে সময়ও এই গাছটি ছিল' কৈ তখন'ত গাছ দেখি নাই; তখন'ত কেবলমাত্র

বীজই দেখা গিয়াছিল, তবে কি বীজ এবং গাছ একই জিনিষ ; কৈ তাহা হইলে ত মিল হইতেছে না ; একই সময়ে একই বস্তুর সত্তা ভিন্ন প্রকারের কিরূপে হইবে ? অথচ ইহা অস্বীকার করাও যায় না। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে বীজের সত্তাটি যেরূপ, সেই একই ক্ষণে বৃক্ষের সত্তাটি সেরূপ নহে। বীজ এবং বৃক্ষ একবারে পৃথক্, অথচ বীজ এবং বৃক্ষ একই বস্তু ; এই বীজই কালে বৃক্ষ হইয়া প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তাহা হইলেও একথা বলা চলে না যে যখন বীজটি পুঁতিলাম তখন সেই বীজটির সহিত তাহারই আত্মস্বরূপ বৃক্ষের কোনও পার্থক্য নাই ; যদি কোনও পার্থক্য না থাকিত তবে বীজ পুঁতিবার সময় বীজটিও যেমন দেখিতাম গাছটিও তেমন দেখিতাম, আর বীজ পুঁতিবার আবশ্যক থাকিত না ; তবেই বীজ এবং বৃক্ষ এক হইলেও একটু পার্থক্য আছে।

একের সত্তা ঠিক অপরের সত্তা নহে ; বীজকে বৃক্ষের সূক্ষ্মাবস্থা বলা যাইতে পারে ; এই বীজই কালে জল, বায়ু, আকাশ ও আলোর স্পর্শে ক্রমশঃ বৃক্ষ হইতে থাকিবে ; তবেই বীজাবস্থায় বীজকে যেভাবে বীজ বলা যাইতে পারে ঠিক সে ভাবে তাহাকে বৃক্ষ বলা যাইতে পারে না। কাজেই এস্থলে একেবারে তত্ত্ব কথার দিকে গেলেও এ কথা বলা যাইতে পারে না, যে বীজসত্তা এবং বৃক্ষসত্তা একেবারে একই জিনিষ ; তাই একথা বেশ বলা যায় যে একই সময়ে কোনও দুইটি জিনিষকেই একেবারে এক বলা যাইতে পারে

না। অতএব যদি কোনও বস্তুর সত্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আমরা তাহাকে ঠিক স্পষ্ট না দেখিতে পাই অথবা তাহা যদি দেখার যোগ্য না হয় তবে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে তাহার বিপরীতটি সেখানে আছে কিনা; যদি বিপরীতটির থাকিবার সম্ভাবনাও থাকে তথাপিও আমরা পূর্ব্বেরটির সত্যতা সম্বন্ধে নিসংশয় হইতে পারি না। বিশ্ববিধানের এমনই বিচিত্র নিয়ম যে স্থানভেদে, অবস্থাভেদে এবং সময়ভেদে সমস্ত বস্তুই বিচিত্র। এমন দুইটি বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যাহারা পরস্পর সমান। সকল বস্তুই বিচিত্র, আবার সকল বস্তুই এক।

যেখানে যাও সেইখানেই দেখিবে কেবল বিচিত্রতা। এমন দুইটি জিনিষ পাইবে না যাহারা পরস্পর এক। একই বৃক্ষের একটি পল্লবের দুইটি পত্র লইয়া দেখ দেখি কত পার্থক্য, দেখ দেখি ঠিক একই রকমের দুইটি ফল পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাও কিনা; জড়জগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ প্রাণীজগৎ খুঁজিয়া দেখ দেখিবে, প্রত্যেটিই প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, অথচ কোনোওটি হইতে একেবারে পৃথক্ নয়। এই তত্ত্বটির উপরেই Leibnitzএর "Principium Indiscernibilium" এর সূত্রটি প্রতিষ্টিত এবং এই জন্যই, কি পদার্থ[illegible], কি ভূতত্ত্ব, কি নৃতত্ত্ব, কোনও বিভাগেই অলঙ্ঘ্য শ্রেণী[illegible]ভাগ সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে একটি বিভাগ অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একেবারে এক বলিতেও কিছু নাই একেবারে পৃথক্ বলিতেও কিছু নাই। একেরই যেন স্তরে স্তরে ক্রম বিকাশ।

"Could we restore all the ranks of the great processions that have descended from the common ancestor, we should find nowhere a greater difference than between offspring and parents; and appearance of Kinds existing in nature which is so striking in a mnseum would entirely vanish. Could we begin at at the beginning and follow this development down the course of time, we should find no classes but an evermoving, changing, spreading, branching continuum." অভেদের দিক্ দিয়া দেখিলে সবই যেমন অভিন্ন, ভেদের দিকে দেখিলে সবই তেমনি বিভিন্ন। একদিকে যেমন অদ্বৈত অপর দিকে তেমনি বহুধা বিচিত্র।

এত বিচিত্রতা সত্ত্বেও সেই জন্যই এই বিভিন্ন বস্তুগুলির কি প্রগাঢ় সম্বন্ধ। সামান্য ঘাসটি পাতাটি পর্য্যন্ত পরম্পরাসম্বন্ধে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ; সব যেন একেবারে সাজান, যেন এক সঙ্গে গাঁথা; কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারও থাকিবার উপায় নাই; তোমার হাতের নাটায়েতে একটুখানি টান পড়িলে আসমানের ঘুড়ি শুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিবে। যে যেখানে সে তখন সেইখানেই ঠিক, তুমি না দেখ্‌তে পেলে কি হয় বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত তাহার পরতে পরতে, নাড়ীতে নাড়ীতে, প্রাণে প্রাণে যোগ। এই যোগ এই সম্বন্ধ যোজনা করাকেই যুক্তি বলে।

যখন বস্তুটি আমরা ইচ্ছা করিলেই ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি তখন না হয় কোনও রূপে দেখিয়া বা স্পর্শ করিয়া সেই বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বোধ লাভ করিতে পারিলাম কিন্তু যাহা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারিব না তাহার বেলা কি করিব, তখন কি করিয়া বস্তুর সত্যতা নির্দ্ধারণ করিব। তাই পণ্ডিতেরা বলেন যে তখন যোজনা বা যুক্তি করিব। যখন সমস্তই পরস্পর গাঢ় সম্বন্ধে অন্বিত তখন'ত আর ভয়ের কোনও কারণ নাই।

যতটুকুর সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত সেইখান হইতে ধীরে ধীরে রওনা হইয়া আসিলেই অর্থাৎ যেটুকুকে আমরা সত্য বলিয়া জানি সেটাকে এক হাতে রাখিয়া তাহার নানা সম্বন্ধের মধ্যে যে কোনও একটা অভিমত সম্বন্ধ ধরিয়া চলিয়া আসিলেই আমরা আর একটি বস্তুতে আসিয়া পৌছিব। যোজনা করিয়া দেখিব, অন্যবিধ সম্বন্ধের পর্যালোচনা করিয়া দেখিব যে পূর্ব্বের যোজনা বা যুক্তিতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই পাওয়া যায়, না অন্য আর কোনও বস্তুও পাওয়া যায়। যদি উভয় দিকে ঠিক মিল হয় এবং একই সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় তবে বুঝা গেল যে বস্তুটির সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে নচেৎ বুঝিতে হইবে যে যোজনার কোথাও নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; সম্বন্ধগুলিকে ঠিক হয় ত ধরিতে পারা যায় নাই কিম্বা তাহাদের পর্য্যালোচনা হয় ত ঠিক হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম ধরা যাউক কোনওরূপে ডিম্ব প্রসবকারিণীদিগের সহিত যাহারা গিলিয়া আহার করে তাহাদের সহিত এই সম্বন্ধ বাহির

করা গেল, যে যাহারা গিলিয়া খায় তাহারা সকলেই ডিম্ব প্রসব করে। এখন যদি আমি ডিম্ব প্রসব করার সহিত কুমীরের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তাহার বিচার করিতে যাই তবে আমাকে দেখিতে হইবে যে ডিম্ব প্রসবের সহিত সম্বন্ধ আছে এমন আর কোনও একটা বস্তু পাই কিনা। তখন দেখিলাম যে আমি জানি যে গিলিয়া খাওয়ার সহিত ডিম্ব প্রসবের একটা সম্বন্ধ আছে এবং যাহারা গিলিয়া খায় তাহারা সকলেই ডিম্ব প্রসব করে; এখন আমাকে দেখিতে হইবে যে এই গিলিয়া খাওয়ার সহিত ডিম্ব প্রসবের যেরূপ সম্বন্ধ, গিলিয়া খাওয়ার সহিত কুমীরের ঠিক সেরূপ কোনও সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না; অর্থাৎ কুমীর গিলিয়া খায় কিনা? কিছুই ঠিক করিতে পারি না। কুমীর গিলিয়া খায় না চিবাইয়া খায় কে জানে। তাহাকে যেমন ডিম পাড়িতেও আমরা দেখি নাই তেমনি গিলিয়া খাইতেও আমরা দেখি নাই। যিনি পৈত্রিক প্রাণের বিনিময়ে তাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিও বলিতে আসিতে পারেন নাই; তবে এখন দেখিতে হইবে যে গিলিয়া খাওয়ার সহিত আর কিছুর কোনও সম্বন্ধ বাহির করা যায় কিনা, এবং সেটা কুমীরের পাওয়া যায় কি না; দেখিতে দেখিতে দেখিলাম যে যাহাদের গালাসীর দাঁত নাই তাহারাই গিলিয়া খায়, এখন আমার দেখিতে হইবে যে যাহাদের গালাসীর দাঁত নাই তাহাদের সহিত কুমীরের একটা ঐরূপ সম্বন্ধ পাওয়া যায় কি না। দেখিলাম যে বাস্তবিক পক্ষে কুমীরের গালাসীর দাঁত

নাই, তখন এই সম্বন্ধপরম্পরার মধ্য দিয়া আমি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিলাম যে কুমীরও ডিম পাড়ে। এইখানেই Immediate ও Mediate inferenceএর ক্ষেত্র।

ইহার মধ্যে কাহারও মনে হইতে পারে যে সত্য কি তাহা বলিতে গিয়া বস্তুসত্তা মাত্রই প্রথমে লক্ষ্য করিয়াছিলাম এখন আবার অতিরিক্ত একটি সম্বন্ধ পদার্থ আনিতেছি কোথা হইতে? কিন্তু তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যখন কোনও বিষয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হই তখন আমরা কোনও সম্বন্ধবিশেষের মধ্য দিয়াই তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি। বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধসংস্থাপনকেই জ্ঞান বলা যায় কাজেই আমাদের পক্ষে কোনও বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে তাহা বস্তুবিশেষের সহিত সম্বন্ধটাকেই লক্ষ্য করিতেছে। একেবারে সম্বন্ধবিহীন কোনও বস্তুর বিষয় আমরা জিজ্ঞাসাই করি না। সম্বন্ধ যেখানে নাই সেখানে আমাদের জ্ঞানও নাই। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কোনও না কোন সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে যে সংসারের একটি বস্তুর সহিত আর একটি সম্বন্ধ এবং তাহার সহিত আর একটি সম্বন্ধ এবং এইরূপে সংসারের সমস্ত বস্তুই পরস্পর গাঢ় ভাবে সম্বদ্ধ। যদি কোনটির সহিত কোনটির সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ না বুঝিতে পারা যায় তবে অপরের সহিত যোজনা করিয়া প্রার্থিত সম্বন্ধটি অনায়াসেই লাভ করিতে পারি। ডিম্ব

প্রসবের সহিত কুমীরের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না বলিয়াই ডিম্ব প্রসবের সহিত গিলিয়া খাওয়ার এবং গিলিয়া খাওয়ার সহিত গালাসীর দাঁতের এবং গালাসীর দাঁতের সহিত কুমীরের তুল্য সম্বন্ধ আছে জানিয়া আমি অনায়াসেই সম্বন্ধগুলিকে যোজনা করিয়া প্রস্তাবিত ডিম্ব প্রসব ব্যাপারের সহিত কুমীরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারিলাম।

তবে এই সম্বন্ধগুলি পর্য্যালোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে যখন আমরা প্রথম কোনও একটি সম্বন্ধ হইতে দ্বিতীয় আর একটি সম্বন্ধে আসিয়া দাঁড়াই অর্থাৎ প্রথম সম্বন্ধটির দ্বারা যখন দ্বিতীয় সম্বন্ধটির যোজনা করিলাম তখন এই যে আমার যোজিত দ্বিতীয় সম্বন্ধটি, ইহা ঠিক হইল কিনা? এবং তাহা বুঝিতে হইলে আমাকে এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমি আমার নূতনলব্ধ সম্বন্ধজ্ঞান হইতে যোজনা করিয়া আবার প্রথমকার সম্বন্ধটি পাইতে পারি কিনা; কারণ প্রথম সম্বন্ধটি হইতে যোজনা করিয়া যদি দ্বিতীয় সম্বন্ধটিতে ঠিকমত আসিয়া থাকি তবে দ্বিতীয় সম্বন্ধটি হইতেও যোজনা করিয়া প্রথম সম্বন্ধটিতে আসিতে পারিব কারণ তাহারা ত পরস্পর সম্বদ্ধ রহিয়াছে কাজেই একটা হইতে আর একটায় আসিতে পারিলে আর একটা হইতেও পূর্ব্বেরটায় যাওয়া যাইতে পারিবে।

আর যদি দেখি যে দ্বিতীয়টি হইতে যোজনা করিতে গেলে ঠিক প্রথমটি হইতেও পারে বা নাও হইতে পারে অথবা বাস্তবিকই

আর একটাই হইয়া পড়ে তবে বুঝিতে হইবে যে আমার যোজনা করা ঠিক হয় নাই কারণ একই বস্তু কখনও একই ক্ষণে তাহার বিপরীতটি হইতে পারে না। আরও স্পষ্ট করিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে যোজনা দ্বারা যে দ্বিতীয় যোজনাটিতে আসিলাম সেটি যেন প্রথম জ্ঞানটির বিরোধী না হয়; যদি বিরোধী না হয় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে প্রথম জ্ঞানটির মধ্যেই তাহা নিহিত ছিল এবং প্রথম সম্বন্ধটি ছাড়া তাহা মূলতঃ আর কোনও স্বতন্ত্র সম্বন্ধজ্ঞান নহে। যখন বলিলাম যে, বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারীরা ডিম্ব প্রসব করে; কুমীর বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারী; অতএব কুমীর ডিম্ব প্রসব করে। এখানে যখনই আমি বলিয়াছি যে সমস্ত বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারীরা ডিম্ব প্রসব করে, তখনই কুমীরের ডিম্বপ্রসবকারিত্ব একরূপ তাহারই মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপিও কুমীর সম্বন্ধে আমার ঐ জ্ঞানটা ছিল তাই কুমীরের বিনা চর্ব্বণে ভক্ষণকারিত্ব সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আমি কুমীরের ডিম্ব প্রসবকারিত্ব গুণটির উপলব্ধি করিলাম; যে বিরাট সম্বন্ধটা কুমীরের মধ্যেও পড়িয়াছিল সে যেন আমার নিকট তিরোহিত হইয়াছিল তাই তাহাকে আমি পুনরায় যোজনা করিয়া ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া তাহাকে লাভ করিলাম; এই যে দ্বিতীয় উপলাভ সেটি প্রথমটির বিরোধী নহে; অপেক্ষাকৃত ব্যাপকের মধ্যে যাহা ছিল ব্যাপ্যের মধ্য দিয়া তাহাই ফুটিয়াছিল; আমি চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাই নাই; যোজনা করিয়া বুঝিলাম। আবার যখন এই

শ্রেণীর যোজনা বা যুক্তি করি তখন একটি কোনও বৃহৎ সম্বন্ধ জ্ঞানকে তাহার তিরোহিত রূপের মধ্য দিয়া চিনিয়া লইতে চেষ্টা করি। বৃহতের মধ্যে যে প্রকাশ ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই একই প্রকাশ। বৃহতের মধ্যে তাহার সন্ধান কথঞ্চিৎ টের পাইয়াও অনেক সময়ে ক্ষুদ্রের মধ্যে তাহার প্রকাশ ঠিক পাই না ; এবং যতক্ষণ ঠিক পাই না ততক্ষণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রই থাকে এবং বৃহৎ বৃহৎই থাকে, তাহাদের মধ্যে সকল সময়ের জন্য থাকিলেও তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ; অথচ বৃহতের সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারা যাইতেছে ততক্ষণ ক্ষুদ্রের জীবনের সত্যতা সংস্থাপন করাই দুর্ঘট হইয়া উঠে। তাই ক্ষুদ্রকে বুঝিতে হইলে আমরা বৃহৎকেই ক্ষুদ্রের মধ্যে উপলাভ করিতে চেষ্টা করি, বৃহতের জীবনের অতিরিক্ত ক্ষুদ্রের কোনও জীবন নাই। বৃহৎই নিজকে ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং নিজেও ক্ষুদ্রের জীবনের মধ্য দিয়াই বৃহৎ হইয়াছেন। ক্ষুদ্রের জীবনের সত্যতা বুঝিতে হইলেই আমাকে বৃহতের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে, দেখিতে হইবে যে বৃহতের জীবন হইতে ক্ষুদ্রের জীবন যোজনা করা যায় কিনা ; এই বৃহৎ আবার তদপেক্ষা বৃহতের তুলনায় ক্ষুদ্র এবং বৃহত্তরের জীবনের প্রকাশ ; এইরূপ চলিতে চলিতে আমরা দেখিতে পাইব যে এক ব্রহ্মের জীবন হইতে সকলের জীবন প্রাকাশ পাইতেছে।

সেই একই বিরাটের জীবন চির জাগ্রত রহিয়াছে আর তাঁহারই তেজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের ও জীবন প্রকাশিত হইতেছে তাঁহার

জীবনের মধ্যেই সকলের জীবন আচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাঁহার জীবনের দ্বারাই সকলের জীবন প্রভাময় হইয়া জয়যুক্ত হইয়া উঠিতেছে।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"

প্রতি ক্ষুদ্রের জীবন সেই মহানের সর্ব্বাঙ্গের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে যেখানে আছে সে সেইখানে থাকিয়াই তাহারই জীবনের বিকাশ সাধন করিতেছে; তাহাকে নড়াইবার যো নাই, একটিকে নড়াইতে গেলে ব্রহ্মের সমস্ত অবয়ব কাঁপিয়া উঠিবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আসিয়া তোমার গতিরোধ করিবে, তুমি একটিকেও অন্যথা করিতে পার না, বা একটিকেও তাহার স্থান হইতে অন্যত্র সরাইতে পার না; একটি অতি ক্ষুদ্রকেও সরাইতে গেলে সমস্ত বিশ্ব তোমার গতিরোধ করিতে আসিবে।

একটি ক্ষুদ্রকে সরাইয়া তাহার স্থানে যখন আর একটি ক্ষুদ্রকে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছ অথবা তাহাকে অন্যথা করিতে চেষ্টা করিয়াছ তখনই দেখিবে বৃহতে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে এবং বৃহৎ নিজেই অন্যথা হইতে চলিয়াছে; কারণ ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া ত বৃহতেরই জীবন ফুটিয়া উঠিতেছিল, কাজেই ক্ষুদ্রের জীবন অন্যথা করিতে গেলে বৃহতের জীবন অন্যথা হইয়া পড়িতে চায়, এবং সেই সঙ্গে তদপেক্ষা বৃহৎ, তদপেক্ষা বৃহৎ, এই ক্রমে মহানের সমস্ত অবয়বই যেন কাঁপিয়া উঠিতে থাকে। তাই এক জায়গায় সত্যের অপলাপ করিতে চলিলে সমস্ত বিশ্বের সত্য আসিয়া তোমার

অলক্ষ্যে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। যিনি মহান্, যিনি ভূমা, তিনি ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়া একেবারে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষোদীয়ানে উপস্থিত হইয়াছেন। বরাবর ধারাবাহিক শৃঙ্খলাই মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছে। যদি তিনি তাঁহাকে কেবল তাঁহার বৃহতের মধ্যেই চাহিতেন, তবে আর ক্ষুদ্রের কোনও প্রয়োজনই থাকিত না, তাঁহার অনন্তের মধ্যেই যদি তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে সেইখানেই তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট হইয়া যাইত, তাই তিনি সকল ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে করিতে এই জগতের পরম বিচিত্রতার সৃজন করিয়াছেন ; আমরা কিন্তু অনেক সময়েই তাঁর এই বিচিত্র প্রেম ঠিক বুঝি না। তিনিই ক্ষুদ্র হইয়াছেন, তিনি আমার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়াছেন ইহা বুঝিলেও তিনি যে কোন পথে আসিয়াছেন তাহা বুঝি না ; তাই যখন তাঁহাকে আমরা দ্বারপ্রান্তে পাই তখনই গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ আমরা ইচ্ছা মত যে তাঁহাকে খুজিয়া পাইব তাহার আর উপায় থাকে না। কাজেই তাঁহার সহিত সুখমিলন আমার অধীন না হইয়া তাঁহারই আয়ত্ত হইয়া থাকে ; আমার কাজ বুঝিয়া, আমার ব্যগ্রতা দেখিয়া আমার আবেগ দেখিয়া তিনি আজ একুঞ্জে, কাল ওকুঞ্জে, দেখা দেন বটে কিন্তু এই কুঞ্জরাজির মধ্য দিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন সঞ্চারভূমিটা চিরগোপনই রহিয়া যায় ; আমি হয়ত এক স্থানে পাইয়াই ভাবি যে এইখানেই বুঝি তাঁব আরাম, তিনি বুঝি এইখানেই মাত্র থাকেন।

তখন অমনি তিনি আর এক কুঞ্জ হইতে বাঁশী বাজাইয়া উঠেন, আর ভক্ত বৈজ্ঞানিকেরা উদ্বেলিত হৃদয়ে, অসম্বৃত বসন ভূষণে, নগ্নপদে তাঁহার উদ্দেশে ছুটিতে থাকে। তিনি তাঁহার ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে নিজেই আড়াল তুলিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই আড়ালের ভিতর দিয়া আনা গোনা করিতেছেন। আমরা কখনও যমুনা তটে কখনও বংশীরবে কখনও বা মাধবীকুঞ্জে কখনও বা শ্যামকুঞ্জে কখনও বা দূরে কখনও বা সন্নিকটে তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু তিনি যে এক সময়েই সকল কুঞ্জে সঞ্চার করিতেছেন, ষোল শত গোপিনীর সহিত যে একই নিশায় বিহার করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। যেখানে আমরা থাকি তাহারই চারিদিকের আড়ালে আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে অথচ সেই আড়ালের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার গোপন মিলন সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। প্রাণ চায় যে, যেন সকল বাধা টুটিয়া যায়, যেন সকল কুঞ্জের আড়াল ছুটিয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলে যে কুঞ্জই থাকে না। তিনি যে জানেন গোপনমিলনের কত মধুর স্বাদ, প্রেমের কত লীলাবৈচিত্র্য! রসিক তিনি, তাই তিনি তাঁহার অবাধ সঞ্চার আমাকে দেখান না, তাই আমি অনিমেষনেত্রে, পুলকিত গাত্রে তাঁর বিশ্বসঞ্চার দেখিতে পাই না। যখন আমার ক্ষুদ্র কুঞ্জে তিনি আসেন তখনই তাঁহাকে পাই, তাঁর সকল স্থানের অবাধ পদ সঞ্চার, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তাঁর পদ সংক্রমণ উপলাভ করিতে পারি না; তাই

আমরা যদিও কোনও একটি বৃহৎকে, কোনও একটি ক্ষুদ্রের মধ্যে উপলাভ করি তথাপিও সেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তরকে সেই বৃহতের মধ্যে, এবং বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমকে বৃহত্তরের মধ্যে, এবং এই ক্রমে একেবারে ভূমা এবং মহান্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি নাই। সকল পথের সম্বন্ধ জানি না। সকল কুঞ্জ হইতে আগম নির্গমের পন্থাও বুঝি না। তিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাই সমস্তই সত্যের অবয়ব এবং সত্য। তাই কোনও সত্যে যদি অপলাপ করি তবে সমস্ত বিশ্ব আমাকে রুধিয়া দাঁড়ায়। সত্যকে আমি যে ভাবেই অবহেলা করি না কেন তাহার দণ্ড আমাকে তখনই পাইতে হইবে। ভুলে হউক, ইচ্ছায় হউক, যে ভাবেই আমি সত্যকে অবহেলা করিব সত্য সেই ভাবেই আমার গতিরোধ করিবে এবং আমাকে দণ্ড পাইতে হইবে, ভুলে করিয়াছি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছি তিনি তাহা গণনা করিবেন না।

প্রাচীনেরা বলিয়াছেন যে জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক পাপ করিলেই তাহার সাজা আছে। আমার অগ্নি আছে কিন্তু আমি যদি তাহা না জানি এবং না জানিয়াই যদি সেই অগ্নি না থাকিলে যেরূপ ব্যবহার করিতাম সেইরূপ ব্যবহার করি এবং এইভাবে সত্যকে অবহেলা করি তবে সত্য তাহা শুনিবে না; জানিয়াই হাত দেই আর না জানিয়াই হাত দেই

আগুন হাত পুড়াইবেই পুড়াইবে; সে নাই ভাবিয়া আমি তাহাকে অবহেলা করিলাম বটে কিন্তু তাই বলিয়া সত্য তাহাতে অবজ্ঞাত হইবে না; তিনি তাঁহার প্রবল দাহিকা শক্তিদ্বারা জানাইয়া দিবেন যে তিনি সেইখানে আছেন তাঁহাকে অবজ্ঞা করার কোনও অধিকার আমার নাই। সে দাহিকা শক্তি অগ্নির নিজস্ব নয়, সমগ্র বিশ্বের হইয়া সে শক্তি কাজ করিতেছে; সে শক্তি সমস্ত বিশ্বনিয়মের দূত, সে শক্তি উল্টাইলে সমস্ত বিশ্বের শক্তিই উল্টাইয়া যাইবে তাই সে শক্তি এত অপ্রতিহত, তাই তাহাকে অবজ্ঞা করা কঠিন; আমি অগ্নিকে অস্বীকার করিতে গেলে সে তাহার দাহিকা শক্তিদ্বারা আমাকে আক্রমণ করিবে। কারণ এক অগ্নি অস্বীকার করাতেই আমি সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক নিয়ম এবং শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করিলাম তাই সে যেন বিশ্বের প্রতিনিধি হয়ে আমাকে প্রতিরোধ করে। তার বল কত, সে বিশ্বের প্রতিনিধি, তার শক্তি অপার। সমস্ত বিশ্বের গিরিদুর্গ তার পিছনে। তার ভয় কি? তাই বলিয়াছিলাম যে সত্যকে প্রতিরোধ করিতে গেলে তার সাজা ঠিক আসবেই আসবে। সত্যকে আমি যে ভাবেই অস্বীকার করি না কেন আমাকে সেই ভাবেই বাধা দিবে এবং সেই ভাবেই আমাকে স্বীকার করিয়ে নেবে। যেদিক্ দিয়াই আমি সত্যকে "না" বল্‌তে যাব সে সেই দিক্ দিয়াই ডেকে বলে উঠ্‌বে যে সে "না" নয়, সে "হাঁ"। যখন চিন্তায় আমি কোনও সত্যকে অস্বীকার

করি, তখনই আমার চিন্তার মধ্যে তোলপাড় উপস্থিত হয় এবং সত্যকে অস্বীকার করার জন্য আমার চিন্তার খেই মিলিয়ে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারি না। আমার কেবলই ভুল হইতে থাকে। যে সত্যকে অস্বীকার করিতেছিলাম সেই সত্যকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এনে তার সিংহাসনে বসাব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চিন্তারাজ্যের বিপ্লব মিটিবে না। কবি গাহিয়াছিলেন "যদি কোনও দিন তোমার আসনে, আর কাহারও বসাই যতনে, চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না প্রভু"। তা তিনি ফিরিয়া যান না, তিনি রাজ্যের মধ্যে চারিদিকে বিপ্লব বাধাইয়া দেন। চারিদিকে অশান্তির সৃষ্টি করেন এবং সকল বিরোধ এবং অশান্তির মধ্যে নিজের সিংহাসনে নিজকে প্রতিষ্টিত করিয়া আবার সর্ব্বত্র মঙ্গলময় শান্তির বার্ত্তা প্রচার করেন; এইরূপ যখন জড়ের মধ্যে সত্যকে অস্বীকার করিবে, তখন জড়ের দিক্ হইতেই বাধা আসিবে, তা জানিয়াই অস্বীকার কর আর না জানিয়াই অস্বীকার কর। রাজাকে না মানিলে তার সাজা আছেই; যদি বল আমি জানিতাম না যে তুমি রাজা, রাজা বলিবে আচ্ছা তাইত তোমাকে জানাইয়া দিতেছি। কে আছরে পাইক্ পেয়াদা! হাত পা বেঁধে পঁচিশ ঘা করে বেত মেরে একে বুঝিয়ে দে যে আমি রাজা। বেত খেলেই সে বোঝে, যে, না, একে অস্বীকার করা চলে না। একে অস্বীকার কর্‌লে এ বুঝিয়ে দিবে, এ জানিয়ে দেবে, মানিয়ে নেবে, যে এ রাজা। তখন সে বলে যে না তুমিই রাজা। আবার

যখনই না মান্‌বে তখনই রাজশাসন উপস্থিত হবে। গ্রীষ্মের রোদ যদি তুমি না মেনে বিনা ছাতায় ইচ্ছামত খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া আস, তবে তখনই বাড়ীতে মাথা ধরিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকিবে। শীতের রাতের শীতল বায়ু না মেনে শুধু গায় জানালা খুলে শুয়ে থাক্‌লে তার পর দিনই সকাল বেলা আদা সৈন্ধবের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আপাততঃ যখন মনে হইবে যে বুঝি অসুখ কর্‌ল না, তখন তুমি টের পাও নাই বটে; কারণ স্পষ্টতঃ বেত্রদণ্ড না হইলে তুমি টের পাইবার ছেলে নও; কিন্তু কিছুদিন পরেই হয়ত দেখিবে যে যত দিনের ইজারা ছিল তার পূর্ব্বেই তোমার বসত বাড়ীর উপর ক্রোকী পরোয়ানা আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমি টেরও পাইলে না, যে কেন ক্রোকী পরোয়ানা এত হঠাৎ আসিল, কারণ কত দিনের ইজারা ছিল তাহা তোমার একেবারেই জানা ছিল না, তাহা রাজ বাড়ীর পাকা খাতায় লেখা ছিল, তোমার সাজা স্বরূপে রাজার হুকুমে মুহুরি তার থেকে কিছু তোমাকে কমিয়ে দিল। যে ভাবেই তুমি সত্যকে অস্বীকার কর না কেন তাতেই তোমার পাপ জন্মাবে এবং তাতেই তোমাকে সাজা পেতে হবে। পূর্ব্বতন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদিরা সত্যকে জ্ঞানের মধ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু জড়কে জ্ঞানের বাহিরে বলে মনে কর্‌তেন, তাঁরা ভাবতেন যে জ্ঞানই কেবল মাত্র সত্য এবং তার এত যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ তা সবই মিথ্যা। জ্ঞানের উপর সব জিনিষ কল্পিত হচ্ছে এবং যে গুলি কল্পিত, সে গুলিকে সত্য বলা চলে না।

জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই আমরা পাই না, তাই জ্ঞান ছাড়া আর কিছু স্বীকারও করা চলে না।

তুমি মনে কচ্চ তোমার সাম্‌নে একটা গাছ আছে, কিন্তু গাছ বল্লে যেটাকে বোঝায় সেটা কোনও রকমের জ্ঞান ছাড়া আর কি? তাকে ছুঁয়ে বুঝি, তাকে দেখে বুঝি, যে ভাবেই বুঝি না কেন, একটা বোঝা ছাড়া সেটা আর কি? দেখাও একটা জ্ঞান; ছোঁয়াও একটা জ্ঞান, জ্ঞান ছাড়া আর আমরা কি পাই? আমাদের কাছে আস্‌তে হলেই যখন জ্ঞান ছাড়া আর কিছু আস্‌তে পারে না, তখন জ্ঞানকেই আমরা মান্‌ব, আর কিছু মান্‌ব না; ঘর বাড়ী, মাঠ, বলে যা যা মনে হচ্চে সে সবই হচ্চে জ্ঞানের আকার, জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই, জ্ঞানের উপর ভিন্ন ভিন্ন আকার চড়িয়ে চড়িয়ে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি কর্‌ছি। সে আকারগুলি কিন্তু আবার সবই মিথ্যা কল্পিত। কারণ আকারগুলি বদ্‌লে বদ্‌লে যায়, আর যেগুলি বদ্‌লে বদ্‌লে যায় সে গুলি কখনও সত্য হইতে পারে না কারণ সত্য যা হবে তা ত আর বদ্‌লাবে না, সত্য বরাবর একই থাকিবে, তার কিছুতেই বদল হবার যো নাই।

এই যেমন মাটি দিয়ে কলসী হয়, শরা হয়, আরও কত কি হয়; এই কলসী শরাগুলি হচ্চে মাটিরই ভিন্ন ভিন্ন আকার; একটা আকার বদ্‌লে আর একটা আকার করা যায়, হাড়ী ভেঙ্গে কলসী, কলসী ভেঙ্গে শরা, কিন্তু এদের সকলের মধ্যেই মাটি

রয়েছে। হাড়ীই কর আর কলসীই কর আর শরাই কর তাদের সকলের মধ্যে মাটি যে থাক্‌বেই থাক্‌বে ; মাটি ছাড়া আর জো নেই। এই মাটিটাকেই আমরা একটা আকারে বলি হাড়ী, একটা আকারে বলি কলসী ; বস্তুতঃ মাটি ছাড়া যে কলসীটা কি, তাও আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, আর মাটি হিসাবে দেখতে গেলে হাড়ী কলসী সবই এক হয়ে যায় ; হাড়ী কলসী এগুলি সব মাটিরই অবস্থা। মাটিরই ভিন্ন ভিন্ন আকার, কিন্তু সেই সব আকারের মধ্যে কেবল মাটিই ঠিক হয়ে রয়েছে। তার ভিন্ন ভিন্ন আকারগুলো, যে আকার গুলোর জন্য আমরা সেই একই মাটিকে একবার হাড়ী একবার কলসী বলি, সবই বদলে যাবে কিন্তু সব বদলের মধ্যে ঠিক্ থাক্‌বে কেবল মাটি। হাড়ী ভেঙ্গে কলসীই কর আর শরাই কর মাটি ঠিক ঠিকই থাকবে, সে বদলাবে না, তাই এদের তুলনায় মাটিই সত্য আর তার আকার গুলো সবই মিথ্যা। তেমনি জ্ঞানেরই যখন সব ভিন্ন ভিন্ন আকার ও সমস্ত আকারই যখন বদলে বদলে যায়, তখন তাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানই সত্য আর আকার গুলো যে একেবারেই মিথ্যা তা সহজেই বলা যেতে পারে। বইয়ের জ্ঞান হচ্ছে ; টেবিলের জ্ঞান হচ্ছে, কলমের জ্ঞান হচ্ছে, সবই হচ্চে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন আকার ; জ্ঞান এক একই থাকে, সে জ্ঞানটার যখন একটা আকার হয়, তখন তাকে বলা যায় বইয়ের জ্ঞান ; আর একটা আকার হলে বলা গেল টেবিলের জ্ঞান তবেই জ্ঞান ঠিকই থাকল, বদলে গেল তার আকারটা,

একবার ছিল বইয়ের আকার একবার হোল টেবিলের আকার, তবেই আকারগুলিই কেবল বদলায় আর জ্ঞানটা বরাবর ঠিকই থাকে; কাযেই আকারগুলো সব মিথ্যা আর জ্ঞানটাই কেবল ঠিক। তাই জড় বলে যেটা আমরা এমন সহজে অনায়াসে বিশ্বাস করে নিয়ে ছিলুম, সেটা জ্ঞানের চোখে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেল। জড় বলে কোন জিনিষই রইল না, যেটা জড় বলে মনে হচ্ছিল সেটা জড়ই নয়; কারণ জড়টা আবার কি? সেটাকে আবার কে কবে দেখেছে? যদি বল এই যে আমি দেখছি কিন্তু ভেবে দেখ দেখি কি বলে ফেল্লে; এই কথা বলিলে যে আমি দেখেছি; যেই বলা জড় আমি দেখেছি, সেই ত জ্ঞানের মধ্যেই এলে। দেখাটা ত জ্ঞানেরই প্রকারবিশেষ; তবেই এমনি করে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া যা যা আমরা পাব, সবই ত জ্ঞানের অন্তর্ভূত হবে; আর ইন্দ্রিয়দের ছাড়িয়েও সেখানে আমাদের পৌছবার কোনও উপায় নাই। যে ভাবেই কোনও তথাকথিত জড়কে আমরা পেতে চাই না কেন, তাকে পেতে হলে, জানার মধ্য দিয়েই পাওয়া যাইবে। এটা দেখিলাম, ওটা স্পর্শ করিলাম, ওটা আস্বাদ করিলাম, এইরূপ যাই করি না কেন, যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা পেতে চাই না কেন, আমরা 'জানাকে' এড়িয়ে কখনও যেতে পারব না। তবেই 'জানার' মধ্য দিয়া ছাড়া যদি আর আমাদের প্রাপ্তির উপায় না থাকে আর 'জানার' মধ্যে এলেই যদি জ্ঞান হয়ে যায় তবে আর জ্ঞান ছাড়া

কোন জিনিষকে ত মানা চলে না। তবেই কেবল মাত্র জ্ঞানই সত্য, আর সবই মিথ্যা, এই জ্ঞানের কোনও আকার নাই, সে বিশুদ্ধ। এর জ্ঞাতাও নাই, জ্ঞেয়ও নাই কারণ পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল মাত্র জ্ঞানই সত্য; জ্ঞাতাই বল আর জ্ঞেয়ই বল সে ত জ্ঞানেরই রূপ, তাদের ত জ্ঞান ছাড়া স্বতন্ত্র সত্তা নাই; তাহাদের নাম যাই হউক তাহা কাজে কাজেই জ্ঞানের আকার ছাড়া আর কিছুই নয়; তবেই এই কথাটাই সত্য হয়ে দাঁড়াল যে বিশুদ্ধ, বিমল, ভেদশূন্য অদ্বৈত জ্ঞানই কেবল একমাত্র সত্য। সত্যই যখন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, তখন সত্য বলে যেটা ঠিক্ করা যাবে, প্রাণপণ করে সেদিকে এগিয়ে পড়া উচিত; মিথ্যা গুলো ছেড়ে সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তারই দিকে ছুটে যেতে পারলেই কর্ত্তব্য সাধন করা হোল; তাই যখন অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান চরম সত্য বলে পূর্ব্বতনেরা বুঝলেন, তখন তাঁরা প্রাণপণ করে সেই দিকেই এগিয়ে পড়্তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং সেটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে কর্‌তে লাগ্‌লেন; সেই সত্য, সেই সার, সেই পরম, এই যাতে বোঝা যায় সেই দিকে প্রাণপণ কর্‌লেন। কোথায় সত্য, কোথায় জ্ঞান, বলে তাঁরা পাগল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মনীষী তাঁরা যখন দেখলেন যে এই সংসারের সুখভোগ, সুসজ্জিত রাজপ্রসাদ, চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজন সামগ্রী, সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা, কত সরস শোভন নয়ন লোভন বস্তু আমাদের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, এরা কেবল বিক্ষেপের সামগ্রী এরা কেহই

জ্ঞান নয়, তখন তাঁরা এদের সব ছেড়েছিলেন। তাঁরা যখন বুঝতে লাগলেন যে ইন্দ্রিয়েরা আমাদিগকে যা দেয় তার কিছুই সত্য নয়, এই যে এমন জ্যোৎস্নাহাসিনী যামিনী, এমন শ্যামল-নীলাঞ্চলধারিণী ধরিত্রী, এমন জ্যোতিঃপুঞ্জখচিতবসনা অম্বর দেবতা, এমন নিবিড়নীলতমোবসনা রজনী, চৈত্রের ভ্রমর ঝঙ্কৃত মাধবানিল, গ্রীষ্মের সুভগাবগাহ নদী-বিহার, ঊষার এমন আবেগমধুর আরক্তিম কপোল, সন্ধ্যার সঙ্কেতভূমিতে গোধূলির অভিসারলগ্নে আলো ও ছায়ার এমন বিচিত্র মিলন, আকুল আবেগপূর্ণ বর্ষার ছল ছল জলধারা, বিগলিতপুণ্যবসনা ফেনভূষণা জাহ্নবী যমুনা এসমস্তই মিথ্যা ; মায়ের আশীর্ব্বাদ, পিতার স্নেহ, বন্ধুর সরস সম্ভাষণ, পত্নীর এমন প্রাণভরা প্রেমচুম্বন, কত আবেগ, কত উৎকণ্ঠা, লাজ, ভয়, মান, অভিমান, বিরহ মিলন, কত প্রাণভরা হাসি, আর বুক ফাটা রোদন, এ সমস্তই মিথ্যা ; সত্য কেবল সেই জ্ঞান, তাই তাঁরা বল্লেন নেতি নেতি, এরা নয় এরা নয় এদের ছাড়। তাই বলে এদের ছাড়লেন, তপোবনে গেলেন, যোগাসনে বসলেন, নবদ্বার বন্ধ করলেন, নিশ্বাস রোধ করলেন যাতে বাইরের কোনও অসত্য তাঁদের স্পর্শ করতে না পারে। দেখলেন সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করে, একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে, বাইরের যেগুলো "নেতি নেতি" সেগুলোকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে, মনটাকে কোনও জায়গায় আবদ্ধ করতে পারেন কিনা। এমনি করে তাঁরা সত্যকে যেভাবে বুঝেছিলেন সেই ভাবেই তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে

মায়ায় পড়লেন। যাহা হতে বিক্ষেপ আসে, যাতে কর্ম্মশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে হয়, তা থেকে তাঁরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সরে সরে যেতে লাগ্‌লেন, তাঁদের নিজেদের মনের মধ্যে যে চিন্তাগুলি আস্‌তে লাগল তাও তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে দূর কর্‌তে লাগ্‌লেন। কেবল দেখতে লাগ্‌লেন চিত্ত যাতে এক জায়গায় স্থির হয়, যাতে কোনও চিন্তা না আসে। এমনি করে তাঁরা শরীর পাত করতে লাগলেন যাতে তাঁরা সত্যকে যেভাবে মনে করে নিয়েছিলেন সেই ভাবেই তাকে পেতে পারেন। তাঁরা যে বীর্য্যবান্, মহান, তাঁদের কে রোধ করে! যা ভাল বুঝেছিলেন তাই করবেন, এক চুলও এদিক্ ওদিক্ নড়বেন না, একেবারে স্থির; সুখভোগ, আসক্তি, ইন্দ্রিয়লালসা, যার জন্য আমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত এসব তাঁরা ছেড়ে দিতে লাগলেন, সব ত্যাগ করতে লাগলেন, কেন না এইসব ক্ষুদ্র জিনিষ ত্যাগ করে তাঁরা মনে করলেন যে তাঁরা আরও একটা খুব বড় জিনিষ পাবেন সেটা হচ্চে "সত্য"। জ্ঞানকেই তাঁরা সত্য বলে বুঝেছিলেন তাই সত্যের আকর্ষণে সত্যের জন্য তাঁরা সব ছেড়ে দিতে লাগলেন। একদিন সত্যের জন্য সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে তাঁরা চিরকালের জন্য ধন্য ধন্য হয়ে গেছেন। তাঁরা বীর ছিলেন; অস্থি মাংস মজ্জা শুকিয়ে লয় পেয়ে থাক্, শরীর জীর্ণ কঙ্কালাবশেষ হয়ে যাক্, তবু সত্যকে ছাড়া হবে না। সত্যকে যেমন করে হোক্ পেতেই হবে; সত্যের জন্য যে মানুষ এত ত্যাগ কর্‌তে পারে তা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কেউ কখন

দেখেছিল কিনা সন্দেহ। একি সহজ কথা! সব ছেড়ে দিয়ে শুধু সত্যকে সাম্‌নে রেখে চিরকার দৌড়ব। এ বীরত্বের মহত্ত্ব কে ব্যাখ্যা করতে পারবে? মানুষ যতদিন সত্যকে আদর করতে জানবে, যতদিন তাদের কণ্ঠ থাকবে ততদিন তারা তাঁদের জয় গান সমস্ত পৃথিবীতে উচ্চকণ্ঠে গাইবেই গাইবে। তাঁদের ত্যাগধর্ম্ম চিরকালের জন্য তাঁদের অমর করে রেখেছে, আমরা বলে বলে কেবল তার পুনরুক্তি করছি মাত্র।

সত্য জিনিষটার সীমানা থেকেও নাই; এমন একটা জায়গা নাই যেখানে এসে কেউ বল্‌তে পারে যে আমি এখন সত্যকে বুঝে শেষ করে ফেলেছি। সত্যকে যতটা বুঝবে ততই দেখবে যে বুঝতে পার নাই। যত সত্যকে পাবে তত সে আরও দূরে যাবে এবং যতই তুমি ছুটে যাবে, ততই সে আরও সরে যাবে, আর তুমি আরও তাকে পেতে চাবে, এমনি করে সে ক্রমশঃই তোমাকে তার আপন গভীরতার মধ্যে টেনে টেনে নিয়ে যাবে। তুমি যতই যাবে ততই দেখবে যে পথের আর শেষ নাই, বরাবর পথ চলে গেছে; কোথায় যে গেছে তা সে পথই জানে আর বলে দিতে পারে। কোনও একটা কিছু দিয়ে যদি সেটাকে গণ্ডী দিয়ে দিতে পারি যে এর ওপারে আর নাই, তবে সেটা সত্যই নয় বরং তার বিপরীতটা। যদি কোনও একটা বাঁধন দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতুম যে এই পর্য্যন্তই সত্য তবে নিশ্চয়ই আমার একথা বলা হোত যে বাঁধনের ওপারে আর সত্য নাই, তাহলে আর সেটা

সত্যই বা হোত কেমন করে। সত্য যে, তাকে ত কেউ রুখে রাখতে পারবে না, যে পড়ে থাকল যার সম্বন্ধে বলতে পারলাম যে সে এই পর্য্যন্ত এর ওপারে আর নেই, সে সত্য হবে কেমন করে? সে'ত সকল জায়গায় নেই, যে সকল জায়গায় নেই সে'ত বাধা হোল, সত্য ত তাকে উল্লঙ্ঘন করে যাবে, বাধা যে সেই কেবল বাঁধা হয়ে থাকে ছোট হয়ে থাকে যাতে সত্য তাকে উল্লঙ্ঘন করে যেতে পারে; সত্য যে, তার অনিরুদ্ধ প্রসার। তাই বলছিলাম যে এমন কেউ নেই যে বল্‌তে পারে আমি সত্য দেখেছি, সত্য এতটুকু। যেই বলেছে যে সত্য এতটুকু সেই বুঝলাম যে সে সত্যকে বাধার মধ্য দিয়ে দেখেছে সমস্তটা দেখে নাই। সত্য তার কাছে সমস্ত অঙ্গের আবরণ খুলে দেয় নাই যতটুকু দেখেছে তাই নিয়েই সে বল্‌ছে যে আমি সত্যকে জানি সেটা অমুকটা তার প্রসার এতটা। যাঃ যেখানে আছে সবই সত্য। সত্যকে বাদ দিয়ে কিছুরই হবার যো নাই। এমন যে বাধা, যাকে না কি আমরা* বলি যে সে খাট, সে সত্যকে রুখে, সেও সত্য। সত্য যদি বাধাই না হতেন তবে বাধাটাই বা আসে কোথা থেকে? বাধার বাইরেই সত্য একথা যদি বল্‌তে যেতুম তবে সেইখানেই আমার সত্যকে ঠেকিয়ে রাখা হোত, সত্যের স্বভাবটা আমাদের বোঝবার গণ্ডীর ভিতর থেকে অনেক বাইরে গিয়ে পড়ত। বাধা যে সেও সত্যেরই বাধা, সে সত্যেরই আবরণ। সত্য নিজেকে ফোটাবার জন্ম বাধাকে নিজের গায়ের ভিতর থেকে বের

ক'রে দিয়েছে, তাই বাধা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেই সেখানে সত্যের প্রকাশ হয়। বাধার সাম্‌নেই সত্য নিজেকে একটু একটু করে নিরাবরণ নিরাভরণ করে, তাই সত্যকে খুলতে গেলেই বাধা চাই। তোমার শক্তি অল্প তুমি খুব বড়াই করছ, লোকে জানতে পারছে না তোমার সামর্থ্য কতটুকু, যেই বাধা এলো তোমার জারি জুরি ফাঁক হয়ে গেল। তোমার যতটুকু সামর্থ্য সত্য ছিল তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল। তোমার গায়ে কতটা জোর আছে ঠিক পাচ্ছ না, একটা ওজন তুলতে গেলে, ওজনটাও মাটি হতে উঠতে চায় না, তুমিও চাও তাকে মাটি থেকে তুলতে; তাতেই ওজনটা তোমাকে বাধা দিতে লাগল; তোমার যতটুকু জোর তাও প্রকাশ হয়ে পড়ল। এ যেমন ছোট ছোট বিষয় নিয়ে একটা বুঝতে চেষ্টা করলুম তেম্‌নি সকল বিষয়েই কথাটা খাটবে। এম্‌নি যে বাধা সে বাস্তবিকই সকল সময়ে সত্যকেই ফুটিয়ে দেয়, তাই তার কাজ, তাই সেও সত্যের অবয়ব।

তাই আমাদের পূর্ব্বতনেরা যখন ভাবলেন যে জ্ঞানই সত্য আর তার আকারগুলো সবই মিথ্যা একেবারে সত্যের বাইরে, তখন তাঁদের একটা মস্ত ভুল হোল; তাঁরা দেখতে পেলেন না যে আকার গুলোর মধ্য দিয়েই জ্ঞান ফুটে উঠছে, আকারগুলো বাদ দিয়া শুধু জ্ঞানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; অবশ্য একথাটা তাঁরা খুব ঠিকই বলেছিলেন যে একটা আকার বদলে আর একটা আকার হয়, কিন্তু তাই বলে তাদের মিথ্যা বলা চলে না। জ্ঞানের

একটা আকার বাদ দিলে আর একটা আকার হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানকে কি কখনও আমরা আকার ছাড়তে দেখেছি? স্বীকার করলুম মাটির, কলসীর আকারটি গিয়ে হাড়ীর আকার হয়েছে, আবার সেটা গিয়ে হয় ত সরার আকার হবে, কিন্তু তাই বলে কি আমি একথা বলতে পারি যে মাটিকে কখনও আমরা এমন অবস্থায় দেখেছি যখন তার কোনও আকারই ছিল না। যখনই মাটি ছিল তখনই তার কোনও না কোনও একটা আকার ছিল, একেবারে কোনও আকারই নাই এমন অবস্থায় আমরা কখনই মাটিকে দেখি নাই। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি, একটি জ্ঞেয় গিয়ে আর একটি জ্ঞেয় আসে, একটা জ্ঞাতা গিয়ে আর একটা জ্ঞাতা আসে বটে, কিন্তু জ্ঞাতা জ্ঞেয় ছাড়া ত কখনও জ্ঞানকে দেখি নাই। আমি দেখেছি বটে যে আমার বইয়ের জ্ঞানটা বদ্‌লে টেবিলের জ্ঞান হয়, কলমের জ্ঞান হয়, দোয়াতের জ্ঞান হয়, কিন্তু কিছুরই জ্ঞান হয় না এমন কি জ্ঞানের কোনও অবস্থা দেখেছি? একটা না একটার জ্ঞান হয়ই হয়। এমন কখনই দেখা যায় না যে জ্ঞান রয়েছে অথচ তার কোনও একটা বিষয় নাই। সেই বিষয়গুলিই হল জ্ঞানের আকার। তবেই একটা আকার বদলে আর একটা আকার হয় বটে কিন্তু আকার ছাড়া ত কখনও জ্ঞানকে দেখি নাই, আমরা কল্পনাই করতে পারি না যে জ্ঞান আছে অথচ তার কোনও জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নাই; যেখানেই জ্ঞান দেখা গিয়াছে সেখানেই তাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সহিত

জড়িত হয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, তাদের ছাড়িয়ে কখনও জ্ঞানকে দেখা যায় নাই। কাজেই যদিও কোনও রকমে জোর করে কল্পনাও করতে যাই যে এমন একটা অবস্থা হতে পারে যখন শুদ্ধ জ্ঞানই থাকবে আর কোনও জ্ঞাতাও থাকবেনা কিম্বা জ্ঞেয়ও থাকবেনা তা হলেও আমরা কখনই স্বীকার করতে পারব না যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় গেলে বাকী যদি কিছু পড়ে থাকে তবে সেটাকে কোনও রকমে জ্ঞান বলা যেতে পারে। সেটাকে কি নাম দিবে তা জানি না, কিন্তু তাকে জ্ঞান বলতে যা বুঝি তা বলতে পারব না। আর যদি বাস্তবিক আকারটা জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্নই হোল তবে জ্ঞানের সঙ্গে তার সঙ্গে একটা সম্পর্কই বা হোল কি করে, কে তাদের সম্পর্ক ঘটিয়ে তুল্লে। প্রাচীনদের মনেও যে একথাটা একেবারে না উঠেছিল তা নয়; খুবই উঠেছিল এবং তাঁরা জ্ঞানের আকার জিনিষটা যে কি তাই নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শেষটা যখন আর কূল কিনারা পেলেন না তখন বল্লেন, বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞানই সত্য, তাই মাত্র আমরা জানি তার আকারটা যে কি তা আমরা জানিনা তাই তাঁরা আকারটার নাম দিলেন **জানি না বা অবিদ্যা**। যখন আকারটা কি তা তাঁরা জানি না বলেন তখন সেই দিক্ দিয়ে অনেকটা লেঠা তাঁরা চুকিয়ে দিবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আকারের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কি জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট উত্তর দিতে লাগিলেন, যে, যখন আকারটাকেই আমরা জানি না বলেছি, তখন সেই "জানি না"-

টার সম্বন্ধে যত কথাই তুমি জিজ্ঞাসা করবে তা আমি বলতে পারব না।

জানি না-সম্বন্ধে সকল কথাই অনির্বাচ্য, কাজেই "জানি না" বা অবিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের যে সম্বন্ধ তাও অনির্বাচ্য। সম্বন্ধ আছে কিনা তাও বলতে পারেন না। তাই বলিতে লাগিলেন হাঁ সম্বন্ধ আছে বটে, নাইও বটে। সম্বন্ধটা যখন জানি না তখন সম্বন্ধটা ঠিক কি ভুল তাও বল্‌তে পারি না। "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ম্"। এই "জানি না" বা অবিদ্যাকে তাঁরা গিলিয়া ফেলিবেন না উদ্গীরণ করিবেন তার কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অবিদ্যাটাকে মিথ্যা বলতে লাগ্‌লেন অথচ সেটা ছাড়া এই সমস্ত জাগতিক ভেদের উপপত্তিও করে উঠ্‌বার কোনও বন্দোবস্ত করে উঠতে পারলেন না। কাজেই জাগতিক সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সেই অবিদ্যাটাকে টেনে টেনে আনতে লাগ্‌লেন এবং সেই অবিদ্যা এবং জ্ঞান এই দুটার সহযোগেই এই সমস্ত জাগতিক ভেদ ঘটে উঠছে এটা বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। জগৎকে মিথ্যাই বলুন আর যাই বলুন এটাতো মানতেই হোল যে এর মধ্যে একটা কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা আছে একটা নিয়ম আছে, অথচ সে নিয়মটা, তাঁরা যেটাকে সত্য বলেছেন সেটা দ্বারা ঘটিয়ে উঠাতে পারলেন না, কাজেই সেই নিয়মটাকে খাটিয়ে তোলার জন্য যে শক্তিটা দরকার সে শক্তিটাকে ও তাঁদের মানতে হোল এবং সে শক্তিটাকে ঐ

"জানি না" বা অবিদ্যার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বল্লেন ওটার নাম মায়াশক্তি। এবং এই সঙ্গে সঙ্গেই যে অবিদ্যাটা পূর্ব্বে একটু অভাবাত্মক বা negative গোছের ছিল সেটাও যেন ক্রমশঃ positive বা ভাবাত্মক হয়ে উঠল। আগে যেন অবিদ্যাটাকে কতকটা এই ভাবে বলা হোত যে সে যেন "জানার" বাইরের একটা কিছু। জ্ঞান যেটা, সত্য যেটা, সেটা নয়; আর একটা কিছু, কি তা জানা নাই, কাজেই এরকম ভাবের বোঝাটা যেন কতকটা negative রকমের ছিল। ক্রমশঃ সেই অবিদ্যাটা একটা ভাবাত্মক positive শক্তি হয়ে দাঁড়াল। আর সে শক্তিটার সহিত জ্ঞানের সহযোগে, জ্ঞানের সঙ্গে, তার সংক্রমণে যেন এই বহুধা বিচিত্র জগৎ ফুটে উঠ্‌ল। সত্যকে তাঁরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করতে পারেন নাই। কিন্তু সত্য এক রকম করে তাকে স্বীকার করিয়ে নিয়েছে সে ছাড়ে নাই; না মান্‌তে গিয়েও তাকে ব্রহ্মের বা সত্যের সমানই একটা সত্তা দিতে হয়েছে। এমন কি শেষে এ পর্য্যন্তও বলেছেন যে মায়াটা ব্রহ্মের বা জ্ঞানেরই শক্তি। এই যে ব্রহ্ম বা জ্ঞান, তিনি মায়া ছাড়িয়ে থাকলেও মায়াকে ছাড়া ফুটতে পারেন নাই। মায়ার মধ্য দিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে এবং এই মায়ার মধ্য দিয়েই বহুধা বিচিত্র জগৎ ফুটে উঠেছে। তিনি যে আমার কাছে প্রকাশ হবেন তাও এই মায়ার মধ্য দিয়াই। আর এই মায়াটাও যখন তাঁরই শক্তি, তখন তাঁর থেকে

এটা একেবারে ভিন্ন হলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কেই বা আসে কি করে তাকে বাধাই বা দেয় কি করে। ব্রহ্ম বা সত্যকে একেবারে পরিনিষ্পন্ন, নিষ্ক্রিয়, তটস্থ ও নিশ্চল বলতে গিয়েই এত গোল বেধে গেল। সত্য যে ক্রিয়াস্বরূপ তিনি যে নিজকে ফোটাতে ফোটাতেই যাচ্ছেন এ কথাটা না বুঝে তাঁকে একেবারে নিশ্চল বলে যেই একেবারে স্থির করে ধরা গেল, তখনই তার যে বাস্তবিক স্বরূপ, তার যে সেই চল স্বভাব সেটা রুখে দাঁড়াল। রুখে দাঁড়িয়ে, কোনও রকম না কোনও রকম করে তাঁদের মুখ দিয়েই সে তাকে মানিয়ে নিলে। স্পষ্টতঃ তাকে দেখতে পেলে, স্পষ্টতঃ তাকে মান্‌লে অনেক গোলমালের হাত থেকে বাঁচা যেত, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে তাঁকে স্পষ্টতঃ মানা হোল না, তখন তিনি ভাবলেন যে স্পষ্টতঃ না মানিলেও তোমাকে দিয়ে আমি মানিয়ে নেবই নেব, ছাড়ব না এবং এক ভাবে না এক ভাবে সেই তাঁকে মানতেই হোল। কিন্তু এতেও তিনি ছাড়লেন না যতদিন স্পষ্ট করে তিনি না মানিয়ে নিতে পারবেন ততদিন তিনি ছাড়বেনও না। তাই তিনি এর পরেই রামানুজের ভিতর দিয়ে বলালেন যে, মায়াটা মিথ্যা নয়, তাঁরই শক্তি। জীব জড়জগৎ এবং ঈশ্বর এই সমস্তই সেই ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ ঈশ্বরেরই অবয়ব বা দেহ। জীবও সত্য, জড়ও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। সত্যব্রহ্ম বলতে কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না। যেমন বেল বলতে তার খোসা তার বীচি সবগুলো জড়িয়েই বলা যায়,

কোনটাকে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি সত্য বলতে কোনটাকে বাদ দেওয়া চলবে না। জীব, জড়, ঈশ্বর এ সমস্ত নিয়েই তিনি। কিন্তু এর মধ্যে একটা দোষ রয়ে গেল এই, যে, এখানেও সত্যকে বাস্তবিক ক্রিয়া স্বরূপের মধ্যে দেখা হোল না। ঈশ্বর যেন একটা সিদ্ধ পরিনিষ্পন্ন নিশ্চল বস্তুর মতনই র'য়ে গেল, এবং তার অবয়ব গুলোও যেন কাটা কাটা রকমে যে যার জায়গায় নিশ্চল হয়ে র'য়ে গেল, তিনিই যে ফুটে এই সব হয়েছেন, এবং আপনার চেষ্টায় ফুটতে ফুটতেই চলেছেন, কাজেই তিনি যে গুণের মধ্য দিয়ে ফুটে সগুণ হলেও নির্গুণ, রামানুজ যেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। সত্যকে যা তিনি দেখেছেন তার মধ্যেই এনে আটক করে ফেল্‌লেন। তিনি তাঁর দেবতাকে সগুণ বলেই বুঝলেন, এবং তাঁর গুণগুলি আমরা গুণে উঠতে পারি না ব'লে 'অসংখ্যেয় কল্যাণ গুণগণ' এই বলে তাঁর মহত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লেন ; কিন্তু অনন্তকে আমার গুণতে পারা না পারা দিয়ে তাঁর অনন্তত্বের নির্ণয় করব এটা যে একটা নিতান্ত হাত গড়া উপায়। আমি যে কত ক্ষুদ্র ! আমি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর একটা ইয়ত্তা বা কল্পনা করে উঠতে পারব না সেটা আর একটা বেশী কথা কি ? আমি একটা জিনিষ গুণে উঠতে পারব না বলেই কি সেটায় অনন্তত্ব প্রমাণ হয়ে গেল ? তাঁর স্বভাব থেকে যদি তাঁর অনন্তত্ব না বের করা যায়, যদি এটা না বোঝান যায় তাঁর যা যথার্থ স্বরূপ তা কল্পনা করতে গেলেই তাঁকে কোনও জায়গায়

বেঁধে রাখা চলে না তা না হ'লে ত তাঁর অনন্তত্ব কিছুই বোঝান গেল না। আমি বুঝতে পারি না সেইটুকুই যে অনন্তের পরিমাণ, সে অনন্ত ত আমার দুর্ব্বলতার ভারেই নিপীড়িত হয়ে রয়েছে। যার স্বাভাবিক সবলতা নাই, যে আমারই তুলনায় সবল, সে'ত প্রায় আমারই মতন দুর্ব্বল, কাজেই এখানে দেখা যাইতেছে যে সত্যকে বড় কর্‌তে গিয়েও বড় করা যায় নাই সে সঙ্কুচিত হয়ে র'য়েছে। যে সমস্ত খণ্ডের মধ্য দিয়ে সে নিজকে ফুটিয়েছে সে যেন তাদেরই ভারে খাট হয়েছে। সত্যের বাস্তবিক স্বরূপ না বুঝতে পেরে তাকে কেবল মাত্র সগুণ বলে ধরা গেছে বলেই এত মুস্কিল। সত্যকে যেন পঙ্গু করে রাখা হয়েছে কাজেই তাকে যেখানে রাখা গিয়েছে সেখান থেকে তাকে না সরালে তার আর উঠে হেঁটে বেড়াবার যো থাকবে না। রামানুজ তাকে এই সমস্ত ভেদের মধ্যে, সগুণের মধ্যে রাখলেন আর সেও সেইখানেই র'য়ে গেল।

সে যে সগুণত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে তা সে পারলনা তার মধ্যেই র'য়ে গেল। কাজেই বাস্তবিক সত্যের সন্ধান হোল না। রামানুজ এটা ঠিক ধরে ছিলেন যে যা কিছু দেখছি তা সমস্তই সত্যের অবয়ব তা সমস্তই সত্য। তারা মিথ্যা নয়। কিন্তু এটা তিনি বুঝে উঠতে পারলেননা যে কেমন করে তারা সত্য হোল। বাস্তবিক তত্ত্বের দিকে তিনি যে অনেকটা এগিয়েছিলেন সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যেতে পারেনা; অচিৎ, চিৎ এবং ঈশ্বর

তিনটিই তাঁর বিভাগ, এতে যেন মনে হয় এরা সব তাঁর অবয়ব হলেও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। আর সত্য যে সে এ তিনটি নিয়েই। যেন একটা আদি, একটা মধ্য, আর একটা অনন্ত। কিন্তু এই ভাবের কল্পনায় একটা এই দোষ রয়ে গেল যে অন্ত বলে যেটাকে কল্পনা করা গেল, সেটা সেই খানেই র'য়ে গেল, তার আর তাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় থাকল না। কাজেই সে যেন সেখানে এমন একটা বাধার মধ্যে এসে পড়ল যার থেকে সে সহজে উঠতে পারবে না। সেই খানেই তার একটু গোল বেধে গেল। সে যে সকল গুলির মধ্যে এমন করে আনা গোনা করবে যাতে তার কোনও জায়গাকেই আদি কি মধ্য বলার যো থাকবেনা, সেটি আর ঘটে উঠতে পারলনা। কাজেই তাঁর স্বাভাবিক অনন্তত্বটুকু আর থাকলনা, তাঁর অনন্তত্ব যেন ধার করা অনন্তত্ব হয়ে পড়ল, আমারই কল্পনার চক্ষে অনন্ত হোল। কাজেই তিনি আমারই গণ্ডীর মধ্যে পড়ে থেকে আমারই মতন ছোট হয়ে পড়লেন। তাই রামানুজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে ঠিক ফোটাতে না পেরে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া ও পরিশেষে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মধ্য দিয়ে আপনাকে ফোটাতে চেষ্টা করলেন। তাঁর অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে, তিনি সত্যকে দ্বৈত কি অদ্বৈত, এর একটার মধ্যেও নির্ব্বাচন করা যায়না এই পরম সার কথাটি জগৎকে শুনিয়ে দিলেন। তিনি বুঝলেন না যে সত্য দ্বৈতও বটে, এবং অদ্বৈতও বটে ; কোনও একটার মধ্যে

সত্যকে রুখে রাখা যায়না। দ্বৈতের মধ্যে রুখতে গেলে সে অদ্বৈতের মধ্যে গিয়ে পড়ে আর অদ্বৈতের মধ্যে রুখতে গেলে সে দ্বৈতের মধ্যে এসে পড়ে। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মধ্যেও এই অসীম ও সসীমেরই মিলনের কথাটি নানা রসে রহস্যময় হ'য়ে র'য়েছে। একই অদ্বয় থেকে রাধাকৃষ্ণ বেরিয়ে এসেছেন, এবং তাঁদেরই রাসযাত্রায় ব্রজকুঞ্জ ভরপুর। ব্যক্ত অব্যক্তের কি অদ্ভুত মিলন! "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে", রাধিকা কৃষ্ণেরই অপেক্ষা করেন; কৃষ্ণও কুঞ্জে কুঞ্জে রাধিকারই প্রেম ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। কুঞ্জে কুঞ্জে তিনি বাঁশী বাজান, আর ঘরে ঘরে গোপিকারা সমস্ত গৃহকাযের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যেই তাঁর বাঁশী বজে, অমনি তারা "চমকিত মন চকিত শ্রবণ" হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের মন কোথায় উধাও হয়ে যায়, কলের মতন কায করিতে থাকে, পদে পদে ভুল হইতে থাকে। স্তনকুঙ্কুম দিয়া কাজল পরিতে যায়, আর কাজলের কালি স্তনে মাথাইয়া ফেলে। তারপর মঞ্জুল বঞ্জুল বনপথে কৃষ্ণসলিলা যমুনায় জলবিহার। গোপিকারা তাঁকে প্রাণ ভরে ভাল বাসে, কিন্তু তখনও যেন নিরলঙ্কার নিরাভরণ হইতে প্রস্তুত নয়, তাই তিনি তাঁদের বস্ত্র কাড়িয়া লইলেন, সব লজ্জাভয় কেড়ে নিয়ে যেন তাদের অন্তরঙ্গ করে নিলেন; তার পর আর কত বলিব! প্রতি নিশায় রাস আর ঝুলন—যত বলিব আর ফুরাইবেনা। ইহার তত্ত্ব ভাল করিয়া বলিতে গেলে পৃথক প্রয়াসের প্রয়োজন, তাই এখানে কেবল কথাটার নির্দ্দেশ মাত্রই করিয়া

গেলাম। তাই বলিতেছিলাম যে সত্যকে না মানিলেও সে কোনও রকমে মানাইয়া লইবে, লাভের মধ্যে কেবল সাজা পাইতে হইবে। তাই যখন সত্যকে আমরা দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে স্বীকার করি নাই, তখন সে আমাদের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যেই নানারূপ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে আপনাকে মানিয়ে নিতে লাগ্‌ল এবং তারই ফলে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকবাদও দাঁড়াতে লাগল।

দার্শনিক হিসাবে সত্যের ধারণা অনুসারেই তাঁহাদের বাহিরের ব্যবহারিক জীবন তাঁরা চালিয়েছিলেন। কাযেই এটা যদি স্বীকার করা যায় যে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ঠিক সত্যকে কল্পনা করা হয় নাই এবং তার যথার্থ স্বভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখাতে তাকে অবজ্ঞাই করা হয়েছে তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে সেই দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে বাহিরে যে ভাবে জীবন কাটান গিয়াছে তাতেও সত্যকে অবহেলা করা হয়েছে, অপলাপ করা হয়েছে। দার্শনিক মতের মধ্যে অস্বীকার করাতে দার্শনিক মতের বিপ্লব ঘটে উঠেছিল আর প্রকৃতির সহিত বাস্তবিক ব্যবহারের সময় তাকে স্বীকার না করাতে বাহিরের বিপ্লব ঘটে উঠল। তাঁরা জড়কে না মেনে বনে গেলেন, সেখানে নিরিবিলির মধ্যে যোগাসনে বসে নব-দ্বার রুদ্ধ করে খালি জ্ঞানকেই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে লাগলেন ; জড়ের মধ্য দিয়েও যে সত্যই ফুটে উঠ্‌ছে, জড়ও যে সত্যেরই অবয়ব তা তাঁরা স্বীকার করলেন না। কাজেই দেশে জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চাও বন্ধ হয়ে গেল, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, যুদ্ধ

প্রভৃতি সমস্তই তিরস্কৃত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কচিৎ কখন কেউ কেউ তাদের চর্চ্চা ক'রত মাত্র। কাজেই দেশে তাদের সঞ্চার ক্রমশঃ বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল, এবং বিদেশীয়েরা যখন সেই সব বিজ্ঞানের বলে এসে আমাদিগকে আক্রমণ করতে লাগল তখন আর আমরা পথ খুঁজে পেলাম না। যে বিদেশীয় এসেছে সেই ভারতবর্ষকে হটিয়েছে। কেন হটিয়েছে? কারণ বিদেশীয়েরা জড়কে সত্য বলে মনে করতেন, এবং জড় শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখতেন; আমাদের দেশের মনীষিরা জড়ের মধ্যে তাকে মানতেন না, তাই জড় শক্তির দিকে দৃষ্টিও তাঁদের ছিলনা। সত্যের একটা দিক্ তাঁরা দেখেন নাই, একটা দিক্‌কে তাঁরা অস্বীকার করে ছিলেন, তাঁরা জ্ঞানের মধ্যেই সত্যকে মেনে ছিলেন জড়ের মধ্যে সত্যকে দেখতে পারেন নাই; কিন্তু সত্য তা শুনবে কেন, তাকে যেদিক্ দিয়ে মানা হয় নাই সে সেই দিক দিয়েই আক্রমণ আরম্ভ ক'রল। যে বিদেশীয় আসিতে লাগিল সেই আসিয়া ভারত জয় করিতে লাগিল। আমরা তাহাদের অধীন হইয়া পড়াতে আমাদের শরীর ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িতে লাগিল, শরীরের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ মনের মধ্যে সংক্রমিত হইতে লাগিল। কারণ সত্য হচ্চে জ্ঞান এবং জড় এই দুইকে নিয়ে; তা তুমি — টাকে বাদ দিয়ে একটাকে নিয়ে যতই বাড়াতে চাও পারবে না। তোমার শরীরটাকে একেবারে অবহেলা করে কেবল যদি মনটাকেই বাড়াতে চাও, তবে ফল হবে এই যে কিছুকাল বাড়িয়ে আর শেষে

পারবেনা, মনও জীর্ণ হয়ে আস্‌বে, কারণ শরীর ও মন একত্র গ্রথিত তাই তুমি একদিকে মনকে বাড়াতে চেষ্টা করলেও আর একদিকে হু হু শব্দে ক্রমে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে, কাযেই মনও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌বে। অনেকের হয়ত ছান্দোগ্য উপনিষদের গল্পটা মনে আছে যে পনের দিন না খাওয়ার পর শ্বেতকেতুকে যখন তার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু একটা কথাও বলতে পার্‌লেন না ; অথচ তার সমস্ত বেদ ইতিপূর্ব্বে কণ্ঠস্থ ছিল। তার দেহের দুর্ব্বলতা এসে তার মনকে আঁকড়ে ধরে ছিল তাই তিনি উত্তর করতে পার্‌লেন না। এখানেও ঠিক সেই রকম হ'য়ে পড়ল। জড়ের দিকে আক্রমণের ফলে যেই শরীর জীর্ণ হয়ে পড়্‌তে লাগল, অম্‌নি তাঁদের এত যে জ্ঞান তৃষ্ণা তাও যেন কোথা থেকে লোপ পেয়ে যেতে লাগল। আর আক্রমণের উপর আক্রমণ, আমাদিগের সাম্‌নে সকল সময়েই এই কথাটা জানিয়ে দিতে লাগ্‌ল যে আমরা ভুল করেছি, জড়ও সত্য ; তাকে অবহেলা করা যায় না, এবং করাও উচিত না। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা এটা বুঝিতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত ধাক্কার উপর ধাক্কা আমাদের উপর আসতেই থাকবে। নিপীড়নে নিপীড়নে জড় আমাদিগকে বুঝিয়ে দেবেন যে তিনি আছেন, তাকে হেলা করে ঠেলে ফেল্লে তিনি যাবার জিনিষ ন'ন ; তাকে অস্বীকার করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। তাই আজ বিদেশীয়দিগের অতুল জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে উপহাস করে বলেছে, 'কি হে আমাকে তোমরা

অস্বীকার করেছিলে, কিন্তু তাই বলে কি আমি অস্বীকৃত হয়ে থাকব যারা আমাদের কোলে তুলে নিলে আমরা তাদের কাছে গেছি, আর তোমরা আমাদের স্বীকার কর নাই বলিয়া তোমাদের আজ এই দুর্গতি।' সত্য বাস্তবিক এমনি করে বাধার মধ্য দিয়া নিজকে সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করে আবার সেই বাধাটিকে পার হয়ে গিয়ে নিজকে আর একটু প্রশস্ত ভাবে প্রকাশ করে। এমনি করেই চলতে থাকে। বাধার পর বাধা এবং প্রতি বাধায়ই একটু একটু করিয়া নিজকে প্রকাশ; কোন বাধাই তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। সকল বাধাই সে অতিক্রম করে এবং প্রতি অতিক্রমণেই সে দেখিয়ে দেয় যে সে সত্য, তাকে কেউ ঠেকিয়ে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। সত্য এবং বাধা এ দুটা জিনিষ যে একেবারেই ভিন্ন, তা নয়। বাধা যে, সেও একরূপ সত্যেরই স্বরূপ। সত্যকে তুমি যেখান থেকেই দেখ না কেন, তুমি দেখতে পাবে যে বাধা তার শরীরের সঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে। সত্যের যেখানে যতটা প্রকাশ, তার মধ্যের বাধাও ঠিক ততটুকু। কারণ যতটা তার প্রকাশ ততটার মধ্যেই সে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, বাঁধা পড়ে গিয়েছে। একদিক্ দিয়ে দেখলে যাকে সত্য বলে দেখব আর এক দিয়ে দেখতে গেলে তাকেই বাধা বলে দেখ্‌ব।

তাই প্রকাশের দিক্ দিয়ে এবং বাধার দিক্ দিয়ে এই দুইদিক্ দিয়ে না দেখলে সত্যকে ঠিক বুঝে উঠা যায় না। একটা জিনিষ বুঝতে হলেই, সেটা কি, তাও যেমন বুঝতে হয়, তেমনি সেটা

যে কি নয় তাও বুঝতে হয়। তবে জিনিষটা বোঝা যায়। দুদিক দিয়ে না বুঝলে জিনিষটাই বোঝা হয় না। তাই ইংরাজীতে বলে differentiation না হলে, knowledgeই হয় না। সত্যকে তুমি যেখানেই ধর না কেন দেখবে যে সে তার বাধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে র'য়েছে। সত্যের স্বভাবই এই যে সে আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফোটাতে ফোটাতে যাবে; আর এই জগৎ যা দেখচি সমস্তই হচ্চে সত্যের স্বরূপ। তাই জগতের যে স্তরে, যে জায়গায়, যতই আমরা হাত দিই না কেন, আমরা দেখতে পাব যে তার সঙ্গে বাধা জড়িয়ে র'য়েছে; কারণ সকল জায়গাতেই আমরা সত্যের প্রকাশ দেখতে পাই। চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে এত ভেদ এবং বৈচিত্র্য র'য়েছে, তাহাতেই আমাদের কাছে সত্যের প্রকাশের একটা পরিমাণ বুঝিয়ে দিচ্ছে, এবং সেই জন্যই আমরা সেগুলিকে সত্যের বাধা বলি। সত্য সকল সময়েই এগুলি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়, কারণ সত্যকে সকল সময়েই চলতে হবে, কোনও জায়গাতে এসে থেমে গেলেই তার হার হোল, সে সত্য হোতে পারল না; তাই সত্য তার শরীরের সঙ্গে এমনি করেই বাধাকে জড়িয়ে নিয়েছে, যে সে তার নিজের অমরত্বের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাধাকেও অমর করে রেখেছে। সেই বিরাট্ থেকে যদি আমরা আরম্ভ করি তবে দেখতে পাব যে সেই বিরাটের সত্তা বা সত্যও যতটুকু, তার

বাধাও ঠিক্ ততটুকু। সে সত্যটাও যেমন তখন পরিস্ফূর্ত্তির পথে চলেছে, তার বাধাটাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ পরিস্ফুট হ'তে আরম্ভ করেছে। সত্যও বাধাকে অতিক্রম করিতে লাগ্‌ল এবং বাধাও তার নূতন নূতন মূর্ত্তিতে সত্যকে রুখে রুখে দাঁড়াতে লাগ্‌ল, আর হটে হটে যেতে লাগ্‌ল, আবার আসতে লাগ্‌ল, আবার হটতে লাগ্‌ল। এমনি করে বাধা ও সত্যের সংগ্রামে সত্যেরই মহিমা জয়যুক্ত হয়ে উঠতে লাগ্‌ল, তিনিই বহুধা বিচিত্র হয়ে উঠতে লাগলেন।

একটা কোনও বস্তুকে যদি আমরা মনে মনে বিশ্লেষ করে দেখি তা হলে আমরা দেখতে পাব যে তার মধ্যে সত্যটা বা প্রকাশটা যে তার চারিদিকে কতগুলো বাধা নিয়ে আছে তা স্পষ্টতঃ সেইভাবে আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই না। তার হয় ত কোনও একটা রূপ আছে, অনেকগুলো গুণ আছে, একটা আয়তন আছে, একটা ওজন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কি আছে সে গুলিই আমাদের চোখে পড়ে। এই যে বস্তুটির রূপ, তার গুণ, তার আয়তন, তার পরিমাণ বলে আমরা যা যা বুঝ্‌তে পারচি সেগুলি সবই হোল বস্তুটির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বাধা। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন বস্তুটি বুঝি ভিন্ন রকমে বাড়্‌তে চেষ্টা করেছিল, আর তার প্রত্যেক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আবার চেষ্টার অনুরূপ বাধাও ছিল। বস্তুটি বাধাগুলি অতিক্রম কর্‌তে চেয়ে স্তরে স্তরে যেমন যেমন অতি-

ক্রম করেছে, তেমন তেমন আবার আবার ঘন ঘন বাধা এসেছে এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বাধার সঙ্গে সঙ্গে ঠেকে ঠেকে বহুধা বিচিত্র হয়ে উঠেছে। যতই কোনও জিনিষকে উত্তরোত্তর বিচিত্র হতে দেখা যায় ততই জানা যায় যে সে বাধার ভিতর দিয়ে তত বেশী এগিয়েছে। যে যত বাধার ভিতর দিয়ে এগিয়েছে বাধার সঙ্গে বিরোধে বিরোধে তাকে ততই আপনাকে খুলে দিতে হয়েছে, বিচিত্র হতে হয়েছে। সত্য তাঁর নিজেরই দেহের মধ্যে বাধাকে রেখে দিয়েছেন, তাই তিনি সকল সময়েই বাধার সঙ্গে বিরোধে আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সার্থক করে তুল্‌ছেন। সত্যের স্বভাবই এ নয় যে তিনি কোথাও স্থির হয়ে থাক্‌তে পারেন। তিনি ক্রিয়াস্রোতের পরমার্থ সম্পত্তি, তাই তাঁকে আমরা যে অবস্থায়ই পেতে চাই না কেন, যে অবস্থায়ই আমরা তাকে স্পর্শ করতে চাই না কেন, আমরা দেখতে পাব যে সেই অবস্থাতেই তাঁর নিজের কাছে নিজের একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, খানিকটা যেন পেতে বাকী রয়ে গেছে। যদি বল যে তা হোতে পারে না, সত্যের সত্তার পথে এমন একটা অবস্থা পাওয়া যেতে পারে যেখানে তার যা কিছু পাওয়া বাকী ছিল তা সমস্ত পাওয়া হয়ে গেছে, তবে আমি বলব যে সে হ'তে পারে না কারণ তাহলে সত্য এসে সেই জায়গায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে যাবে, তাতে তার স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কোনও খানে এমন একটা আছে বল্‌তে চাও যেখানে সত্যের

যা কিছু পাওয়া বাকী ছিল তা তার পাওয়া হয়ে গেছে তবে সেটা কেবল সত্যের নিজের স্বরূপের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। সত্য সকল খানে সকল সঞ্চারে কোন সময়ই নিজকে ছাড়িয়ে যায় না। কারণ তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই তিনি ছাড়া যা থাক্‌তে পারে বলে ভাব্‌বে সেটা তাঁর বাধা, তা সে বাধাটাও তার নিজেরই স্বরূপ। তাই সত্য তাঁর সকল রকমের প্রচারের মধ্যে তার নিজের স্বরূপকে ছাড়িয়ে যান না। এই যে জগৎটা তিনি হয়ে রয়েছেন, এ কি উপায়ে? তিনি নিজকে সঙ্কোচ করে করে এক রকম হয়ে রয়েছেন ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে নিজকে বের করেছেন এবং তা হ'তেই জগতের বস্তুজাত এমন বিচিত্র হয়ে রয়েছে। এই যে স্তরে স্তরে সঙ্কোচে সঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন, এর প্রত্যেক স্তরেই তাঁর একটা অবস্থা পাওয়া এবং একটা অবস্থা না পাওয়া ছিল। যেটা না পাওয়া ছিল সেইটার উদ্দেশেই, যেটা পাওয়া ছিল সেটা ছুটেছিল, এবং তখন সেই না পাওয়াটাই ছিল তার বাধা। সত্য যখন সেই বাধাটা পার হ'বার জন্য ছুটল, তখন সেই বাধাটা এসে সত্যেরই শরীরে প্রবেশ করে তাকে পথ ছেড়ে দিল, এবং আবার তখন সত্যের ভিতর থেকে একটা নূতন আকার নিয়ে এসে তাকে রুখে ধরল এবং আবার সত্যের সঙ্গে তার সঙ্গম হল। এমনি করে সত্য বিচিত্র হয়ে উঠলেন, মহামহিমময় হয়ে উঠলেন।

এই যে কথাটা বল্লুম, যে সত্য যে কোনও অবস্থাতেই থাকুক

না কেন, সেই অবস্থাতেই তার একটা অলব্ধ আছে, যেটা না কি তখনও তার কাছে লব্ধব্য, এবং যেটা না কি হচ্ছে তার বাধা। এই কথাটা বুঝতে গেলে আমাদিগকে এই দেখতে হবে যে, সেই যিনি পূর্ণ, যিনি অনন্ত, যিনি এই সব খণ্ড এবং ক্ষুদ্র হয়েছেন, তাঁর পক্ষে, এই ক্ষুদ্রগুলি, এই যে আমরা এত অপূর্ণ এবং খণ্ড, আমরাই তাঁর পক্ষে অপ্রাপ্ত আমরাই তাঁর পক্ষে লব্ধব্য তাই তাঁর জীবনের আমরাই বাধা। আমরা তাঁরই মধ্যে ছিলাম এবং তিনি যে এত বেড়ে চলেছেন সেও আমাদেরই শক্তিতে। আমরাই ছিলাম তাঁর অপ্রাপ্ত, আমরাই ছিলাম তাঁর পক্ষে লব্ধব্য, আমরাই ছিলাম তার অঙ্গের বাধা স্বরূপে। তাই তিনি বরাবর ছুট্‌তে ছুট্‌তে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ বড়র বড়র মধ্য দিয়া এসে, ক্রমশঃ ছোট হয়ে হয়ে আস্‌তে লাগলেন। বিরাট হতে আরম্ভ ক'রে ধাপে ধাপে নামতে এসে আমাতে পৌছালেন, ক্ষুদ্র হলেন, খণ্ড হলেন। খণ্ড হয়েই তিনি দেখলেন যে তাঁর পূর্ণের মধ্যে, বিরাটের মধ্যে যে বাধাটা খণ্ডের দিক্ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল, এবং যেটা তাঁকে এতদিন ক্রমশঃ ক্রমশঃ নামিয়ে এনে এনে খণ্ডে পৌছে দিয়েছিল, সেই বাধাটাই তাঁর খণ্ডের মধ্যে আবার অনন্তের দিক্ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং খণ্ডকে সর্ব্বদাই অনন্ততে টান্‌ছে। অন্তের কাছে অনন্ত যেমন অনন্ত, অনন্তের কাছেও অন্ত তেমনই অনন্ত। তাই অন্ত যেমন অনন্তের দিকে ছুটে যেতে চায়, অনন্তও তেমনি অন্তের কাছে ছুটে নেমে আসে। আগে অনন্ত ছুটে নেমে

এসে অন্ত হয়ে দাঁড়াল, তখন অন্তের জন্ম হল, তারপর অনন্ত আবার তাঁর অনন্তের দিক্ থেকে অন্তকে ডাকৃতে লাগলেন টান্‌তে লাগ্‌লেন। তখন অন্ত তার অভাব, তার দৈন্য, তার অপূর্ণতা বুঝতে পারল। সে মনে করতে লাগল যে আমি যদি অনন্ত থেকেই এসে থাকি তবে আমার মধ্যেও ত সেই অনন্তই রয়েছেন। তবে আমি কেননা অনন্ত হতে পারব, আমার অনন্ত হওয়াই চাই, তখন সে প্রাণপণ করে ছোটে। যে অনন্ত থেকে এসেছে সেই অনন্তই তখন তার বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন সে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই বাধাকে অতিক্রম করে অনন্তের মধ্যে ফিরে যায়, এবং এই যাতায়াতের দ্বারাই অনন্ত তাঁর নিজের স্বরূপকে নিজের মধ্যে লাভ্ করেন।

এখন একটা কথা বলতে হয় এই, যে, ভূমা যখন ক্রমশঃ ছোটর মধ্য দিয়া এসে একেবারে ছোটতে পৌছিল, সে পর্য্যন্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটা মোটামুটি বিবরণ আমাদের আন্দাজ করে নিতে হবে। ভূমার বিকাশের কোনও একটা জায়গায় ধর humanity বা মানবজাতি। এখন এই মানবজাতির মধ্যে যে সত্যটা নিভৃত হয়ে রয়েছে, মানব সমাজের মধ্যে তার [illegible] বাধা লুক্কায়িত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ যেই আমরা শুনিলাম যে মানব্ জাতি বলে একটা সত্য ফুটেছে, সেই ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ফুটে উঠে যে সেই মানবজাতিটা মানব সমাজ নয়। যতই বড়র দিকে যাবে ততই দেখ্‌বে যেন সেটা ক্রমশঃ তোমার কাছে

একটু একটু অস্পষ্ট বলে মনে হবে, আর যেই একটু একটু করে নেমে আস্‌বে সেই দেখ্‌বে যে ক্রমশঃ সব স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। যতক্ষণ মানবজাতির মধ্যে ভাবা যাইতেছিল ততক্ষণ যেন সেটা কিছুই বুঝিতেছিলাম না। যেই সমাজের মধ্যে এলেম সেই দেখলাম্ যে হাঁ এ জিনিষটা অনেক্‌টা বোঝা যায় বটে। এইরূপ ক্রমশঃ এমশঃ আমরা যখন এসে ব্যক্তিতে পড়লাম, তখন দেখলাম যে তার মধ্যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সবই স্পষ্ট হয়ে আসছে। মানব জাতির মধ্য দিয়া সে যখন ফুটে উঠ্‌ছিল, সে যেন মনে করেছিল, যে সে যে কি পদার্থ তা যেন সে বুঝে উঠতে পারে নাই। সে জানিয়ে দিতে পারে নাই যে সে কি। তাহার মধ্যে যে সত্যটি লুকিয়েছিল সেটা যে সত্য, তার যে প্রসার সমস্ত বিশ্ব ব্যেপে রয়েছে তা সে মোটেই বোঝাতে পারছিল না। তাই সে ক্রমশঃ তার মধ্যে যেটা অস্পষ্ট ছিল, যেটা সঙ্কুচিত ছিল, যেটা বাধা ছিল, সেটাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফোটাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, এবং একটু করে ফোটাতেও লাগ্‌ল, এবং তার চেষ্টার ফলেই সমাজ জেগে উঠ্‌ল; সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মানব সম্প্রদায় ফুটে উঠ্‌ল; এবং তার মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনগুলি জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সেই বিরাটই ক্রমশঃ প্রসারিত হতে হতে ক্ষুদ্রে এসে পৌছেচেন। কারন বিরাটের আর বিরাটের দিকে ত বাড়বার কোন উপায় নাই। তাঁর যত সঙ্কোচ, যত বাধা, সেই সবই হচ্ছে ক্ষুদ্রের দিকে। বিরাট্ ত বিরাট্ হয়েই আছে, তার যা কিছু বাকী সে হচ্ছে ক্ষুদ্রের

দিকে। বিরাট্কে যদি বাড়তে হয় ত তাকে সেই ক্ষুদ্রের দিকেই বাড়্তে হবে। সেই দিকেই তার যত সঙ্কোচ। তাই সত্য ব্রহ্ম যখন দেখলেন যে তিনি সেই এক বৃহৎই হয়ে আছেন, সেদিকে আর এগুবার কোনও পথ নাই, তখন তিনি ভেঙ্গে দ্বিধা হলেন। তদৈক্ষত বহুস্যাম্। এমনি করে নিজকে আরও আরও ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রেতে, ব্যক্তিতে এসে পৌছেচেন। এই যে একটার পর আর একটা এসেছে, এগুলোকে যেন সব আলাদা আলাদা মনে করা হয় না। এরা সব ছাড়া ছাড়া নয়, এদের মধ্যে পরস্পরের খুব একটা গাঢ় সম্বন্ধ আছে। এরা সকলেই একই সত্যের প্রকাশ। যেটা সঙ্কুচিত ছিল সেটাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়ে উঠ্ছে; স্পষ্টতর হয়ে উঠ্ছে। কাজেই একটার পর যে আর একটা বিকাশ আসছে, সেটা তারই বিকাশ, একটা আলাদা কিছু নয়; একটার অবস্থার মধ্যে যেটা খুব স্পষ্টছিল না, খুব স্ফুট ছিল না, আর একটা অবস্থার মধ্যে সেইটেই স্ফুট হয়ে উঠ্ছে। যেমন একটা বীজ থেকে ক্রমে ক্রমে গাছ হয়, তখন এটা আমাদিগকে বুঝতে হয় যে এই গাছের যত তাৎপর্য্য সমস্তই বীজের মধ্যে ছিল। বীজের পর অঙ্কুর, অঙ্কুরের পর চারা ইত্যাদি যত যত অবস্থা, তারা সব আলাদা নয়, একই বীজের ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকাশ এবং প্রকাশ; এক বীজের মধ্যেই সমস্ত অবস্থা গুলি সঙ্কুচিত হয়েছিল, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সঙ্কোচগুলো সরে যেতে লাগ্ল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন

অবস্থা গুলি বেরিয়ে পড়তে লাগল বীজটাই ক্রমশঃ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বহু হয়ে, প্রসারিত হয়ে, বিচিত্র হয়ে, নিজকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে সে এক। তেমনি যখন বল্‌লাম যে মানবজাতির সত্যটা তাকে ভেঙ্গে ক্রমশঃ সমাজ, জাতি, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে, তখন যেন আমরা না বুঝি যে সমাজ, জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতির যেগুলির নাম করা গেল, সেগুলি মানবজাতি ছাড়া আর কিছু বা মানবজাতির থেকে ভিন্ন। মানবজাতির মধ্যে নিভৃতে যে সত্যটা ছিল, যেটি নাকি শুধু মানবজাতি বল্লে আমরা বুঝতাম না, সেই সত্যটিই তাকে ফুটিয়ে উঠিয়ে বহু করেছে। বহু করার জন্য, ক্রমশঃ বিকাশের জন্য, আপনাকে একবার সমাজ বলে বুঝিয়েছে, একবার জাতি বলে বুঝিয়েছে, একবার সম্প্রদায় বলে বুঝিয়েছে, একবার হয় ত ব্যক্তি বলে বুঝিয়েছে।

মানবজাতির সামনে যে লক্ষ্যটি ছিল, এদেরও সামনে কাযে কাযেই সেই একই লক্ষ্য রয়েছে এবং সেই একই লক্ষ্য এদের সকলের মধ্য দিয়ে বহুধা বিভিন্ন হয়ে ফুটে উঠছে। মানবজাতিটি, যেটা থেকে আমরা রওয়ানা হয়ে এলুম, সেটির মধ্যে যে সত্য ছিল, সেটাকেই ফোটাতে এরা চেষ্টা করছে এবং এরা এসেছেও এই জন্যেই ; তাই এদের সকলের সামনেই সেই লক্ষ্য রয়েছে। এরা ভিন্ন হয়ে মানবজাতি থেকে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তাকে বুঝিয়ে দিবে, আবার ঘুরে তাতেই যাবে। সত্যের স্বভাবই

এই যে তিনি ফুটতে ফুটতে, বাড়তে বাড়তে, ঘুরে আবার তাঁতেই ফিরে এসে দেখিয়ে দেন যে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই; যেখানেই যাও সেইখানেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। তাই বলছিলাম মানবজাতিটির মধ্যে যে লক্ষ্যটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সমাজে জীবনেও সেই লক্ষ্যটি দাঁড়িয়ে আছে এবং সেইটেই কাজ করছে। সমাজ যে ফুটছে, সমাজ যে চল্‌ছে, তার জীবনীশক্তি এর মধ্যে রয়ে গেছে। এরই জোরে সমাজ ছোটে। তাই যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, সমাজ জীবনের কর্ত্তব্য কি? তবে বল্‌তে হবে যে মানবজাতির ভিতরকার সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলাই তার কর্ত্তব্য; কারণ সেইটেই সে কর্‌ছে। কর্ত্তব্য মানে, যেটা কর্‌তে হবে। কি কর্‌তে হবে? যেটা কর্‌ছ অথচ করা হয় নাই; যেটা তোমার পক্ষে করা স্বাভাবিক। অনেক সময় অনেকে হয়ত বলবেন যে সেইটাকেই কর্ত্তব্য বল্‌ব, যেটা হচ্চে উচিত। কিন্তু উচিত বল্‌তে কি বুঝি? যেটা স্বাভাবিক সেইটাই ত হচ্চে উচিত। কে একথা বলবে যে যেটা স্বাভাকি নয় সেইটেই হচ্চে উচিত? যেটা স্বাভাবিক নয় সেটা ত হবেই না, কারণ স্বভাব ত কখন ওলটাতে পারে না। "স্বভাবনাশাৎ স্বরূপ-নাশপ্রসঙ্গঃ"। স্বভাব ওলটাতে গেলে বস্তুটাই উল্টে যায়। তাই স্বভাব যেটা, সেটা হবেই হবে, এবং কাযে কাযেই উচিত হতেও সেইটেই হতে পারে। তাই যখন বলি, সমাজের কর্ত্তব্য, তখন বুঝব, যে যেটা সমাজ করছে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সকল সময় সে যেটা করছে বা

যেটা করতে হচ্ছে। সমাজ কি করছে, কিসের জন্য সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি তার লক্ষ্য, কোন্‌দিকে তার গতি, যদি ভেবে দেখি তা হলে বুঝ্‌তে পারব যে মানবজাতির মধ্যে যে সত্যটা ছিল, যে কল্যাণটা ছিল, সেইটেই হচ্ছে তার লক্ষ্য, সেইটেই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য, সেই দিকেই সে ছুটে চলেছে। এক মানবজাতিই নিজের তত্ত্বটাকে বোঝবার জন্য নানা সমাজে বিভক্ত হয়েছেন। কাযেই সকলকে তাঁরই অভিব্যক্তি বোঝাবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে। কর্ত্তব্যটা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; এখানে ইচ্ছা থাক্‌ বা না থাক্‌ কর্‌তেই হবে, বাধ্য করে করাবে। সকল সমাজ মিলে মানবজাতির তত্ত্বটাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বোঝাবে। সকলের মধ্যে যে স্বাধীনতাটা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেটাও তাঁরই সত্যের প্রকাশের একটি অঙ্গ। তাই আপাততঃ হয়ত দেখ্‌তে পারি যে মানবজাতির মধ্যে যে বাধাটা ছিল, যেটার জন্য সে ভাল করে ফুট্‌তে পারে নাই, যেটার জন্য তার নিজের দেহটাকে এত বিভক্ত করে নিজকে ফোটাতে হচ্ছে, সেই বাধাটা হয়ত কোনও সমাজের মধ্যে বেশী রকম বেরিয়ে পড়ল, সে হয়ত সত্যের যানকে, তাঁর বিকাশকে, রুখে দাঁড়াতে এল, তখন বুঝতে হবে যে সেই সমাজের তখন পাপ হল। সে তাঁকে রুখ্‌তে গেল। কিন্তু তা কি রুখ্‌তে পারে? সে যে হয়েছেই তাঁকে সাহায্য করতে, তাকে তাঁর সাহায্য কর্‌তেই হবে; কিন্তু সে যে রুখে দাঁড়াল, তাকে দিয়ে সাহায্য হবে কেমন করে, বরং প্রতিকূলতাই হতে চলল। কিন্তু তা ত হবার

যো নাই। সে কি করে তাঁর প্রতিকূলতা করবে? তাই হয় তার রোখ কমে যাবে, সে তার ভুল বুঝ্‌তে পারবে এবং তাঁর পথে চল্‌বে; নয় তার শক্তি কমে যাবে, সে দুর্ব্বল হয়ে যাবে তার অধঃপতন হবে। তখন তার বল কমে যাওয়াতে, তার রোখে আর তাঁর যানের কোনও ক্ষতি হবে না। আর যারা তাঁর যান, তাঁর অভিপ্রায় মেনে নিয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে জীবন বেঁধে দিয়েছে, তাদের বল বেড়ে উঠবে, আর সেই বর্দ্ধিত বলের স্বাম্‌নে যারা তাঁকে রুখ্‌তে গিয়েছিল, তারা দুর্ব্বল হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়্‌বে। সত্যকে বাধা দিলেই তার সাজা আছে, এবং সে সাজা কাউকে বসে গবেষণা করে বিধান করতে হয় না; সত্যের নিজের নিয়মেই সে সাজার বিধান হয়ে যায়। যিনি ইচ্ছা করে সত্যের ইচ্ছার সঙ্গে, তাঁর কাযের সঙ্গে, তাঁর গতির সঙ্গে, নিজকে মিশিয়ে দিবেন, মিলিয়ে দিবেন, তাঁর আর কোন দুঃখ, কষ্ট নেই, কোনও সাজাও নাই। বেশ অনায়াসে তিনি চলিয়া যাইবেন। আর যিনি তাঁহাকে বাধা দিতে আসিবেন, তিনি ত বাধা দিয়া রাখিতে পারিবেনই না, বরং তাঁর নিজের হাড় চূরমার হয়ে যাবে। তিনি যদি দাঁড়িয়ে উঠে সত্যকে সাহায্য করতে না পারেন, তবে সত্য তাকে পেড়ে ফেলে তার উপর দিয়ে তার গাড়ী হাঁকিয়ে যাবে, আর, ফলে তার হাড় গোড় গুলো চূরমার হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম যে, কোনও সমাজ যদি মানবজাতির মধ্যে যে তত্ত্বটি নিগূঢ়ভাবে অন্যান্য সমাজের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেটির

বিরুদ্ধাচরণ করে, বা সেটিকে চাপিয়া রাখিতে চায়, বা তার প্রসারকে রোধ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে হটিয়া যাইতে হইবে, তাহাকে অধঃপতিত হইতে হইবে, এবং যাহার গতি বাস্তবিক সত্যের গতিকে সাহায্য করিতেছে তাহার কাছে পদদলিত হইতে হইবে। সেই জন্য আমরা অনেক সময় দেখি যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত সমাজ খুব বড় ছিল, সেগুলি অনেক সময়ে কালক্রমে অধঃপতিত হইয়া যায়। কেন যায় সেটা যদি আমরা বাস্তবিক বুঝতে চেষ্টা করি, তবে দেখ্‌তে পাব যে পৃথিবীর সকল সমাজ-গুলিকে কখনও আমরা এক সময়ে তুল্যরূপে উন্নত দেখি নাই। এক সময়ে হয়ত কতকগুলা খুব উন্নত হয়ে আছে, এবং আর কতকগুলা হয়ত খুবই নীচু হয়ে আছে। এতগুলা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আবশ্যকতা কি তা যদি আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে তারা যেন সব ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব, এবং তাদের এক একটি অবয়ব দিয়ে সত্যের এক একটি শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। একটি শক্তি যখন একটি অবয়ব দিয়ে ফুটে বাহির হোল, তখন অপর অবয়ব গুলির মধ্য দিয়ে সে শক্তির কোনও সাহায্য হইতেছে না, (কারণ তাহাদের মধ্য দিয়ে পরে অন্যবিধ শক্তি আবির্ভূত হবে এবং অন্যবিধ উপায়ে তাহারা সত্যের মহাযানের সাহায্য করিবে), তাই তারা তখন দুর্ব্বল এবং নীচু হয়ে থাকে, আর তখন যাদের দ্বারা সত্য বাস্তবিক সার্থক হচ্ছিল, তারা বলীয়ান্ হয়ে উঠে। কালক্রমে যখন সত্যের যে দিক্‌টি ফুটে

উঠ্‌ছিল, সেটা ছাড়া যদি আরও কোনও দিকে তাঁর ফোট্‌বার আবশ্যক হয়, তখন হয়ত অন্য সমাজগুলোতে সে দিক্‌টা ফোটাবার সাহায্য হয়, এবং সত্য সেই দিক্‌ দিয়ে ফুটে উঠেন ; আর যে গুলো দিয়ে পূর্ব্বে ফুট্‌ছিলেন, সে গুলো সত্যের এই নূতন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বদ্‌লাতে পারে না কাযেই তারা নীচু হয়ে পড়ে, আর তাদের উপর দিয়ে দ'লে গিয়ে নূতনেরা জয়লাভ করে। যদি পূর্ব্বের পূর্ব্বের সমাজগুলি ঠিক সত্যকে ধর্‌তে পেরে তাঁর সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিতে পার্‌ত, তা হলে তারা সত্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিবর্ত্তনও কর্‌তে পার্‌ত। সত্যের সঙ্গে যদি মিশিয়ে দিতে পার্‌ত, তা হলে নিজেদের ইচ্ছামত কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তনা, কোনওটাকে নিজস্ব মনে করে সেটাকেই খুব বেশী মায়া করে ধরে রাখ্‌ত না, সত্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ছেঁড়ে দিত, কাজেই তাদের অধঃপতনও হতে পার্‌ত না। সত্যের যখন কোনও বিকাশ তাদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল, তখন সত্যেরই গৌরবে মহীয়ান্‌ হয়েও তারা হয়ত বুঝ্‌তেই পার্‌লে না যে তা সত্যেরই গৌরব, তাই তারা সেই গৌরবটাকে নিজের বলে মনে কর্‌লে ; এবং সত্য যখন তাঁর নূতন রকম বিকাশ নিয়ে আর একদিকে ফুট্‌তে লাগলেন তখন তারা তাকে সত্যেরই বিকাশ বলে হয়ত চিন্‌তেই পার্‌ল না ; তাই তারা তাঁর গতিরোধ কর্‌তে গেল, এবং নিজের সত্যের এই নূতন আহ্বানের দিকে একটুও দৃষ্টিপাত কর্‌লনা, কাঠ হয়ে তারা

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারা ভাব্‌ল আমরা উন্নত, এই যেটায় আমরা আছি, যেটা হচ্ছে আমাদের উন্নতি, এটা আমাদেরই নিজস্ব। এই হোল তাদের অহঙ্কার। এই হোল তাদের মিথ্যা। এই মিথ্যা দিয়ে তারা সত্যকে বাধা দিতে গেল। সত্যের নূতন আহ্বানের দিকে একটু নজরও কর্‌লেনা। তাই তারা সত্যের নিয়মে পড়ে গেল; আর নূতনের কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী আকাশে উড্ডীয়মান হ'য়ে উঠ্‌ল।

এই যেমন সমাজের কথা বলা গেল, ব্যক্তি সম্বন্ধেও এই একই কথা বল্‌তে হ'বে। ব্যক্তি হচ্ছে সমাজ-জীবনের প্রকাশ। সমাজ আপনার মধ্যে আপনি প্রকাশ হতে পার্‌ছিল না, তাই বহুধা বিভিন্ন হয়ে, ব্যক্তি হয়ে নিজকে প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। সমাজের মধ্যে যেটা সঙ্কুচিত ছিল, ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে সেইটেই প্রকাশ করে নিজে পরিস্ফুট হবার চেষ্টা কর্‌ল। যে সত্যটি সমাজ জীবনের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সত্যটিই ব্যক্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সমাজ-জীবনের মধ্যে যে সত্যটি নিভৃত হইয়াছিল, তাহা যেন নিজকে ঠিক করিয়া বুঝাইবার জন্যই পুনরায় পরিস্ফুট হইয়া, ব্যক্তি হইয়া দেখা দিল। কাযেই সমাজ-জীবনের সত্যকে উঁচু করিয়া ধরা, তাকেই ফুটাইয়া উঠাইবার চেষ্টা করাই ব্যক্তি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ব্যক্তি সর্ব্বদা তার লক্ষ্যের মধ্যে সমাজ-জীবনকেই দেখিতেছে। মহান্ সত্য তার

কাছে সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়াই আসিতেছে, এবং সেও মহান্ সত্যকে সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়াই সার্থক করিয়া চলিতেছে। সমাজ-জীবন ছাড়া তার কোনও প্রাণ নাই। সে তাহার বুকের মধ্যে যে রণন্ লাভ করিতেছে, তাহা সমাজের অনুরণন্। যে মহান্ সত্যকে আমরা মানবজাতির মধ্যে দেখিয়াছি, সেই মহান্ সত্যই সমাজের মধ্য দিয়া আমার মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, এবং সার্থকতা লাভ করিতেছে। সমাজ পালন করিতে যাইয়া আমি সেই মানবীয় মহাসত্যকেই পালন করিতেছি। সমাজকে বাধা দিতে গেলে আমি সেই মহান্ সত্যকেই বাধা দিতে গেলাম, তাই সেই মহান্ সত্যের বলে, সমাজ আমাকে শাস্তি দিবে। যে বাণী সমাজের মধ্য দিয়া আমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে সেই বাণীকে মানিয়া চলাই আমার কর্ত্তব্য ; সেই বাণীর সঙ্গে আমাকে মিশাইয়া দিলেই, মিলাইয়া দিলেই আমার সার্থকতা। সমাজের বাণী আমার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা ধ্বনিত হইয়া আমাকে সর্ব্বদা আমার পথ দেখাইয়া দিতেছে, আমাকে সর্ব্বদা পথ মিলাইয়া লইতে বলিতেছে, আমাকে সর্ব্বদা বলিয়া দিতেছে, এই সত্যের উদ্দেশ্য, এই সমাজের গতি। আমি যদি সে গতির সহিত আমাকে না মিশাই, তবে যে আমার সত্যকেই রোধ করা হইবে, এবং সত্যকে রোধ করিলে যে সাজা হয় তাহা হইতেও আমি অব্যাহতি পাইব না। সমাজের গতি আমি রোধ করিতে গেলে আমিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, আর সমগ্র বলবান্ সমাজ সতেজে

আমার বুকের পাঁজরের উপর দিয়া জগন্নাথের মহারথ, মহাঘোষে, মহোল্লাসে টানিয়া লইয়া যাইবে, আর চারিদিকের বংশীধ্বনির সহিত আমার রোদনধ্বনি তার ক্ষীণ স্বর মিলাইয়া দিবে। চারিদিকের গগনস্পর্শী ধূলিপটলের এক মুষ্টি ধূলি, হয়ত, আমার রক্তে আর অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া জগন্নাথের রথচক্রের পাদ-সম্বর্দ্ধনা করিবে। আমি কে? আমি ত সমাজ-জীবনের অনুরণন্ মাত্র সমাজ-জীবনের কাজ তার নিয়ত গতিতে চলিয়াছে। সমাজ দেবতা যে ভাবে চলিবেন, যে নিয়মানুসারে তার গতি তিনি ঘুরাইবেন, যে অনুসারে তাঁহার মহাযান তিনি প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহা তাঁহারই হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে। তাঁহার বুকের মধ্যে আমার বুক রহিয়াছে, তাই তাঁহার বুকের পরিস্পন্দন আসিয়া আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া প্রতি কার্য্যের সময় আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমরা চলিত কথায় যাহাকে বিবেক বলি সেটা কি? সেটা কেবল সেই সমাজ-জীবনের অনুরণন্ মাত্র। সমাজের প্রতি অবয়বের মধ্যে সে ধ্বনি স্পন্দিত হচ্ছে, এবং আমাদিগকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কোন্ দিকে আমাদের যেতে হবে। এই অনুরণনের মূলে দেখতে পাব যে একটা সার্ব্বভৌম ভাব লুকানো রয়েছে। এত যে মুটে, এত যে চাষা, কিছুমাত্র লেখাপড়া শেখেনি, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, এটা করা ভাল কি মন্দ; জিজ্ঞাসা কর, চুরি করা উচিত কিনা, দেখিও ও তোমাকে ঠিক্ উত্তর দিয়া দিবে। তুমিও যেমন বোঝ চুরি

করা পাপ, ও লোকটিও ঠিক তেম্‌নি করে বোঝে যে চুরি করা খারাপ। কেমন করিয়া বল্‌তে পারে? ও ত তোমার মতন কোনও শিক্ষা পায় নাই। তবে কেমন করিয়া বলে? তাইত বলি, যে একথা বলবার জন্য উহার কোনও বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। সমাজই তাহাকে তাহার আকাশে, বায়ুতে, জলে ইহা শিখাইয়াছে। সমাজে জন্ম গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ তাহাকে সমাজ-গতি নির্ণয় করিয়া তাহার সহিত তাহার নিজেকে মিলাইয়া লইবার উপায় শিখাইয়া দিয়াছেন। তাই তার এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হয়ত ঘটনাটা গোলমেলে রকমের হোলে, বুদ্ধিদ্বারা ঠিক্ করতে পারে না, যে কি ঘটনাটা ঘটেছিল এবং কোন্ দিকে কি বলবার আছে; কিন্তু সেটা একবার ঠিক্ হোয়ে গেলে, উচিত অনুচিতটা ঠিক্ হোতে তার আর দেরী লাগে না।" এটা হচ্ছে সত্যের বাণী সমাজের ভিতর দিয়ে, তার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে চলেছে। কযেই ইহা সার্ব্বভৌম এবং ইঁহাকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন না। ইনি সকলের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে বলে দিচ্ছেন, যে সত্যের এই পথ, এই পথে চল, এদিক্ ওদিক্ বাঁকিয়া চলিলেই তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইতেছে এবং সেইজন্য সাজাও পাইবে। সত্যের এই বাণীর ভিতর দিয়ে প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে সত্যের বিশ্বজনীন নিয়মের মঙ্গল-জ্যোতি স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌ছে, আর মানুষকে আহ্বান করছে, এই দিকে এস, এই দিকে এস। সত্যপ্রাণ মহামতি **Kant**, সত্যের

এই বাণী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে এই যে মানুষের প্রাণের মধ্যে কি জেগে ওঠে, কি পরিস্পন্দিত হতে থাকে, কি যেন তাকে জোরে বলে দেয়, এই দিকে এস, এই দিকে, এ সত্যেরই বাণী। এই যে কি এক ঝঙ্কার সকল মানুষের মধ্যে জেগে উঠে, তালে তালে বেজে ওঠে, মানুষকে সত্যের পথে কল্যাণের পথে ধাবিত করে, ইহা সত্যেরই মহাবাণী। আর কিছুকে মান্‌লে আমাদের পরমার্থ লাভ হবে না, আমাদের কর্ত্তব্য করাও হবে না। এই সত্যের নিয়মকেই আমাদের প্রাণের প্রাণ করে রাখ্‌তে হবে, এরই নির্দ্দেশ অনুসারে আমাদিগকে চল্‌তে হবে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রত্যেক মানুষ মনে করিত যে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি, বিদ্যা, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ ছাড়া সংসারে খুব বড় সার বা সত্য বলে কোনও জিনিষ নাই। রাজাকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহারা দেশে অরাজকতা আনিল, বিপ্লব ও অশান্তিতে দেশ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিশক্তি ছাড়া, অন্য সমস্ত শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবে, এই ছিল তাদের অভিপ্রায়। ব্যক্তিশক্তি ও রাজশক্তির কোনও সামঞ্জস্য না করিয়া, শুধু রাজশক্তি ধ্বংস করিয়া সেই আসনে ব্যক্তিশক্তিকে বসাইতে উদ্যোগী হইল। ব্যক্তিশক্তিকে শাসন করিতে পারে এমন কোনও শক্তিকেই তাহারা স্বীকার করিতে চাহিল না। শুধু মুহূর্ত্তের তীব্র আঘাতে অন্য সমস্ত শক্তিকে ধূলিসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই আঘাতের

বল অনেক দিন থেকেই বিপুল ভাবে তাদের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল। কত অত্যাচার তাহারা কতকাল হইতে সহিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এতদিনের সঞ্চিত এত বড় বিপুল শক্তি দ্বারাও তারা রাজশক্তিকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারিল না। যত দিন আপন স্বাভাবিক পরিণতিতে অন্য কোনও বিপুল সমাজশক্তি রাজশক্তির স্থান অধিকার করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত জোর করিয়া কোনও শক্তিকেই কেহ উৎপাটন করিতে পারে না। ব্যক্তিশক্তি এই রাষ্ট্রশক্তির স্বাভাবিক পরিণতিতে সাহায্য করিতে পারে মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি স্বকীয় পরিণামে রূপান্তর পরিগ্রহণ না করিলে, তাহাকে ধ্বংস করা বা উৎপাটন করা মানুষের সাধ্যাতীত। কারণ ব্যক্তির মধ্যে যে শক্তির লীলা চলিতেছে, তাহা যেমন সত্যেরই বিকাশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে যে শক্তি চলিতেছে তাহাও সেই একই সত্যের বিকাশ। সত্যের গতিরোধ করা বা তাহাকে উৎপাটন করা ধারণারও অতীত। সত্য তেমন বস্তুই ন'ন যে তিনি মুখের দাপটেই কোথাও সরে যাবেন, তাই এই ব্যক্তিসর্ব্বস্ববাদ বা Individualismএর উন্নতির পথে ফরাসীরা যাকে নেতা বলে স্থির করেছিল সেই নেপোলিয়ন তাহাদের রাজা হইয়া পড়িলেন। তাঁর যাওয়ার পরও সেই রাজশক্তিকে তাদের স্বীকার করতে হোল। কিছুকাল পরে তাদের দেশ থেকেই Sociologyর আদি বাণী কোঁতের মুখ থেকে ধ্বনিত হোল। তিনি সমাজকে দেবতা

বলে স্বীকার করলেন; তিনি বললেন আমি আর কোনও দেবতা মানি না Humanity is my God। তিনি বললেন এ কথা আমার আগে কেউ প্রচার করে নাই; এ দেবতার পূজার আমিই প্রথম প্রবর্ত্তন করলাম। আমিই এর High priest। সত্যের ইতিহাসের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে এই সোসিয়লজির প্রতিষ্ঠাই, রাজশক্তির সমাজশক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা, বা Republicanismএর যথার্থ আবির্ভাবের সূচক। এর পূর্ব্বে প্রজাতন্ত্র-শাসনের যে উদ্যোগ হয়েছিল তাহা এই পরিণতির চেষ্টা বা আন্দোলনেরই পরিচায়ক, ইহার প্রতিষ্ঠার প্রমাপক নয়।

ফরাসী বিপ্লবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একমাত্র সত্য মনে করিয়া তাহার নিকট আর সমস্ত উৎসর্গ করিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানাতে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহার তখনই যথার্থ অবসান হইল, যখন এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বিশ্বব্যাপক মানবজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ব্যক্তির দিক থেকে সত্যকে দেখা হয়েছিল বলেই সেটা সমগ্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হোল এবং কোঁতের "সোসিয়লজি" বা সমাজ তত্ত্বের সৃষ্টি হোল। সত্যের কোনও একটি রূপকে একান্ত সত্য বলিয়া মানিতে গেলেই রূপান্তরের দিক্ থেকে তার যে একটা বাধা আছে, তার বলে প্রথম রূপটি সরিয়া গিয়া তার দ্বিতীয় রূপের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দ্বিতীয় রূপটি প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার সত্যের

তৃতীয় মূর্ত্তি আসিয়া দ্বিতীয় মূর্ত্তিকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। এমনি করিয়াই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তির স্বগত বাধায় সত্যের বিবিধ মূর্ত্তির সহিত আমরা পরিচিত হই।

এই ফরাসী বিপ্লবের যুগে ব্যক্তিত্বের মূর্ত্তিতে যে সত্য আবির্ভূত হইতেছিল, জার্ম্মাণিতে কাণ্টের মধ্যে তাহারই একটি নূতন ছায়া দেখিতে পাই। রুসো ও হিউমের মধ্যেই কাণ্টের বীজ নিহিত ছিল। রুসো সমাজের দিক্ থেকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেয়ে আর কোনও বস্তু নাই। যে কথা রুসো রাষ্ট্রের দিক দিয়া বলিয়াছিলেন হিউম সেই কথাই প্রত্যয়ের দিক দিয়া দেখাইতে গিয়া বলিলেন, প্রত্যক্ষই বল আর অনুমানিক প্রত্যয়সমূহের কথাই বল, সবদিকেই আমাদের মনকেই আমরা প্রধান ভাবে দেখিতে পাই। কার্য্যকারণসম্বন্ধই বল, আর যাই বল, কিছুই ত বাহিরে নাই সমস্তই আমার মন থেকে দেওয়া। ঝড় উঠিল, গাছ পড়িল কিন্তু ঝড়ই যে গাছ ফেলার কারণ তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না। এইরূপ অবস্থায় একটা যে আর একটার কারণ তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। সেটুকু আমরা কেমন একটা সাহচর্য বা অভ্যাসের ফলে জাগতিক ব্যাপার যুগলের উপর আরোপ করি। কাযেই আমাদের মনের সাহায্যে আমরা যে সমস্ত প্রত্যয়ে উপনীত হই সেগুলির তদতিরিক্ত কোনও বাহ্যসত্তা নাই। "Our conviction of the truth of a fact rests on feeling, memory and the reasonigs founded

on the causl counection *i. e.* on the relation of cause and effect. The knowledge of this relation is not attained by reasoings a priori, but arises entirely from experience, and we draw inferences, since we expect similar results to follw from similar causes, by reason of the principle of the custom or habit of conjoining different manifestations *i. e.* by reason of the principle of the association of ideas. Hence there is no knowledge, no metaphysics beyond experience."

লক্ যখন বলিয়াছিলেন যে কার্য্যকারণের নিয়তসম্বন্ধজ্ঞান আমাদের প্রত্যয় হইতেই উৎপন্ন হয়, তখনও তিনি প্রায় এই একই কথা বলিয়াছিলেন। এই সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে আমরা কেবল দেখিতে পাই যে বহির্জগতে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে সেখান হইতে তাহাকে অন্তর্জগতের দিকে ক্রমশঃ টানিয়া আনা হইতেছে। বার্ক্‌লে, লক্, রুসো, হিউম্, সকলেরই ঝোঁক সেই একই দিকে। লোকের মনে একটা সন্দেহ (scepticism) ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতেছে যে সত্যের বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা কোথায়? বাহিরে না ভিতরে? এবং এই সন্দেহের ফলে সকলেই যেন সত্যের অন্তর্মূর্ত্তিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার বহির্মূর্ত্তিকে অসৎ বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার

উদ্যোগ করিতেছেন। রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া এই ঠেলিয়া ফেলার উদ্যোগে ফরাসীবিপ্লব ও দার্শনিকতত্ত্বচিন্তার মধ্যে ইহার উদ্যোগে লক্, হিউম্, কাণ্ট প্রভৃতির সৃষ্টি।

কিন্তু কাণ্টের মধ্যে ইহা যত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এত আর কাহারও মধ্যেই নয়। কাণ্ট প্রত্যক্ষ-প্রত্যয় ( experience ) বিশ্লেষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তিনটা স্বতন্ত্র ভাগ আছে। প্রথমটা ইন্দ্রিয়গোচর বা ( Æsthetic ) দ্বিতীয়টি বুদ্ধিগোচর ( Understanding ) তৃতীয়টি চৈতন্যগোচর ( Reason )। প্রথমটির মধ্যে দিক্, কালাদি ও বাহ্যবস্তু-সম্পর্কিত রূপ, রসাদি, প্রভৃতি সমুদয় প্রতীয়মান ধর্ম্ম সংগৃহীত রহিয়াছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে অন্বয়িত্ব, ব্যতিরেকিত্ব প্রভৃতি পুরস্কারে ইন্দ্রিয়বৃত্তিলব্ধ সামগ্রী বিভিন্ন প্রকারে সাজান এবং গ্রথিত হইয়া নিত্যানুস্যূত আমিত্ববোধের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়টির মধ্যে দেখা যায়, যে, সেখানে বাহ্যজগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন অনেকগুলি ধারণা রহিয়াছে যাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ জ্ঞাতার প্রত্যয়সঙ্কুল খুঁজিয়া দেখিলে এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারণাগুলি সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না, কারণ সে স্তরের বিচার করিতে গেলেই নানা স্ববিরোধ উপস্থিত হয়। শুধু এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, যখন এই নূতন ধারণাগুলি কি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, কি বুদ্ধিবৃত্তি, কাহারই বিষয় নয়, অথচ এগুলি

যে আমাদের মনের মধ্যে রহিয়াছে সে সম্বন্ধেও যখন কোনও সন্দেহ নাই তখন ইহা মানিতেই হইবে যে ইহাদের আধার-স্বরূপ একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি রহিয়াছে। সেই বৃত্তির তিনি নাম দিয়েছেন চৈতন্য বা Reason.

বাহ্যবস্তু যে কি তাহা Kant জানেন না। সেটা একেবারে অজ্ঞেয়। অথচ সেটার সত্তা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা যাহা পাই তাহার কিছুই বাহির হইতে পাওয়া নয়। তাহার সমস্তগুলিই ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চৈতন্য, ইহার কোনও না কোনও বৃত্তি হইতে পাওয়া গিয়াছে। অথচ ফিক্টে যেমন সেগুলিকে প্রমাতৃচৈতন্যের স্ববিরোধ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন সে রকমের কোনও চেষ্টাও এখানে নাই। কাণ্ট শুধু আমাদের জ্ঞান বিশ্লেষ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি পাইয়াছেন। এবং তাহারই বলে তিনি বলিয়াছেন যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা যাহা কিছু পাই সমস্তই জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত বিভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিগুলি অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট শক্তি দ্বারা একত্র গ্রথিত হইয়া আমিত্ব-বোধরূপে যুক্ত হইলেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানাকারে তাহাদের পরি-স্ফূর্ত্তি হয়।

সত্যের সীমানা গুটাইয়া কাণ্ট্ তাহাকে একেবারে অন্তরের মধ্যে লইয়া আসিলেন। আমাদের অন্তরের মধ্যে নানা প্রত্যয়-

সন্তানরূপে যে জ্ঞানধারা চলিয়াছে, বাহিরেও বিষয়চৈতন্যের মধ্যেও নানা প্রকাশে, যে জড় জগতের মধ্যে তেম্‌নি ভাবেই, সত্যস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাহা কাণ্ট বুঝিতে পারেন নাই। এবং তাহারই ফলে বাহিরের জগৎ ও অন্তরের জগৎ এই উভয়কে মিলাইবার কোনও গ্রন্থি খুঁজিয়া পান নাই। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রভৃতির মধ্যে যে স্বগত-ভেদ ও বিরোধ রহিয়াছে, সেগুলিকে কাটাইবার ও তাহাদের মিলন করাইবার জন্য তাঁহাকে যে সমস্ত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে সে গুলিও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। একদিকে যেমন বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ দুইটিই একেবারে অসম্বদ্ধ ভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; অপর দিকে আন্তর বৃত্তিগুলিও তেম্‌নি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সত্যের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কতকগুলা খণ্ড খণ্ড অবয়বকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাহারও সহিত কাহারও তেমন যোগ নাই।

তত্ত্বের দিকে তিনি এই যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রের দিকে, কি নীতির (Ethics) দিকেও সেই একই বিচ্ছেদ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। সমাজশক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বীকার করিয়া ব্যক্তিশক্তির সহিত তাহার স্বাভাবিক মিলন না দেখাইয়া উভয়কে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একই সমাজশক্তি আপনাকে সফল করিবার জন্য, যে ব্যক্তির বহুধা বিচিত্র রূপ দিয়া আপনাকেই প্রকাশ করিতেছে তাহা তিনি

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সমাজ এবং ব্যক্তি উভয়ই যে একই শক্তির আত্মপ্রকাশ, এ তথ্যে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেই জন্যই একদিকে যেমন বাহ্য জগতে জড়শক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান নাই, অপর দিকে তেমনি সমাজশক্তিকে তাহার যথার্থ আসন দিতে পারেন নাই।

সত্যকে তার নিজের স্বরূপের মধ্যে দেখা তাঁর ঘটে উঠ্‌ল না, তিনি বুঝ্‌লেন না যে সত্যই সমাজ দেবতার মধ্য দিয়ে স্পন্দিত হয়ে আমাদের প্রাণে প্রাণে সঞ্চরিত হচ্ছে। তাই তিনি বুঝ্‌লেন্ না যে, যে বাণীটা সত্যের বাণী বলে আমরা বুঝ্‌তে পারি, সেটা সমাজের মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। তাই তিনি মনে করলেন যে আমাদের মধ্যে সত্যের যে বাণীটা আমরা লাভ করি সেটা বুঝি সকল দেশে এবং সমাজে একেবারে অভিন্ন। তিনি বুঝলেন না যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বাণী স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌ছে। সত্যের বিকাশের দিক্‌টা তিনি দেখেন নাই, তাই তিনি তাকে এক স্থলেই বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাযেই এই জগতের মধ্যেও সত্যকে দেখিতে পাইলেন না। সকল দৃশ্য, শ্রব্য হইতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেলেন। কোনও একটি সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে আসিয়া না দাঁড়াইয়া, এপাশ ওপাশ হইতে সত্যকে আলিঙ্গন করিলেন মাত্র। আমাদের কর্ত্তব্যগুলি যে সত্যের অস্ফুট নিয়ম ( Abstract form ) ছাড়াও, স্পষ্ট এবং স্ফুটভাবে প্রকাশিত হতে পারে, তাদের যে একটা concrete sphere বা

প্রাকট্য আছে তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। আমার প্রাণের মধ্যে যে বাণী সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি, সমাজের দিকে একবার চাহিলেও যে তাহাই অনুষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হইতেছে দেখিতে পাইব, তাহা তিনি বুঝেন নাই। কাযেই অখণ্ড সত্যের মহামহিমময় নিয়মকেই পালন করিয়া যাইব, আর কোনও দিকে দেখিব না, এই যে তাঁহার categorical imperative তাহাও তাঁহার পরবর্ত্তিরা আসিয়া Abstract অর্থাৎ অস্ফুট বোধ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন এবং তিনি নিজেও তাঁহার মতের সকলদিকের সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই; চারিদিকেই গলদ রহিয়া গিয়াছে। সমাজ-জীবনের মধ্যে যেটা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিস্পন্দিত হইতেছিল আমার জীবনের মধ্যে আসিয়া সেইটাই ধ্বনিত হইয়া আমার কর্ত্তব্যবোধ বলিয়া পরিণত হইল, কাজেই আমি দেখি যে আমার মনের মধ্যে যেটা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, সমাজেও তাহা পরিপালিত হইয়া চলিয়াছে এবং বাহিরে আইন, কানুন, পুলিশ পাহারার আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সকলের গতিকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। সত্যের অলঙ্ঘ্য নিয়ম যেমন ভিতরে আমার সকল কার্য্যকে নিয়মিত করিতেছে, তেমনি বাহিরে Law বা ধর্ম্মরূপে সকলকে স্ফুটভাবে কোনটা পথ, কোনটা নয়, তাহাই বলিয়া দিতেছে, যাহাতে কাহারও কোনও গোলমাল উপস্থিত হইতে না পারে। অন্তরের ক্রীড়াটার অন্তরে প্রকাশ, বাহিরের বিকাশটার বাহিরের দিকে প্রকাশ। ন্যায্য করিলে পুরস্কার আছে, অসত্যের

সাজা আছে। ব্যক্তি যখন নিজকে বড় করিয়া সত্যের সিংহাসনে বসাইতে চায়, এবং সেই সত্যের গতিকে বাধা দিতে চায় তখন সত্য তাহাতে বাধা দেয়। সমগ্র বিশ্বের সত্যের শক্তি তার বিরুদ্ধে রুখে আসে, তাহাতেই তার সাজা হয়, তাহাতেই তার কল্পিত সিংহাসনের ধূলায় অবসান হয়ে যায়, এবং দুঃখ মনঃকষ্ট এবং অশান্তি লাভই তার চরম হয়ে থাকে। তবেই মোটামুটি দেখতে গেলে এই দাঁড়ায় যে সর্ব্বথা সমাজ-জীবনের অনুবর্ত্তন করাই ধর্ম্ম এবং তদিতরই অধর্ম্ম।

এই কথাটা ঠিক বলিয়া ধরিয়া নিতে গেলেই একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসিয়া উদয় হয় যে, যখন সমাজ নিজেই উন্মার্গগামী হয় তখনকার কথা কি? সমাজ নিজেই যখন মহা সত্যের দিকে অগ্রসর না হয়ে তার থেকে ভ্রষ্ট হোতে চায় তখনও কি সমাজকে অনুবর্ত্তন করাই ধর্ম্ম? সমাজ ধর্ম্মই করুক আর অধর্ম্মই করুক তার জীবনই যখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে তখন সে আর সমাজকে উল্লঙ্ঘন করবে কি করে? সমাজের বাণীইত তার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে দিচ্ছে; তাকে ছাড়া তার চলে না; বিবেক ত সমাজেরই অনুরণন্। তবে সেই সমাজ যখন অধর্ম্মের দিকে, অন্যায়ের পথে চলেছে, তখন সে কেমন করে অন্য পথে চল্‌তে পারে। বাস্তবিকই তা সর্ব্বতোভাবে পারে না। সেই জন্যইত সমাজের যখন কোনও দুরবস্থা আসে তখন সেই সমাজের নেতারা পর্য্যন্ত ঠিক থাকতে পারে না, সমাজের দোষ তাদের

উপর সংক্রমিত হয়ে পড়ে; চারিদিকের ধূলোয় তাঁরা পথ দেখতে পান না, অন্ধকারের ঘোরে ভীষ্মের মতন লোক-চোখের সম্মুখে প্রকাশ্য রাজসভার মধ্যে দ্রৌপদীকে অতি নির্লজ্জভাবে, অতি নৃশংসভাবে অপমানিত হোতে দেখেও কথা কহিলেন না। যিনি সত্যের জন্য আজীবন ব্রহ্মচারী, সমস্ত রাজ্য অপরকে ছেড়ে দিলেন, তিনি কিনা "অন্নস্য পুরুষো দাসঃ" বলিয়া অসত্যের অধীনতায় জীবন বিক্রয় ক'রে দিলেন। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের জন্য প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী, নিজের একান্ত আজ্ঞাবহ ভ্রাতৃবর্গ, সমস্ত রাজ্য, একেবারে একটুও দ্বিধা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনিই অনুরক্ত, বিশ্বাসী, গুরু, ব্রাহ্মণ, দ্রোণকে, তার পুত্রবধের মিথ্যা সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণের মৃত দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল তখন কথাটিও কহিলেন না। সমাজ তখন অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তার দোষগুলি সে সময়ের যাঁরা সেরা ছিলেন, যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমাজকে একেবারে উল্লঙ্ঘন যেতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের কোথায়?

তবে মহান্ সত্য যখন সমাজের মঙ্গলের জন্য তার মধ্যে নিজের স্বরূপ জাগিয়ে দিতে চান তখন সমাজের মধ্যে এমন লোকও জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা সমাজের মধ্যে তাঁদের আদর্শ না রেখে তাৎকালিক সমাজের অতীত, অব্যাহত সত্যের উপর নিজের আদর্শকে স্থাপিত করেন এবং তার থেকেই অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁরা

সমাজের দিকে চান না, সমাজের গতির আদর্শকে ছাড়িয়ে তাঁরা যান; তখন সমাজের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সমাজ চায় সে যেভাবে ফুটছিল, সেই ভাবেই তাঁদের যাতে ফোটাতে পারে কিন্তু তাঁরা তা মানেন না। সমাজ তাঁদের মানাবার জন্য ব্যগ্র। তাঁরা সত্যের বলে বলীয়ান্। সমগ্র সত্য থেকে তাঁদের বল আসে। তাঁরা পাহাড়ের মতন সমাজকে রুখে দাঁড়ান। সমাজের আঘাত, আক্রমণ, তাঁরা অম্লান বদনে সহ্য করেন।

সক্রেটিশকে এথেনিয়েরা বলিল 'তুমি আমাদের যুবকদের খারাপ করিতেছ, তুমি এ মত প্রচার করিতে পারিবে না' তিনি বলিলেন 'আমি ইহা করিবই করিব।' ফলে তাহারা তাঁহার উপর কত অত্যাচার করিল তাঁকে বিষ দিল, কিন্তু সমাজ নিজেই আট্‌কে গেল, তাঁর মতেরই জয় জয়কার পড়ে গেল। এখনও সকলে বলে সক্রেটিশের মতন জ্ঞানী আর হয় নাই। কেন? তার মত কি জ্ঞানী আর হয়নি? তা নয়, তিনি যে সমাজের দৈন্যের সময় সমাজের অনুবর্ত্তন না করে সত্যের অনুবর্ত্তন করেছিলেন এবং তাই করে সমাজের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাহাতেই তাঁর মহত্ত্ব। সমাজের গ্লানি দূর করিবার জন্য দেবতার অংশস্বরূপে মহাপুরুষদের জন্ম হয়। তাঁহারা সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া সমাজকে উদ্ধারের পথে আকর্ষণ করিতে থাকেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

দেশভেদে ও সমাজভেদে এই অবতারের স্বরূপের নানা বৈষম্য দেখা যায়। যে সমস্ত দেশ বা সমাজ প্রধানতঃ রাষ্ট্রশক্তির দিক দিয়া সার্থকতা লাভ করিবে, সেখানে যে সমস্ত লোকাতিশায়ী পুরুষের জন্ম হয়, তাঁহারা প্রায়ই যুদ্ধবীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সঙ্ঘর্ষে চারিদিকের ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। ইঁহাদিগকে World-Historical Individuals বলা যাইতে পারে। জীবনময় এঁদের সঙ্ঘর্ষ, এবং প্রয়োজন শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের তিরোধান। "If we go on, to cast a look at the fate of these World-Historicai persons whose vocation it was to be the world-spirit, we shall find it, to have been no happy one. They attained no calm enjoyment; their whole life was labour and trouble; their whole nature was nohting else but their master-passion. When their object is attained they fall off like empty hulls from the kernel. They die early like Alexander; they are murdered like Caesar; transported to St Helena like Napoleon." রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য ইঁহাদের জন্ম। কোনও পাপ বা অন্যায় করিয়াও যদি সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ইঁহারা তাহাতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহারা সেই এক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিয়াছেন। পথে যাহা

কিছু পড়ে সমস্ত পদদলিত করিয়া ইঁহাদের রথ ছুটিতে থাকে। "He is devoted to the One Aim, regardless of all else. It is even possible that such men may treat other great and even sacred interests inconsiderately ; may indulge in conduct which is indeed obnoxious to normal apprehension. But so mighty a form, must trample down many an innocent flower, crush to pieces many an object in its path." ইঁহাদের আদর্শেই Nietzche এর Superman এর আদর্শ গঠিত হইয়াছে।

এই লোকাতিশায়ী পুরুষদিগের তথ্য পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা সত্য ও বাধার মিলনে আর একটা নূতন স্তরে উপনীত হই। বিরাট মানবজাতি বা Humanityর সত্তা দ্বারা অবান্তর জাতি রাষ্ট্র বা সমাজগুলি অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক সমাজশক্তি আবার ব্যক্তিশক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। কাযেই ব্যক্তিশক্তির সমাজশক্তিকে ও সমাজশক্তির বিরাট মানবশক্তি বা Humanityকে বাধা দিবার সাধ্য নাই এবং এই বাধা দিবার চেষ্টাতেই পাপের সৃষ্টি। একদিক্ দিয়া দেখিলে অনন্ত, অসীম, কেমন করিয়া সান্ত ও সসীমকে আয়ত্তীভূত করিয়া রাখিয়াছেন তাহারই নিদর্শন পাইয়া থাকি। অপরদিকে তেম্নি সসীম ও সান্তের দিক্ থেকেই একটা প্রবাহ অসীমকে আন্দোলিত করে ও তাহার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, একথাও তেম্নি

সত্য। একদিকে যেমন সমাজের প্রাণশক্তি হইতেই ব্যক্তির সৃষ্টি অপরদিকে তেম্নি ব্যক্তিশক্তির প্রাণলাভেই সমাজের প্রতিষ্ঠা ও পোষণ। এক একজন লোকাতিশায়ী পুরুষের জীবনে এই সত্যটি এমন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে যে তখন আর ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার থাকে না। এক একটা সমাজ এক একটা দীর্ঘযুগের ইতিহাস একজন লোকের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। "A nation maketh a man" একথা যেমন সত্য, "A great man makes a nation" একথাও তেমন সত্য। সমাজের বাধা ব্যক্তি। ব্যক্তির বাধা সমাজ। সমাজশক্তির আলোড়নে ব্যক্তির সৃষ্টি। আবার ব্যক্তির আলোড়নেই সমাজের পোষণ। দুইটি বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া সেই বিরাটই আপনাকে সার্থক করিতেছেন। একের প্রতিঘাতে অন্যের পরিস্ফুরণ আবার একের শক্তির অন্যের মধ্যে স্বাভাবিক সংক্রমণে তাহার উপচয়। একটা প্রতিকূল ও আর একটা অনুকূল ধারা নিত্যই লাগিয়া রহিয়াছে।

ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না, কারণ সমাজের শক্তি ব্যক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এই হিসাবে ব্যক্তি সমাজের অধীন। আবার অপরদিকে সমাজের প্রাণপ্রবাহ যখন ক্ষীণ হইয়া আসে তখন সেই অভাবটুকু পূরণ করিবার জন্যই যেন লোকাতিশায়ী ব্যক্তির মধ্যে সেই শক্তির এক একটা অফুরন্ত উৎস আবির্ভূত হইয়া সমাজের গতিকে পরিবর্ত্তিত করে। এম্নি

করিয়া সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে নিরন্তর একটা যাতায়াত চলিয়াছে।

একদিকে যেমন ব্যক্তি সমাজকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, অপরদিকে তেম্নি লোকাতিশায়ী ব্যক্তিরা ( Historical individuals ) এক একটা সমাজকে নূতন নূতন ভাবে বাঁধেন এবং নূতন নূতন রাষ্ট্রশক্তির সৃষ্টি করেন। এই দুইটি তথ্যকে একত্র করিলে দেখা যায়, যে ব্যক্তিও সমাজকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না এবং সমাজও ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। অথচ এ দুইটিকে দুইটি পৃথক বস্তু ও বলা যাইতে পারে না, অথচ একেবারে অভিন্নও বলা যাইতে পারে না। একটি অপরটির আত্মস্বরূপ, একটি অপরটির বাধা। ইহাদের ভেদ এবং অভেদ, দ্বৈতত্ব এবং অদ্বৈতত্ব অচিন্ত্য। সাধারণ দৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায় তাহতেও আমরা দেখিতে পাই যে ব্যক্তি সমাজকে গড়ে কি সমাজই ব্যক্তিকে গড়ে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি ব্যক্তিচিত্তের একত্র সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যের ( psychological contiguity ) ফলে যে একটি অখণ্ড একত্ববোধ হয়, তাহা ছাড়া সমাজত্ব বা জাতীয়ত্ব কোনও জিনিষ আমরা দেখিতে পাই না, অথচ শুধু ব্যক্তিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও ব্যক্তির সমস্তখানিকে আমরা পাই না। সমাজও মানি ব্যক্তিও মানি এবং তাহাদের এই অচিন্ত্য সম্বন্ধও মানি।

রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া দেখিলে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধের

কথা আমাদের মনে উদিত হয়, ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিলেও আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এক একটা সমাজে এক এক দেশে বা কালে এক একটা স্তরের ধর্ম্মচৈতন্য উপস্থিত হয়, সেই সমাজের সমস্ত লোকেই তখন সেই অনুসারে আপনাদের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধকে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। দেশের এই সাধারণ ধর্ম্মবোধ কোনও সাধারণ ব্যক্তি অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এক এক বিশেষ বিশেষ সময়ে, এমন এক একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা এই সমাজের ধর্ম্মবোধকে পরিস্ফুট ও বিকশিত করিয়া নূতন সত্যের নবোন্মেষের জ্যোতিতে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" এই মহামন্ত্রকে দেশের মধ্যে প্রাণময় করিয়া তোলেন। লোকাতিশায়ী ব্যক্তিদিগের ( World-Historical individuals ) কায প্রধানতঃ এক একটা জাতি এবং যুগকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে মাত্র, কিন্তু মহাপুরুষেরা ধর্ম্মচৈতন্যের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ও বিকাশকে আনয়ন করেন তাহা কোন একটা জাতি বা সময়কে উপলক্ষ্য করিয়া আরব্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য সমস্ত মানবজাতির ( Humanity ) একটা নূতন পরিবর্ত্তন সম্পাদন করে। ইহুদি জাতির মধ্যে যতটুকু ধর্ম্মচৈতন্য জাগ্রত হইয়াছিল তাহাতে আমরা দেখি যে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই উভয়ের মধ্যেই যে, দেবতার যুগপৎ একই অধিষ্ঠান, অন্তর যাঁহার লীলাক্ষেত্র, বাহিরও যে তাঁহারই প্রচারভূমি, এ তত্ত্বের সেখানে সাক্ষাৎ নাই। তাই অন্তর

ও বাহিরের মধ্যে সেখানে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই অদ্বৈত ঈশ্বর এই দ্বন্দ্ব কোনও দিন দূর করিবেন এই অপেক্ষায় ও বিশ্বাসে তাঁহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার আত্মবলিদানে প্রস্তুত থাকিতেন, কিন্তু কেমন করিয়া দেবতা এই বিরোধ পরিহার করিবেন সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনও বোধ ছিল না। ইহুদিরা অনেক দিনের চেষ্টার পর শুধু এইটুকুতে আসিয়াছিলেন যে ঈশ্বর শুধু তাঁহাদের জাতির জন্য নয়, তিনি সকলের জন্য। কিন্তু যিনি অন্তরে অন্তর্যামী তিনিই যে বাহিরে সমাজরূপে বিরাজ করিতেছেন ইহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। অন্তরে বাহিরে সত্যকে দেখিতে না পাওয়াতে পাপের স্থান কোথায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না, এবং কেনই বা পাপের একটা আপাততঃ জয় দেখা যায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না। শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন যে এমন একদিন আসিবে, যেদিন এ দ্বন্দ্বটুকু তিনি ঘুচাইয়া দিবেন। এইখানেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-চৈতন্যের সঙ্গে ইহুদি ধর্ম্মচৈতন্যের প্রভেদ। অন্তরে বাহিরে যে একই দেবতা আপনাকে প্রকট করিয়া রখিয়াছেন এই তথ্যটুকু খ্রীষ্টের হৃদয়ে, মনে ও জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বোধের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিরোধ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। "God is now conceived as in all objective religions as a merely natural power, or as the unity of all natural powers nor again is He conceived as in subjective

religions as a spiritual being outside human nature and dominating over it. He is conceived as manifesting Himself alike in the whole process of nature and in the process of spirit as it rises above nature. In other words God is to Christianity as spirit is in subjective religions ; but He does not exclude nature, nor is He external to it except in the sense that He is limited to it. He is *immanent in nature as in objective religion, but* He also *transcends it*, and makes it a means to the higher life of spirit." ইহুদি ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রভেদ দেখাইয়া কেয়ার্ড বলিয়াছেন :—"The assertion of God's universal relation to all men and to all nations is true, as against the conception of Him as the head whether by natural relationship or by arbitrary choice, of a particular race, but it is false if it be taken to involving that He is a God who does not manifest Himself in the concrete social life of humanity or bind men together as the members of one society...............The Jewish prophets said that the true sacrifice was not the outward offering

of bullocks on the altar, but the willing and joyful submission of the soul, to the divine law of love. But this "not' of the prophets translated itself in practice into a "not merely," and it was therefore powerless to create a new order of social life, though it might do something to put a new spirit into the old order. The temple service might be despised, or regarded as insufficient, but it still furnished the basis from which the Jew's aspirations after something higher had to start and to which they always returned. But Christianity absolutely rejected all mechanical observance of external rules detached from the spirit of life. Ritual ceased to be the service of God, as soon as that service was separated from the idea of obedience to a law externally given, and was conceived as the necessary outward expression of a divine principle which united men to each other as members of one divine-human society. In other words, the true service of God lay henceforth in those works of mercy and justice which were need-

full to make human society into a manifestation of divine love."

ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলেও দেখিতে পাই যে মীমাংসাযুগের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, আচার, নিয়ম ও কর্ম্মকাণ্ডের একান্ত বাহ্যিকতা ও প্রাণশূন্যতার ফলে ভারতবর্ষের ধর্ম্মচৈতন্যের উপনিষদযুগের মধ্যে যে নব জাগরণ দেখিতে পাই, তাহাতে বাহ্য বেদবিধান হইতে সত্যের প্রতিষ্ঠানকে একেবারে অন্তরের অন্তর্য্যামীতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। "য এষঃ অন্তর্যময়তি," "তৎসত্যং তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি," "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" এই সমস্ত বাক্যাবলি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই যুগের বোধিতে বাহ্য কর্ম্ম-কোলাহল হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাঁহারা অন্তরের অন্তর্যামীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জগৎটা তাঁহাদের নিকট হইতে যেন ক্রমশঃ সরিয়া পড়িতে লাগিল, জগৎকে, জগতের মানুষকে, জগতের সমাজকে তাঁহারা তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই বোধকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মীমাংসকদিগের বাহ্যিক কর্ম্মনিয়মে সত্যের প্রতিষ্ঠা, ও উপনিষদদিগের অন্তর্যামীতে সত্যের প্রতিষ্ঠা, এই উভয়দিকে যতটুকু সত্য ছিল তাহা একত্র হইয়া বুদ্ধদেবের মনে উদিত

হইয়াছিল। একটি অখণ্ড কর্ম্মনিয়মের মধ্যে তিনি ভিতর বাহিরকে সম্মিলিত করিলেন। কি চৈত্তিক, কি ভৌতিক, সমস্ত বস্তুজাতই এক অখণ্ড নিয়মে উৎপন্ন হইতেছে, ভিতরে বাহিরে কোনও বিরোধ নাই, কোনও দ্বন্দ্ব নাই। আণবিক সমষ্টিতে যেমন বাহ্যজগৎ, রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার এই পঞ্চস্কন্ধের সংঘাতেও তেমনি অন্তর্জগৎ। ভিতর বাহিরের চঞ্চল প্রবাহের মধ্যে মানুষের বুদ্বুদ উত্থিত ও লীন হইতেছে। উত্থান ও লয় ইহাই সংসারের নিয়ম। স্থির হইয়া কিছুই নাই। এই কর্ম্মের প্রবাহ, ভিতর বাহির সর্ব্বত্র আপনাকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, এই বিরাট অভিযানই একমাত্র সত্য। এই বিরাট অভিযানের মধ্যে ভিতরে, বাহিরে, মানুষে মানুষে, জীবে জীবে, জীবে জড়ে, সর্ব্বত্র যে একটি পরম ঐক্য নিহিত রহিয়াছে তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের নব জাগরণ। এই জাগরণের ফলে, মানুষে মানুষে প্রীতি, সর্ব্বভূতে অহিংসা, একটা বিশ্বজনীন মৈত্রী, কঠোর উপনিষদ্‌ব্রতের স্থান অধিকার করিল। ধর্ম্মচৈতন্যের এই নবোন্মেষে সমাজে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, শিক্ষায়, লোকহিতকর কার্য্যে, ধর্ম্মে, দর্শনে, সমস্ত দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজের মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা অবগত আছেন।

কিন্তু ধর্ম্মের যে একটা প্রধান উপকরণ "ভক্তি" সে দিক্‌টা এই বৌদ্ধধর্ম্মেও স্থান পায় নাই। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে সেই একের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যেমন তত্ত্বদর্শনের কায, ধর্ম্মের কায

তেমনি এই তত্ত্বকে ভক্তি দ্বারা হৃদয়ে সার্থক করিয়া তোলা। ভিতর ও বাহিরকে নিয়ম দিয়াই এক করি, কি কর্ম্মপ্রবাহ দিয়া এক করি, তত্ত্ববিদ্যা তাহাতে ব্যাকুল হইবে না; কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান কথাই হইল এই যে আমরা ভক্তি ও পূজার উপহারে আমাদের অন্তরকে সেই বিরাটের উদ্দেশে নিবেদন করিব। আমাদের সার্ব্বজনীন হৃদয়ের এই পূজা ও ভক্তিবৃত্তির মধ্যে আমরা সত্যের যে মূর্ত্ত বিগ্রহ পাই, শুধু তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি কেমন করিয়া হইবে। এই মূর্ত্ত পূজাই সকল ধর্ম্মের বিশেষত্ব। জ্ঞাননেত্রে তাঁহার সত্যরূপ নিরীক্ষণ করিব, হৃদয়ের রসের দ্বারা তাঁহার নিকট আপনাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত চিরযুক্ত হইয়া রহিব এবং কর্ম্মের দ্বারা রসে ও জ্ঞানে যাঁহাকে পাইয়াছি তাঁহার সেবা করিব, ইহাই ধর্ম্মের আদর্শ। ধর্ম্মে যে বস্তুটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তত্ত্ববিদ্যায় তাহারই একদেশ মাত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে এই যে অভাবটুকু রহিয়া গিয়াছিল, তাহারই পরিপূরণের জন্য একদিকে পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল ও অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার আরম্ভ হইল। অবিরল প্রবাহে আবির্ভূত হইয়া যে সমস্ত বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ ভারতীয় সমাজের মধ্যে ধর্ম্মচৈতন্যের নবোন্মেষ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়াও কেবল মাত্র সকলের শেষে যিনি আসিয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্যের দিকে লক্ষ্য করিলেও সমস্ত বৈষ্ণব সাধনার যথার্থ সারটুকু আমরা বুঝিতে পারি।

যে সময়ে তিনি নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময় শুষ্ক তর্কশাস্ত্র আসিয়া গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল, অর্থহীন এবং সঙ্কীর্ণ স্মৃতির বাঁধন আসিয়া সমাজকে নাগপাশে বাঁধিয়া তুলিতেছিল, তান্ত্রিকতার আবর্জ্জনাগুলি দেশময় ছাইয়া পড়িতেছিল। উদারহৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের এই দারুণ দুরবস্থায় বিপর্য্যস্ত ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছিলেন।

'প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার।
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ;
লোকগতি দেখি আচার্য্যের করুণ হৃদয়
বিচার করেন লোকের কিসে হিত হয়।'

সমাজের তত্ত্বচৈতন্য ও ধর্ম্মচৈতন্যের এই দারুণ দুর্ব্বিপাকের সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। যেমন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ও তাঁহার চরিত্রকে পৃথক করা যায় না, মহাপ্রভুর ধর্ম্মও তেম্‌নি তাঁহার চরিত্র হইতে কোনও ক্রমে পৃথক করা যায় না। তাঁহার সমস্ত জীবনময় যেন একটি নবচৈতন্যের জাগরণ। সমস্তদিক্ থেকে তাঁহার জীবনের যে চিত্রটি আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুসমঞ্জসভাবে একটি পূর্ণজীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ধর্ম্মের পথে ভক্ত আপনাকে ভগবানের নিকট নিবেদন করে;

সসীম অসীমের সংস্পর্শে নবজীবন লাভ করে। শুধু জ্ঞানের দিক্ দিয়া যখন মানুষ দেবতার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তখনই তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা বলি, কিন্তু শুধু জ্ঞান না হইয়া যখন রসের পথে, ভাবের পথে, এই মিলন সাধিত হয় তখনই আবার তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়। জ্ঞানের পথের মিলনেও যেমন বিবিধ প্রস্থান এবং বিবিধ স্তর রহিয়াছে, ভাব ও রসের পথের মিলনেরও তেম্‌নি বিবিধ স্তর রহিয়াছে। ভয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, দাস্য, প্রভৃতি নানাভাবেই, নানা ধর্ম্মে, এই মিলনের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবান যে একই সত্তার দুইটি রূপ, একটি সত্য, অপরটি বাধা, একটি কৃষ্ণ, অপরটি রাধা, এবং ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই যে পরস্পরকে আস্বাদ করিবার জন্য ব্যগ্র, ভগবানের আত্মাস্বাদের প্রবৃত্তিতে, স্বগত-প্রীতির বিকাশেই যে ভক্তের জন্ম এ কথা এ পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের মত কেহই বলিতে পারেন নাই। একই তত্ত্ব যেমন সত্য ও বাধার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে জগদ্ব্যাপারকে মূর্ত্ত ও সার্থক করিয়া তুলিতেছে, এই দুইয়ের বিরোধে ও সংযোগে, যেমন সমস্ত সম্বন্ধ সত্তাময় হইয়াছে, তেম্‌নি একই প্রীতি, একই আনন্দ আপনাকে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য ভক্ত ও ভগবানরূপে বিভক্ত হইয়া তাহাদের যুগল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সার্থক হইয়া চলিয়াছে। ভগবানের সহিত মানুষের যে এই স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ মাধুর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই রসে দ্রব হইয়া যদি মানুষ তাঁহার সহিত একত্র হইতে চেষ্টা করে তবে সেই চেষ্টার ফলেই

জীব ও জগতের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধটি আপনিই তাহার প্রাণের মধ্যে যুগপৎ আবিষ্কৃত ও আবির্ভূত হয় এবং ধর্ম্মের সমস্ত বাহ্যাড়ম্বরগুলি মিথ্যা হইয়া অপসৃত হইয়া যায়। দেবতা শ্রীচৈতন্যের মধ্য দিয়া এই মাধুর্য্যরস আস্বাদ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে তাৎকালিক সমাজের সমস্ত হীনতা ও দারিদ্র্য বহুদূরে অতিক্রম করিয়া তিনি যে আদর্শে বিকশিত হইয়াছিলেন, সেখানে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দুর্ব্বলতা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। দেবতা যে ভক্ত হইয়া আপনারই রস আস্বাদ করিয়া থাকেন, প্রেমজগতের এই নূতন তথ্যের আবিষ্কারের জন্যই শ্রীচৈতন্যের অবতার।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

বিরাট যেমন ধাপে ধাপে নেমে এসে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষোদীয়ানে পৌছিয়াছেন, ক্ষুদ্রগুলিও তেমনি গিয়া সেই বিরাটে নানা পথে পৌছিয়াছে, উভয় দিক্ দিয়ে বুঝতে যাওয়ার চেষ্টাতেই বাস্তবিক বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়।

তর্কশাস্ত্রের পথে আমরা দেখি যে তাঁর কোনও একটা প্রকাশ যদি আমরা ধরিতে পারি, তাহলে সেই প্রকাশ থেকে ধরে ধরে সম্বন্ধ যোজনা করে ক্রমশঃ সেই প্রকাশ কেমন করে ছোট হয়ে

অত্যন্ত খণ্ডের মধ্যে এসে পড়েন তা আমরা ঠিক্ করিতে পারি। ডিম্ব প্রসবের সহিত গিলিয়া খাওয়ার এবং গিলিয়া খাওয়ার সহিত গালাসীর দাঁতের এবং গালাসীর দাঁতের সহিত কুমীরের তুল্য সম্বন্ধ আছে জানিয়া সম্বন্ধ যোজনা করিয়া ডিম্ব প্রসব ব্যাপারের সহিত কুমীরের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। এম্‌নি করে কোনও একটি বিরাট প্রকাশের সন্ধান পেলে আমরা ক্রমশঃ তিনি যে কোন্ কোন্ যায়গায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তা বের কর্‌বার জন্য চেষ্টা করি, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপকগুলির সন্ধান পেয়ে সেগুলিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছোট ছোট খণ্ডের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ব্যাপ্যের মধ্যে লাভ করিতে চেষ্টা করি, এবং বুঝিতে চেষ্টা করি যে সেই বিরাট প্রকাশ কোন্ পথ দিয়ে এসে ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজকে পরিব্যাপ্ত ও পরিস্ফুট করেছেন। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্য প্রকাশগুলি, ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে, বাঁধুনি আছে; কারণ ইহাদের বড় বড় অন্যান্য ব্যাপকের তুলনায় এরা আবার ক্ষুদ্র এবং ইহাদের মধ্য দিয়ে সেই বৃহত্তর ব্যাপকগুলি সিদ্ধ ও পরিস্ফুট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে আমাদের এমন সাধ্য হয় না যে আমরা একটি ব্যাপ্য থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ক্রমশঃ বৃহত্তর ব্যাপক, বৃহত্তম ব্যাপক এই ক্রমে একেবারে গিয়ে সেই বিরাটে পৌছিতে পারি। বিরাটই এই সমস্ত হয়েছেন এটা আমরা কোনও রকমে বুঝ্‌তে পার্‌লেও তিনি যে কোন পথে এই সব হলেন তা আমরা বল্‌তে পারি না,

তাঁর গতি আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্য প্রকাশগুলি, এদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে তা আমরা বুঝতে পারলেও সে সম্বন্ধটা যে কি তা আমরা অনেক সময়ই বুঝিতে পারি না। ছোট ছোট ব্যাপ্যগুলি হয়ত অতি কষ্টে আমরা ধরিতে পারি কিন্তু তার পর সেই সব ব্যাপ্যগুলি আবার কেমন করিয়া পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আর কোনও বৃহত্তর ব্যাপকের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা ক্ষুদ্র, খণ্ড, আমাদের জ্ঞানও ক্ষুদ্র, এবং সসীম, তাই আমাদের বুদ্ধিটা ক্ষুদ্রের গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা পড়ে থাকে। ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়ে যখন আমরা কোনও বৃহত্তর ব্যাপককে পেতে চাই তখনই সেটা আমাদের কল্পনা দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়। আমাদিগের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচটি দিয়াই বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে। এই পাঁচটা দিয়ে আমরা যে সমস্ত সন্ধান পাই সেগুলি সমস্তই ক্ষুদ্র। এই সব ক্ষুদ্রের পিছনে যে ব্যাপক পড়ে রয়েছে, আমাদের চক্ষু, আমাদিগকে তার কোন সন্ধান দিতে পারে না। তাই আমরা কতগুলি ক্ষুদ্রকে এক সঙ্গে সাজিয়ে দেখি যে তাদের মধ্যে কোন্ সত্যটি গোপনে লুকিয়ে রয়েছে; যখন অনেকগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখতে দেখতে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে তাদের মধ্যে এই সত্যটি নিভৃতে লুকিয়ে রয়েছে, এবং সকলকে ব্যেপে রয়েছে, তখন সেটাকেই আমরা ব্যাপক বলে ধরে নিই। এবং সেইখান থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ নূতন নূতন

স্থানে যোজনা করে ক্ষুদ্রে এসে পৌছিয়ে দেখি মেলে কিনা, এই জ্ঞান দ্বারাই আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ করি। একদিকে বিরাট আপনাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফুটাইতে ফুটাইতে, প্রসারিত করিতে করিতে, এই সমস্ত ক্ষুদ্রে পরিণত হয়েছেন; অপরদিকে এই ক্ষুদ্র থেকে আপনাকে প্রসারিত করিতে করিতে সেই আপন বিরাটে গিয়ে পৌছবেন্ এবং এই হলেই তাঁর আপনার মধ্যে আপনার পূর্ণতালাভ জয়যুক্ত হয়ে উঠ্‌বে। শুধু নামের মধ্য দিয়া এই তথ্যটিকে দেখাই তর্কশাস্ত্র বা Logicএর কায। বৃহৎ হইতে যখন ক্ষুদ্রে যাই তখন বলি deduction এবং ক্ষুদ্র হইতে যখন বৃহতে যাই তখন বলি induction। বস্তুতঃ ইহা একই ব্যাপারের দুইটি দিক্ মাত্র। এ দুটিকে পৃথক করিবার কোনও উপায় নাই। বিরাট যেমন আপনাকে একদিকে প্রসারিত করিতে করিতে ক্ষুদ্রে আসিয়া পৌছেন, ক্ষুদ্র হইতে তিনি আপনাকে অপরদিকে তেমনি প্রসারিত করিতে করিতে বিরাটে গিয়ে পৌছেন।

যার প্রসারের পথ বাঁধা আছে তার সঙ্কোচের পথও বাঁধা আছে; কাজেই সেস্থলে প্রসার বলিলে যাহা বুঝায়, সঙ্কোচ বলিলে ঠিক্ তার বিপরীত গতিটাই বুঝায়, দুইটা দুদিকে। কোনটা দিয়েই কোনটার আনাগোনার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর ত কোন বাঁধা পথ নেই যে এইটেই তাঁর সঙ্কোচ এবং এইটেই তাঁর প্রসার; যেটা বাঁধা জিনিষ তারই এক একটা বাঁধা পথ থাকে, একটা অগ্র-

পশ্চাৎ থাকে, কিন্তু যিনি অখণ্ড যাঁর পথে কোনও বাধা নেই, যাঁকে রুখবার কেউ নেই, যাঁর সম্বন্ধে একথা বলা চলেনা যে ইনি এইটুকু, ইনি এখানেই আছেন; তাঁর পথ কি করে নিয়ম করে দেওয়া যায়; কি করে একথা বলা যায় যে ইনি এদিক্ থেকে এগিয়ে গিয়েছেন কাজেই এই হচ্ছে এর সম্মুখ আর এইটে হচ্ছে পিছন। যখন তাঁর কোনও একটা দিক্ ধরে নিয়ে চিন্তা করি তখনই আমরা তাঁর একটা সম্মুখ এবং একটা পিছন কল্পনা করি। যখন বিরাটের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা করি তখন মনে হয় যে বিরাটের কাছে সেটা অপূর্ণতা! বিরাটকে যতক্ষণ বিরাট ভাবেই কল্পনা করা যায় ততক্ষণ যেন তাঁকে সেইখানেই আবদ্ধ বলে মনে হয়। বিরাট যদি খণ্ড না হতে পারেন তবে তাঁর সেটা একটা দৈন্য, একটা বাধা, একটা অভাব। তাই বিরাটের দিক্ থেকে দেখতে গেলে বিরাট তাঁর বাধাকে অতিক্রম করে তাঁকে প্রসারিত করছেন, এটা ভাবতে গেলেই মনে হয় যে তিনি খণ্ডের দিকে চলে আস্‌ছেন। তাঁর এই খণ্ডের দিকে আসাটাকেই আমরা যেন তাঁর প্রসার বলে মনে করে নিই, তিনি নিজের বাধাকে ক্রমশঃ নিজের মধ্যেই স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত বাধা গুলি একে একে উল্লঙ্ঘন করে একেবারে খণ্ডতে এসে পৌছান। তাঁর বাধা গুলি ক্রমশঃ তাঁর মধ্য দিয়েই গৃহীত হয়ে তাঁর সত্যের আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই স্তরে আসিলে আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার বিপুল প্রস্থানকে আমরা যে প্রকাশ ও বাধার দ্বন্দ্ব ও মিলনের মধ্য দিয়া

গ্রহণ করিয়াছিলাম, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহাও ঠিক নয় ; কারণ প্রকাশ ও বাধা ইহারা উভয়েই ত আপেক্ষিক, কেহইত তাত্ত্বিক নয়। তাত্ত্বিক শুধু তিনি নিজেই ; এ দুটিই আমাদের কল্পনা মাত্র। তাঁর যাত্রা সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণে। "পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে॥ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" তিনি পূর্ণ, তাঁর গতিও পূর্ণ। তাঁর কোনও অগ্র-পশ্চাৎ নাই। প্রকাশ ও বাধা বলিয়াও তাঁহার কোনও তাত্ত্বিক পার্থক্য বা ভাগ নাই। আমাদের বোধের সৌকর্য্যের জন্য আমরা তাঁহার গতিকে ঐভাবে দেখিয়া থাকি।

তিনিই এই সমস্ত হয়েছেন ; সমস্ত খণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনিই পরিণত হয়েছেন। আবার যখন খণ্ডে এসে পৌছি তখন দেখি যে খণ্ড অখণ্ডের মধ্যেই পড়ে আছে, এর বৃদ্ধি হতে গেলে ত আর খণ্ডের দিক্ দিয়ে হতে পারেনা ; খণ্ড যে অনন্ত নয়, সেইটেই হচ্ছে তার বাধা, তার অভাব। খণ্ড যত অনন্তের দিকে উঠ্‌তে পারবে, ততই তার বাধা ঘুচবে। অতএব খণ্ডের উন্নতি দেখ্‌তে হলে, তার প্রসার দেখতে গেলে, অনন্তের দিকেই দেখতে হবে। সে যে খণ্ড, সেই খানেই তার একটা বাধা, এবং অভাব। সে যে অনন্ত নয়, তাই তার বৃত্তি সেই দিকেই সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে, তাই তার প্রসার দেখতে গেলে সেই অনন্তের দিকেই খুঁজতে হবে। তাই আমরা দেখ্‌তে পাই যে খণ্ড তার বাধাগুলিকে একে একে নিজের মধ্যে গুছিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে, নিজের প্রসারের পথে, বৃদ্ধির পথে, অনন্তের পথে, ছুট্‌তে ছুট্‌তে বিরাটের মধ্যে প্রবেশ করে।

এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে প্রকাশকেই বাধা বলে মনে হয় পূর্ণতাকেই অপূর্ণ বলে মনে হয়, এবং আর এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে অপূর্ণতাকেই পূর্ণ বলে মনে হয়। এটা ঠিক করে বলবার উপায় নাই, যে এইটেই সত্য আর এইটেই বাধা, এইটাই পূর্ণ আর এইটা অপূর্ণ।

সত্য যে তাঁর আপন আত্মলাভের চেষ্টায় অসীম হইতে সসীমে, ও সসীম হইতে অসীমে, বিরাট হইতে ক্ষুদ্রে ও ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে নিত্য গমনাগমন করিতেছেন এইটুকুই তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব। বিরাট্ হইতে ক্ষুদ্রে, ও ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে, অনন্তের যে এই বিবিধ বিচিত্র ক্রমবিস্তার চলিয়াছে, সকল তত্ত্বান্বেষিরা চিরদিন ধরিয়া এই লীলাতত্ত্বই অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। নানা শক্তি কেমন করিয়া এক শক্তিতে আপনাকে পর্য্যবসিত করে ও এক শক্তিই বা কেমন করিয়া নানাশক্তিতে আপনাকে প্রকট করিতেছে, জড়বৈজ্ঞানিকেরা তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। একই প্রাণ নানা প্রাণীর মধ্যে কেমন করিয়া বিচিত্র প্রসারে অপরিসঙ্খ্যেয়ভেদে আপনাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন, প্রাণতত্ত্বের তাহাই আলোচনার বিষয়। রূপ হইতে রূপান্তরে যে উৎপত্তি লয়ের খেলা চলিতেছে, তাহা সেই অরূপেরই রূপলীলা, এই অপূর্ব্ব পরিণামের ইতিহাসেই সমস্ত রূপজগৎ পরিপূর্ণ। অরূপ রূপে ফুটিয়া উঠে, এবং রূপ অরূপে লয় পায়, ইহাই যেমন বাহ্যজগতের একদিকের সফলতা, অপর দিকে তেমনি সমস্ত রূপসম্ভার

লইয়া বিরাট ভৌতিক জগৎখানার যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহের জন্য একটি চিত্তজগতের প্রয়োজন। সেই জন্যই আমরা দেখি যে রূপ হইতে প্রাণের বিকাশ ও প্রাণ হইতে চিত্তের বিকাশ। প্রাণের নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে রূপজগৎ ও চিত্তজগৎ সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে। তিনিই যেমন "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ," তেমনি "স উ দেবঃ প্রাণস্য প্রাণঃ" আবার "মনসো মনঃ।" প্রাণশক্তির লীলাভূমির মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ আপন ভৌতিক ও চৈত্তিকস্বরূপের মিলানাস্বাদ সম্ভোগ করিতেছেন। যেমন ভৌতিক জগতের মধ্যে নানা-রূপের লীলায় আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন, তেমনি চৈত্তিকজগতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই যে এখানেও সেই অন্ত ও অনন্তের পরস্পর আত্মপরিণতির লীলা সেই একই ভাবে চলিয়াছে। সেই চৈতন্যস্বরূপ বহু হইবার ইচ্ছায়, একদিকে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপে বিষয়চৈতন্যের রূপসম্ভারকে সংগ্রহ করিতেছেন ও প্রাণশক্তির মধ্যে নানাবৃত্তিময় করিয়া সেগুলিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন ও অপরদিকে সেইগুলির অসংখ্যেয় রূপের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এক দিকে তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, অপরদিকে তেমনি, "ন তত্রচক্ষুর্গচ্ছতি নো বাগ্ গচ্ছতি নো মনো" সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।

সেই অরূপ চিৎস্বরূপ একদিকে যেমন রূপময় বিষয়চৈতন্য, ও আত্মস্বরূপ প্রমাতৃচৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন, অপর দিকে আবার

তিনিই তেমনি এই উভয়ের মিলনস্বরূপ নামময় প্রমাচৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন। এই মিলনের তত্ত্ব অন্বেষণ করিবার জন্যই মনোবিজ্ঞান বা Psychology ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার এই প্রমাচৈতন্যের মধ্যে যখন তিনি নামময় (conceptual) হইয়া উঠিলেন, তখন দেখি যে নামধারায় তিনি অন্ত হইতে অনন্ত পর্য্যন্ত, ব্যাপকতম হইতে ব্যাপ্যতম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই বিচিত্রতার অনুসন্ধানেই যে তর্কশাস্ত্রের সফলতা, গ্রন্থারম্ভেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাইয়াছি। আবার এই সমস্ত বৃত্তি, নাম, প্রভৃতি চৈত্তিক উপাদানসম্ভারে যখন তিনি মনঃশরীরে স্থূলশরীরে শরীরী হইয়া বাহ্যজগতের সম্মুখে অসংখ্যেয় শরীরীর মধ্যে দাঁড়ান ও তাহাদের সহিত ব্যবহারে আপনার মিলনবৃত্তিকে ও প্রাণবৃত্তিকে সার্থক করিতে চান, তখন সমস্ত ক্ষুদ্রতার সীমাকে অতিক্রম করিয়া একটি অসীম কর্ত্তব্যের বাণী আসিয়া সমস্ত খণ্ড, ক্ষুদ্র ও সসীমকে প্রাণসঞ্চারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। এই বাণীর মধ্যে মানুষ দেখিতে পায় যে, সে তার সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব, সমস্ত খণ্ডত্ব, ব্যক্তিত্ব পরিহার করিয়া আপন অনন্ত অসীম সত্তাকে অনুভব করে। নিজের ভাল বলিয়া পৃথক করিয়া সে কিছু লইতে পারেনা, সে চায় শুধু "ভালকে।" সকলের "ভালর" মধ্যে যে "ভাল" সফল হইয়া রহিয়াছে, সে চায় শুধু সেই "ভালকে"। তার কাযের মধ্যে সে এমন একটা প্রাণশক্তির ব্যাপক, অখণ্ড, প্রেরণা অনুভব করে, যে তার ক্ষুদ্রতার ভারে

সে কোনও রকমেই সেটিকে মুচ্ড়াইতে পারে না। তার প্রবৃত্তির মধ্যে যে নানাত্ব ছিল, এই ব্যাপক প্রেরণার তাড়নায় সেগুলি সেই একে পরিণত হয়। প্রবৃত্তি বা ব্যক্তিত্বের নানাত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সহিত এই ব্যাপক বিবেকের অন্তঃপ্রেরণার মিলনের যথার্থ তথ্যটি অনুসন্ধান করিবার জন্যই "Ethics" বা নীতিশাস্ত্রের সৃষ্টি।

কর্ম্মের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিকে ভূমার পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া যেমন নীতির ক্ষেত্র, তেম্‌নি জ্ঞানের মধ্য দিয়া সত্যের যথার্থ স্বরূপকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় তত্ত্ববিদ্যা বা Philosophyর সৃষ্টি। জগদ্ব্যাপারের অন্তর্নিহিত বস্তুতত্ত্বটির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, আর সমস্ত ক্ষুদ্র ও খণ্ড প্রত্যয় সমূহকে (experience) তাহার মধ্যে অন্তর্ভূত ও তাহার অঙ্গীভূত করিয়া দেখাই তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির যে বিভাগের দিকেই নিরীক্ষণ করি না কেন, দেখিতে পাই যে নানা বিচিত্র উপায়ে স্তরে স্তরে সেই ভূমা আসিয়া, খণ্ডের মধ্যে আপনাকে পরিণত করিয়াছেন। কি বাহ্যজগতের জড় ও প্রাণের লীলা, কি অন্তর্জগতের চিৎ ও প্রাণের লীলা, কি বাহ্যান্তর্জগতের সমাজ ও ব্যক্তির লীলা, সৃষ্টির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বত্রই অখণ্ডের খণ্ড হইবার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দিকে আমাদের ব্যাপারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে, খণ্ড হইতে অখণ্ডে ফিরিয়া যাওয়ার একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অখণ্ড

যেমন আপনার বিরাট্ ও অখণ্ড মূর্ত্তিতে তৃপ্ত না হইয়া আপনার খণ্ডমূর্ত্তিকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই অলৌকিক উপায়ে আপনাকে খণ্ডমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত করিতেছেন, খণ্ডও তেম্নি তাহার সর্ব্ববিধ কার্য্যের দ্বারা আপনাকে অখণ্ডের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। খণ্ড অখণ্ডের মূর্ত্তিতে ও অখণ্ড খণ্ডের মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা পরস্পরকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া, এই যুগল বিগ্রহে যে সেই একই মূর্ত্তির প্রকাশ তাহা প্রমাণ করিতেছে।

সত্যের এই মূর্ত্তিকে যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তত্ত্বানুশীলিরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নানা দেশে নানাভাবে এই তথ্য আভির্ভূত হইয়াছে। এক একজন এক এক সময় এক এক দিকে ঝোঁক দিয়া সত্যের স্বরূপকে এক এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যের অপরদিকটা তাঁহাদের চোখেই পড়ে নাই। কেহ কেহ কোন্‌টি যথার্থ মূর্ত্তি তাহা বুঝিতে না পারিয়া সংশয়ী ( sceptics ) হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ বা খণ্ড এবং অখণ্ডের মধ্যে যে আত্মপরিণামের ব্যাপারটি রহিয়াছে, সেইটুকুকেই প্রধান মনে করিয়া চলত্বকেই প্রধান করিয়াছেন।

সত্যের চিন্ময়রূপের সহিতই আমরা বিশেষ ভাবে পরিচিত তাই অনেকে সত্যকে চিৎস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া জড়জগতের খণ্ড ও ক্ষুদ্রের সহিত তাহার মিলনকে অযথার্থ ও মিথ্যা

বলিয়াছেন। এই মিথ্যাই কাহারও চক্ষুতে ভ্রম বলিয়া মনে হইয়াছে, কাহারও চক্ষুতে মায়া বলিয়া বোধ হইয়াছে। কাহার ও কাছে উপরজ্য উপরঞ্জকতা ভাবে বোধ হইয়াছে। কেহ বা আবার এই অনন্ত চিজ্জগৎ ও খণ্ড সসীম বাহ্যজগতের মিলনের তথ্যটিই ধরিতে না পারিয়া বাহ্যজগতকে দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় বলিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং কেহ বা অন্তর হইতেই বাহিরের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেহ বা চিৎরূপী বিরাটের সহিত, অচিৎ বা জড়রূপী খণ্ডের মিলন সাধনের জন্য, চিৎ ও অচিৎ উভয়কে এক পরমেশ্বরের দেহ ও মনরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেহবা এক চিৎএর স্বগত প্রকাশ ও বাধার স্বাভাবিক গতিতে প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য, অখণ্ড ও খণ্ড, উভয়ই আবির্ভূত ও নিরন্তর সম্মিলিত হইতেছে এই সার সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের সমস্ত প্রকারের ব্যাপার সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকাশ (position) ও বাধা (negation), এই দুই শরীরের মধ্যে সেই অশরীরী চিন্ময়ের নিত্য বিলাস দেখাইয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই প্রকাশ ও বাধার স্বকীয় আকর্ষণ বিকর্ষণের দোলা চলিয়াছে, এবং সেই দোলার ফলেই অখণ্ড হইতে খণ্ড ও খণ্ড হইতে অখণ্ডে সেই বিশ্বদেবতা ত্রিবিক্রমের ত্রিপাদবিক্ষেপ সার্থক হইয়া চলিয়াছে এই পরম তথ্যের প্রচার করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে চিন্ময়ের স্বভাব এই, যে তিনি প্রকাশ ও বাধার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আপনাকে

প্রকট না করিয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না। অখণ্ড হইতে খণ্ডে ও খণ্ড হইতে অখণ্ডে চিৎস্বরূপের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত ও প্রত্যাবর্ত্তিত হওয়াই তাঁহার স্বভাব ও সার্থকতা। আবার নব্যদার্শনিক Bergson প্রাণশক্তির স্বাভাবিক উন্মেষেই চিৎ ও অচিৎএর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এম্‌নি করিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের যুগলমিলনের তত্ত্বটি বিষয়ভেদে ব্যাপারভেদে, যুগভেদে, দেশভেদে ও কালভেদে নানাভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং চিৎএর দিক্ দিয়া, প্রাণের দিক্ দিয়া গতির দিক্ দিয়া নানাভাবে তত্ত্বানুশীলিরা তাহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধ যে শুধু চিন্ময় বা প্রাণময় নয়, ইহা যে একান্তভাবে একটি প্রেমেরও সম্বন্ধ এই নিগূঢ় রহস্যটি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যুগে যেমন স্ফুট হইয়াছে এমন আর কখনও নয়।

আমরা খণ্ড ও সসীম বলিয়া সেই বিরাট ও ভূমাকে চাই। তাঁর সঙ্গে মিশিবার জন্য তাঁর মধ্যে আমাদের খণ্ডতাকে ডুবাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি। তিনি আমাদের খণ্ডতাকে চাহিয়া নিজে আপনাকে খণ্ডরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যহ আমাদের দ্বারে আসিয়া তাঁর সত্তা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন এবং আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁরই অতুল প্রেম আমাদের প্রাণের মধ্যেও প্রেম জাগাইয়া দিয়াছে। তাঁর

স্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের চান এবং আমরাও আমাদের স্বরূপ বলিয়াই তাঁহাকে চাই। তিনি যদি আমাদের না চাহিতেন এবং আমরাও যদি তাঁকে না চাহিতাম তবে উভয়ের মধ্যে মিলনই বা হইত কি করিয়া, আর এত সাধন উপাসনাই বা টিকিত কি করিয়া? তিনি যদি তাঁর অনন্ত নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাঁর অনন্তের মধ্যে যদি অপূর্ণতা বোধ না করিতেন তবে আমরাই বা উৎপন্ন হইতাম কি করিয়া? আর তাঁর অনন্ততাইবা সার্থক হইত কি করিয়া? তিনি যখন পূর্ণ, তখন খণ্ডে তাঁর সার্থকতা ; আবার তিনি যখন খণ্ড হয়ে আছেন তখন পূর্ণে তাঁর সার্থকতা। তাঁর একটা রূপের প্রকাশের মধ্যে আর একটা রূপ লুকিয়ে থাকে, এবং লুকিয়ে থেকে তাঁকে ক্রমশঃ আর একটা রূপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। তাঁর প্রকাশ এবং অপ্রকাশ, তাঁর সত্য এবং বাধা, এর মধ্য দিয়ে তিনি চাঞ্চল্যকে সার্থক করে তুলে তাঁর মহিমাকে চিরজয়যুক্ত করে তোলেন। সত্য এবং বাধা এই দুটিই তাঁর স্বরূপ এবং এই দুটি রূপের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁকে সার্থক করে তোলেন। একটিকে দেখ্‌তে গেলে অপরটিকে তার বিপরীত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর তাৎপর্য্যই এই যে তা সত্ত্বেও তারা ভিন্ন নয়, বাস্তবিক উভয়েরই একই আত্মা, কেবল ক্রমের ভিন্নতা প্রযুক্ত তাদের ভিন্ন স্বরূপ মনে হোতে পারে। সত্যের মধ্যেই বাধা এবং বাধার মধ্যেই সত্য, প্রকাশের মধ্যেই অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যেই প্রকাশটি নিহিত রহিয়াছে।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি

*   *   *

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তিহ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

*   *   *

দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন
ধর্ম্ম ছাড়ি রূপে দুঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

*   *   *

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

*   *   *

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥"

সেই পরম প্রেমময় কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের স্বাভাবিক

পরিস্ফূর্ত্তি ও সার্থকতার প্রয়োজনেই এক দিকে যেমন জড় ও চিৎরূপে তিনি তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি সেগুলিকে নিরন্তর আপনার মধ্যে নানা দ্বার দিয়া সংহার করিতেছেন। এই সৃষ্টি ও লয়ের ইতিহাসেই অলৌকিক প্রেমের সার্থকতা।

এ বিশ্ব শুধু চিদ্বিলাসবিবর্ত্ত বা প্রাণবিলাসবিবর্ত্ত নয়, ইহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত।

"যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক হয়
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।"

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।"

ডাঃ দাসগুপ্তের

# রবি-দীপিতা

রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার শ্রেষ্ঠ পুস্তক

—দাম আড়াই টাকা—